শাশ্বত ভারত

তীর্থের কথা

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রকাশক ঃ

সুধাংশুশেখর দে

দে'জ পাবলিশিং

১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ ঃ

প্রবীর সেন

দে'জ প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬০

মুদ্রাকর ঃ

প্রশান্ত তালুকদার

গদাধর প্রিণ্টার্স

৪১ডি মুরারিপুকুর রোড

কলিকাতা-৭০০০৬৭

যাঁরা তীর্থে যাবেন, আর যাঁরা যাবেন না,
তাঁদের সবার জন্যে

শাশ্বত ভারত

তীর্থের কথা

তীর্থের আকর্ষণ কোন দিন ফুরোবে না। কত যুগ গেল, তবু আজও ভারতের অগণিত পুরুষ ও নারী তীর্থের পথে চলেছে একের পিছনে আর একজন, এক স্থান থেকে আর এক স্থানে, এক তীর্থ থেকে আর এক তীর্থে।

দুই বন্ধুতে মিলে আমরাও বেরিয়েছিলাম তীর্থের পথে, হিমালয়ের দিকে। কিন্তু হিমালয়ের পাদদেশে পৌঁছেই আটকা পড়ে গেলাম। প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য নয়, শারীরিক বাধার জন্যেও নয়। আটকা পড়ে গেলাম গুরুজীর আশ্রমে। হৃষীকেশের গঙ্গার ধারে এই আশ্রমের পরিবেশে কী আকর্ষণ ছিল জানি না, এইখানেই রয়ে গেলাম কয়েক দিন। খবর পেলাম গীতা-ভবনের নিকটে এক সন্ন্যাসী এসেছেন দিন কয়েক আগে। এই আশ্রম থেকে তাউজী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। এখানে তাঁকে আনবার জন্যে চেষ্টা হচ্ছে।

আশ্রমের বাগানে আমি কাজ করছিলাম। আমার সঙ্গী পাধ্যে বললেনঃ সন্ন্যাসী কোন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী নন, কিন্তু খুব পণ্ডিত বলে শুনেছি। তিনি এলে তাঁর কাছে কিছু শোনা যাবে।

আমি বললামঃ সন্ন্যাসী মানুষ কি এই আশ্রমে এসে থাকবেন?

পাধ্যে বললেনঃ চিরদিন থাকবার কথা তো নয়, কয়েকটা দিন থাকলেই হল। তাউজী বলছিলেন, তিনি ভারতের প্রায় সমস্ত তীর্থ ঘুরে এসেছেন। তাঁর কাছে আমরা তীর্থের কথা শুনতে পাব।

তীর্থের কথা! খুশী হয়ে আমি বললামঃ তাহলে আমার আর কোন দুঃখ থাকবে না।

দুঃখ কিসের?

বললামঃ দুঃখ নয়! হিমালয় দেখতে এসে তো এইখানে বাঁধা পড়েছি।

কাজ করতে করতেই পাধ্যে বললেনঃ সত্যি, তীর্থ পরিক্রমার আনন্দ অন্য রকমের। সে হল মুক্তির আনন্দ। তুমিও তো এই লোভেই এদিকে এসেছিলে?

তীর্থের লোভে কিনা জানি না, এসেছিলাম হিমালয়ের টানে।

বোধহয় আমার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়েছিল। তাই সান্ত্বনা দেবার মতো

করে পাধ্যে বললেন ঃ সন্ন্যাসীকে পাওয়া গেলে তোমার আপসোস আর থাকবে না। শুধু হিমালয়ের কথা নয়, সারা ভারতের সব তীর্থের কথা শুনতে পাবে।

পিছনে হঠাৎ সুপ্তির গলা শোনা গেল। এই আশ্রমের পরিচালক তাউজীর অনূঢ়া কন্যা সুপ্তি জানিয়ে গেল যে সন্ন্যাসী এসে গেছেন এবং গুরুজীর সঙ্গে কথা বলছেন।

পরে যখন এই সন্ন্যাসীকে দেখলাম তখন তাঁকে সন্ন্যাসী বলে মনে হল না। মাথায় জটা নেই, নেই গেরুয়া কাপড়। একখানা সাদা ধুতি ভাঁজ করে কাছা না দিয়ে পরেছেন। গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবীর ওপর গরম চাদর। প্রশান্ত মুখে একটা প্রসন্নতা লেগে আছে। পাধ্যেকে আমি চুপি চুপি বললাম ঃ এ কেমন সন্ন্যাসী!

পাধ্যে বললেন ঃ মন যাঁর সংসারে নেই, তিনিই তো সন্ন্যাসী।

আমি বললাম ঃ তাহলে তো আঁপনাকেও সন্ন্যাসী বলতে হয়।

পাধ্যে কিছু ভাবছিলেন, আমার কথা শুনে চমকে উঠলেন। আমি আশ্চর্য হলাম তাঁর চমকানি দেখে। তার পরেই তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন ঃ দেখ নি অনেক মানুষকে যাঁরা সংসার করেন সংসারের প্রয়োজনে, আর সুযোগ পেলেই বেরিয়ে পড়েন ঘর ছেড়ে। সংসার তাঁদের দেহটাকে বেঁধেছে, কিন্তু মন তাঁদের বৈরাগীর মতো মুক্ত। হিমালয়ে সমুদ্রের ধারে তীর্থে মন্দিরে আমরা তাঁদের দর্শন পাই। ইনিও বোধ হয় তেমনি সন্ন্যাসী।

আমার আর একজন সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়ল। আমি তাঁকে শৈশবে দেখেছিলাম। তাঁর পরনে ছিল এক টুকরো গেরুয়া কাপড়, আর গায়ে ভস্ম। একটা গাছের তলায় ধুনি জেলে তিনি বসেছিলেন, আর অগণিত মানুষ তাঁর কাছে ভিড় করে এসেছিল। সবাইকে তিনি শুধু একটি কথা বলেছিলেন, আমি সাধু নই বাবা, সাধু সেজেছি। তোমরা যেমন প্যাণ্ট কোট পরে টুপি মাথায় দিয়ে সাহেব সাজো, এও তেমনি।

আমি তাঁকে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করেছিলাম. সাধু সেজেছ কেন?

তিনি হেসে বলেছিলেন, সাধু হবার জন্যে।

সেদিন তাঁর কথা আমি বুঝি নি। বুঝেছি আজ। মনটাকে তৈরি করাই হল বড় কাজ। তার জন্যে গেরুয়া চাই, ভস্ম চাই, তীর্থে-তীর্থে অন্বেষণ চাই অজানার। মন একবার তৈরি হয়ে গেলে তার পরে আর কিছু চাই না।

সুপ্তি এসে আমাদের পাকা খবর দিয়ে গেল ঃ আজ সন্ধ্যা থেকেই তীর্থের কথা শুরু হবে। বলবেন সাধুজী।

তাঁর নাম বুঝি সাধুজী?

নাম একটা ছিল, কিন্তু এখন আর কোন নাম নেই। এখন লোকে তাঁকে সাধুজী বলেই জানে। এ নাম তাঁর পছন্দ নয়।

কিন্তু আমাদের এই রকম নামই পছন্দ। সুভাষচন্দ্রকে আমরা নেতাজী বলে চেঁচিয়ে ডাকতে পারি, কিন্তু সুভাষবাবু বা মিস্টার বোস বলে ডাকতে পারি না। যাঁরা মহাপুরুষ, তাঁদের ডাকবার জন্যে একটা সাধারণ নাম চাই। সাধুজী নামটি আমার পছন্দ হল।



সায়াহ্নের অন্ধকার তখনও ঘন হয় নি। উপাসনার মন্দিরে আমরা সমবেত হলাম। গুরুজী কয়েক দিন বিশ্রাম নেবেন, আর তীর্থের কথা শোনাবেন সাধুজী। অনেক দিন আমরা শাস্ত্র পুরাণের কথা শুনেছি। তীর্থের কথা এবারে নিশ্চয়ই ভাল লাগবে।

ঘরের কোণে প্রদীপ জ্বলছে, ধূপের গন্ধে পবিত্র হয়েছে বাতাস। আমরা উৎসুক ভাবে সাধুজীর আগমনের অপেক্ষা করতে লাগলাম। সাধুজী এলেন গুরুজীর সঙ্গে পাশাপাশি পা ফেলে। লম্বায় গুরুজীর চেয়ে ছোট, রঙও ময়লা ; কিন্তু মুখে আশ্চর্য রকমের প্রসন্নতা। মনে হল যে তিনি এই প্রসন্নতা বিতরণ করতেই যেন এসেছেন। আমরা উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। তাঁরা দুজনে আসন গ্রহণ করবার পরে আমরা আবার বসলাম।

সাধুজী প্রথমে গুরুজীর সঙ্গে কিছু কথা কইলেন। তারপর আমাদের বললেন ঃ আমার ওপরে হুকুম হয়েছে তীর্থের সম্বন্ধে কিছু বলবার। কিন্তু বলার অভ্যাস তো আমার নেই, আমি পারি তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াতে, আর মনের আনন্দে চোখ বুজে থাকতে।

গুরুজী বললেন ঃ বেশ তো, চোখ বুজে মনে করুন যে কোন তীর্থে পৌঁছে গেছেন, আর মনের আনন্দে তার বর্ণনা দিন।

তাউজী বসেছিলেন আমাদের সঙ্গে, কিন্তু প্রথম সারিতে খাতা পেন্‌সিল নিয়ে। অনেক কথাই তিনি টুকে রাখেন। বলেন, বয়স হয়েছে বলে সব কথা তাঁর মনে থাকে না। মাঝে মাঝে প্রশ্নও করেন। এবারে তিনি বললেন ঃ কত রকমের তীর্থ আছে সে কথা আগে জানা দরকার।

তাউজীর মুখের দিকে চেয়ে সাধুজী হাসলেন, বললেন ঃ তীর্থ শব্দটির মানেও তাহলে জানা দরকার। তরতি পাপাদিকং যস্মাৎ, তার নাম তীর্থ। কাশীখণ্ডে জঙ্গম মানস ও স্থাবর এই ত্রিবিধ তীর্থের কথা বলা হয়েছে। জগতে ব্রাহ্মণরাই জঙ্গম তীর্থ, ব্রাহ্মণদের বাক্যোদকে মলিন জন পবিত্র হয়। জঙ্গম শব্দটির মানে গতিশীল বা প্রাণী।

এ কালের ব্রাহ্মণদের জীবন্ত তীর্থ বলা যায় কিনা সাধুজী সে আলোচনা করলেন না। এ কথাও বললেন না যে পুরাকালে ব্রাহ্মণেরা তীর্থের মতোই পবিত্র ছিলেন। তিনি বললেন মানস তীর্থের কথা ঃ পবিত্র মন মানুষের শ্রেষ্ঠ তীর্থ। শুধু তপস্যা ব্রহ্মচর্য ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ নয়, সত্য ক্ষমা ধৈর্য জ্ঞান দান দয়া ও প্রিয়বাদিতাও মানস তীর্থ। পদ্মপুরাণে আছে, পবিত্র মন নিয়ে মানুষ যেখানে বাস করবে, সেই স্থানই তার নিকট কুরুক্ষেত্র প্রয়াগ ও পুষ্করের মতো তীর্থ। কিন্তু আমরা যা তীর্থ বলে মানি, তার নাম স্থাবর তীর্থ। দেশের সমস্ত পুণ্য স্থানকেই আমরা তীর্থ বলি। শুনে আশ্চর্য হতে হয় যে কেবল পদ্মপুরাণেই সাড়ে তিন কোটি তীর্থের উল্লেখ আছে।

তাউজী যেন চমকে উঠলেন, আর আমি হাসি দেখলাম গুরুজীর মুখে। চেনুলু আজ আমার পাশেই বসেছিল, তার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হল, অস্পষ্ট ভাবে বলল ঃ সাড়ে তিন কোটি তীর্থের কথা আমাদের শুনতে হবে!

সাধুজী আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে কী বুঝলেন জানি নে, বললেন ঃ ভয় নেই, সাড়ে তিন কোটি তীর্থের নাম আমি জানি নে, একশোটি নাম জানি কিনা সন্দেহ।

চেনুলুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে সে আশ্বস্ত হয়েছে অনেকখানি। নিরাশ হল কে তা দেখতে পেলাম না।

সাধুজী বললেন ঃ তীর্থ দর্শনের প্রয়োজনীয়তা সর্বকালে স্বীকৃত হয়েছে। ব্রাহ্মণের কথামৃতে মন যদি পবিত্র না হয়, তপস্যায় ও সত্য ধর্ম পালনেও যদি সংসারী মন মলিন হয়ে থাকে, মানুষকে তবে তীর্থ ভ্রমণে বেরোতেই হবে। শুধু বহুদর্শিতা নয়, এই মুক্তিতে আত্মার উন্নতি সাধন হয়। এ যুগের মানুষও ভ্রমণকে শিক্ষার সোপান বলে মনে করেন।

পুরাকালে তীর্থ ভ্রমণের রীতি নীতি ছিল সুস্পষ্ট। মৎস্যপুরাণের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে যে ঐশ্বর্যমত্ত হয়ে কোন ধনী যদি যানারোহণে তীর্থযাত্রা করে তবে তার সেই তীর্থযাত্রা একেবারে নিষ্ফল হয়। যানবাহনে তীর্থযাত্রা করলে অর্ধেক পুণ্য নষ্ট হয়, তার অর্ধেক নষ্ট হয় ছত্র ও পাদুকা ব্যবহারে, তৈল ও মাংসাহারে আরও অর্ধেক পুণ্যক্ষয় হয় এবং স্ত্রীসঙ্গে সমস্তই বিনষ্ট হয়।

এমনি বিধিনিষেধ আরও অনেক ছিল, কিন্তু এ যুগে সে সমস্তই অচল

হয়ে গেছে। তীর্থ ভ্রমণের প্রেরণা পুণ্য লোভে আসে না, এই প্রেরণার জন্ম সৌন্দর্য চেতনায়। ভারতের সমস্ত তীর্থে আমরা প্রকৃতির এমন রূপ দেখি যে সেই রূপের আকর্ষণেই আমরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি। কিছু দিনের জন্য সংসারের দুঃখ ভুলে যাই, পবিত্র আনন্দে সমস্ত মন যায় ভরে। এরই নাম তীর্থের টান, এই টানেই আমরা ঘর ছাড়ি।

সাধুজী থামতেই তাউজী প্রশ্ন করলেন ঃ এ দেশের বহু স্থান কেমন করে তীর্থে পরিণত হল, সে সম্বন্ধে কিছু বলবেন না ?

সাধুজী বললেন ঃ হিন্দুর বিশ্বাস থেকেই তীর্থের জন্ম। দেবতার অস্তিত্বে আমরা বিশ্বাস করি, শ্রদ্ধা করি মহাপুরুষদের। তাই যখনই আমরা শুনি যে এ দেশের কোন স্থান দেবতার বা কোন মহাপুরুষের লীলায় ধন্য হয়েছে, সেই স্থানকেই আমরা তীর্থ রূপে সম্মান করি। প্রত্যেকটি তীর্থের সঙ্গে কোন পুরাকাহিনী যুক্ত হয়ে তার মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করেছে। কোন কোন কাহিনী পুরাণে লিপিবদ্ধ আছে, কোন কাহিনী আছে স্থল পুরাণে বা স্থানীয় লোকের মুখে মুখে। তীর্থে গিয়ে পাণ্ডার মুখে আমরা সেই সব কাহিনী শুনি। আর—

সাধুজী একটু থেমে বললেন ঃ অনেক তীর্থে ছোট ছোট পুস্তিকাও দেখেছি। মন্দিরের নিকটে পূজার উপকরণের মতো এই সব মাহাত্ম্য পুস্তিকাও যাত্রীদের জন্য সাজানো থাকে।

এই রকম পুস্তিকা আমিও কিছু কিছু দেখেছি। কিন্তু সে সব সযত্নে লিখিত নয়। শুধু ভাব ও ভাষার দৈন্য নয়, বক্তব্যের অভাবও মনকে পীড়া দেয়। তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণনায় সাধারণের হৃদয় জয় করার কোন চেষ্টা তাতে নেই।



তীর্থের কথা আরম্ভ করতে গিয়ে সাধুজী প্রথমটায় বিপদে পড়লেন, বললেন ঃ কোন্ তীর্থের কথা দিয়ে শুরু করি বুঝতে পারছি না।

গুরুজী এতক্ষণ একটি কথাও বলেন নি, এইবারে হেসে বললেন ঃ আদি তীর্থ পুষ্কর।

সাধুজী বললেন ঃ সত্যিই তো, সত্য যুগে পুষ্কর ত্রেতায় নৈমিষারণ্য দ্বাপরে কুরুক্ষেত্র ও কলিতে গঙ্গা হলেন শ্রেষ্ঠ তীর্থ। পুষ্করের কথা দিয়েই তীর্থের কথা আরম্ভ করা যাক।

একটু থেমে বললেন ঃ এই প্রসঙ্গে মহাভারতের একটি কথা মনে পড়ছে। বনবাসী পাণ্ডবেরা তীর্থ করতে বেরোবেন। দেবর্ষি নারদ এসে তাঁদের বললেন মহর্ষি পুলস্ত্য ভীষ্মকে তীর্থ বিষয়ে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তাই তোমাকে বলছি। পৃথিবীতে যে দশ কোটি সহস্র তীর্থ আছে, এক পুষ্করে তিন সন্ধ্যাতেই সেই সমস্ত তীর্থের ফল পাওয়া যায়। বিষ্ণু যেমন সমস্ত দেবের আদি, তেমনি পুষ্করও তীর্থের আদি। এর পরে তিনি পুষ্কর মাহাত্ম্য সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।

পুষ্কর কেমন করে তীর্থে পরিণত হল সে সম্বন্ধে একটি কাহিনী আছে পদ্মপুরাণে। পিতামহ ব্রহ্মা এঁক দিন হাতে একটি পদ্মফুল নিয়ে যজ্ঞের জন্য স্থান নির্বাচনে বেরোলেন। এই সুন্দর পার্বত্য প্রদেশে তাঁর হাতের পদ্মটি যেখানে পড়ল, যজ্ঞের জন্য ব্রহ্মা সেই স্থানটি নির্বাচন করলেন। পুষ্কর মানে পদ্ম। পদ্মটি মাটিতে পড়বার সময় নাকি মহাশব্দ উত্থিত হয়েছিল। সেই শব্দে দেবতারা কেঁপে উঠেছিলেন। ভীত দেবতাদের ব্রহ্মা বলেছিলেন, তোমাদের ভয় নেই, বজ্রনাভ নামে রসাতলবাসী এক অসুরকে বধ করবার জন্য আমি এই পদ্ম নিক্ষেপ করেছি। সে তোমাদের বিনাশের চেষ্টা করছিল। তার মৃত্যু হয়েছে। এখন থেকে এই স্থান পুষ্কর নামে তীর্থে পরিণত হবে।

সাধুজী বললেন ঃ ভারতবর্ষের প্রায় মাঝখানে রাজস্থানে এই তীর্থ। দিল্লী থেকে আমেদাবাদ যায় ছোট লাইনের গাড়ি, আজমীর এই লাইনে একটি বড় স্টেশন। আজমীর থেকে পুষ্কর সাত মাইল পথ মোটরে বা বাসে যেতে হয় আজমীর স্টেশন থেকে। সময় লাগে আধঘণ্টা। অনেক যাত্রী টাঙ্গাতেও যায়, কিন্তু পাহাড়ের চড়াই পথে ঘণ্টা দেড়েক সময় লাগে।

সাধুজী একটু থেমে বললেন ঃ আমার মতো নিঃসম্বল যাত্রী এই পথটুকু পায়ে হেঁটেই অতিক্রম করে। ভারি সুন্দর এই পায়ে-হাঁটা পথ। পায়ে হেঁটে পথ চলার একটা আনন্দ আছে। নানা রকমের যাত্রীর সঙ্গে পরিচয় হয়, অনেক অলিখিত কথা জানা যায়।

পুষ্কর একটি মালভূমি। একটানা উপরে উঠে খানিকটা নিচে নামতে হয়। তিন দিক তার পাহাড়ে ঘেরা, মাঝখানে বিরাট জলাশয়। হ্রদের পূর্ব দিকে নাগাপাহাড় আরাবল্লী পর্বতমালার একটি অংশ। পুষ্করের জল আসে এই পাহাড় থেকে। উত্তরের পাহাড়ের নাম পাপমোচনী। আরও দুটি পাহাড় আছে, তার নাম সাবিত্রী ও গায়ত্রী। দেবী ভাগবতে নাকি গায়ত্রী

পাহাড়ের উল্লেখ আছে। পুষ্করের দক্ষিণে এই পাহাড়, তার উপরে দেবী পুরুহোতার মন্দির। শাস্ত্রীয় নাম দেবী গায়ত্রী, ভৈরব সর্বানন্দ। অনেকে এটিকে পীঠস্থান বলেন, সতীর মণিবন্ধ পড়েছিল এইখানে। পুষ্করে পৌঁছে আমি পাণ্ডাদের কাছে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম যে সেখানে একটা ভাঙা মন্দির আছে, কিন্তু পূজারী নেই। পাথরের উপরে এক সময় হরগৌরীর মূর্তি খোদিত ছিল, এখন তা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। কেউ চামুণ্ডার মন্দির বলে। কেউ বলে পুরুতা দেবীর মন্দির। পুরুতা নিশ্চয়ই পুরুহোতা। দেবীর হাজার আট নামের এক নাম।

ব্রহ্মার যজ্ঞের সম্বন্ধেও একটি কাহিনী আছে। তাঁর সস্ত্রীক যজ্ঞ সম্পূর্ণ করবার কথা ছিল। কিন্তু শুভ মুহূর্তে ব্রহ্মাণী সাবিত্রী এসে পোঁছলেন না। সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে দেখে ব্রহ্মা পুনরায় বিবাহ করে যজ্ঞ সম্পূর্ণ করবেন বলে মনস্থ করলেন। একটি গোপকন্যা আসছিল। তাকে গরুকে দিয়ে ভক্ষণ করিয়ে পুনর্জন্ম দেওয়া হল। সেই কন্যার নাম হল গায়ত্রী। গায়ত্রীকে বিবাহ করে ব্রহ্মা যজ্ঞ সম্পূর্ণ করলেন। বিপদ হল এই ঘটনার পরে। সাবিত্রী এসে যখন এই ঘটনা শুনলেন তখন তিনি ব্রহ্মাকে অভিশাপ দিলেন যে তাঁর পূজা কোনখানে হবে না এবং নিজে গিয়ে সাবিত্রী পাহাড়ে অধিষ্ঠান করলেন। এই পাহাড়ে সাবিত্রীর একটি মন্দিরও আছে।

ব্রহ্মার পূজা নিষিদ্ধ হওয়ার অন্য কাহিনী শিবপুরাণে আছে। কে বড় আর কে ছোট এই নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছিল ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যে। ঠিক এই সময়ে একটি আলোর স্তম্ভ দুজনের মাঝখানে উঠে এল। তার আদি অন্ত দেখা অসম্ভব মনে হল। ঠিক হল যে দুজনের মধ্যে যিনি আগে এর আদি বা অন্ত দেখে আসতে পারবেন তিনিই শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হবেন। বিষ্ণু বরাহ রূপ ধারণ করে ভূগর্ভে প্রবেশ করলেন, কিন্তু আদি অন্ত নির্ণয়ে ব্যর্থ হয়ে উপরে উঠে এলেন। ব্রহ্মা হংস রূপে আকাশে উড়েছিলেন, তিনি দেখলেন যে উপর থেকে একটি কেতকী ফুল পড়ছে। সেই ফুলটি নিয়ে তিনি ফিরে এসে বললেন, আমি আলোর স্তম্ভের উপর থেকে এই ফুলটি আনলাম। এই কথা বলা মাত্র স্তম্ভ অন্তর্হিত হল। আর সেই জায়গায় দেখা দিলেন শিব। তিনি ব্রহ্মাকে ধিক্কার দিয়ে বললেন, এই মিথ্যা ভাষণের জন্য আপনার পূজা বিশ্বে রহিত হবে। ব্রহ্মা অনুতপ্ত হয়ে তপস্যা করলেন দীর্ঘ কাল। তারপর স্থির হল যে শুধু এই পুষ্করেই তাঁর পূজা হবে। পুষ্করে ব্রহ্মার মন্দিরই সব চেয়ে বড় মন্দির। ব্রহ্মার মন্দির আমরা আর কোথাও দেখি না।

পদ্মপুরাণে আর এক জায়গায় পুষ্করের উল্লেখ আছে। এখানকার নাগ-পাহাড় বা যজ্ঞ পর্বতের উপরে বিষ্ণু বামন রূপে বলি রাজার পরীক্ষা করেছিলেন। রামায়ণেও আছে পুষ্করের উল্লেখ। বিশ্বামিত্র এখানে তপস্যা

করেছিলেন। স্বর্গের অপ্সরা মেনকার সঙ্গে এখানেই তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। দশ বৎসর তিনি এই অপ্সরার সঙ্গে সংসার করেছিলেন। তারপর শকুন্তলার জন্মের পর মেনকা ফিরে গিয়েছিলেন ইন্দ্রের সভায়। কণ্ব মুনির আশ্রম ছিল নিকটে, তাই তিনি পরিত্যক্তা কন্যা শকুন্তলাকে পেয়েছিলেন কুড়িয়ে।

বিশ্বামিত্রের সম্বন্ধে আরও একটি কাহিনী আমরা শুনি। বলির জন্য ক্রীত শুনঃশেফ এইখানে তাঁর আশ্রয় নিয়েছিল, এবং ঋষি তার প্রাণ রক্ষার জন্য এইখানেই তাকে গাথা শিখিয়েছিলেন। পুষ্করে অগস্ত্য মুনিরও আশ্রম ছিল। বনবাসী রাম এইখানে এসে স্বর্গত পিতাকে পিণ্ডদান করেছিলেন। দশরথ নাকি সশরীরে সামনে এসে রামের হাত থেকে পিণ্ড গ্রহণ করেছিলেন। যুধিষ্ঠিরও এসেছিলেন এই তীর্থ দর্শনে।

সাধুজী বললেন : বাস স্ট্যাণ্ড থেকে বাজারের ভিতর দিয়ে পুষ্কর হ্রদে যাবার পথ। অন্য যাত্রীদের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে আমি ব্রহ্মাঘাটের দিকে অগ্রসর হলাম।

রাস্তা থেকে বাঁ দিকে চেয়ে চেয়ে দু একবার আমরা পুষ্করের জল দেখতে পেয়েছিলাম। একবার আমরা বড় রাস্তা ছেড়ে গলির ভিতরেই ঢুকে পড়লাম। একটুখানি হেঁটেই পৌঁছলাম পুষ্করের ঘাটে। দিগন্ত বিস্তৃত না হলেও কী বিরাট নির্মল জলাশয়! তার চারি দিকে ঘাট ও অট্টালিকা। এক দিকে উঁচু পাহাড়ের উপর একটি সাদা মন্দির দেখে কল্পনা করে নিলাম যে ঐটিই সাবিত্রীর মন্দির হবে। ঘাটের পাশে একটুখানি বাঁধানো জায়গা আছে। উপরে ছাদ। কিন্তু মেঝে বড় নোংরা। দু একজন তাই আলসের উপর বসে বিশ্রাম নিচ্ছেন, আর ভিজে কাপড়ে ঘাটের উপরে বসে পিণ্ডদান করছেন অনেকে। পাণ্ডারা উপরের ধাপে বসে মন্ত্র পড়াচ্ছেন।

একজন পাণ্ডা এক যাত্রীকে বললেন, এই পুষ্কর মহারাজের পরিক্রমা হল পাঁচ ক্রোশ। পর্বতের মধ্য দিয়ে পথ। তার ভিতর পঞ্চমুনির আশ্রম—মরীচি অঙ্গিরা অত্রি পুলহ ও পুলস্ত্য মুনির কুটীর। কুণ্ড অনেক—নাগ কুণ্ড গোমুখ কুণ্ড পদ কুণ্ড পরশুরাম কুণ্ড বামদেব কুণ্ড ভৃগু কুণ্ড অগস্ত্য কুণ্ড কপিল কুণ্ড। বাহান্নটি ঘাট, তার মধ্যে গোঘাটই সব চেয়ে বড়। ব্রহ্মা ঘাট ও বরাহ ঘাটও ছোট নয়। এই ঘাটের নাম ব্রহ্মা ঘাট। পুষ্করে চার শো মন্দিরের মধ্যে চারটি মন্দির হল প্রধান—ব্রহ্মা বরাহ অটমটেশ্বর শিব আর রঙ্গনাথের নতুন মন্দির। অটমটেশ্বর বোধহয় আত্মেশ্বর।

সাধুজী বললেন : আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক ঝাঁক মাছের খেলা দেখলাম। শুনলাম যে জলে নাকি কুমীরও আছে, কিন্তু কুমীর দেখতে পেলাম না। এক সময় ধীরে ধীরে ব্রহ্মার মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলাম।

খানিকটা এগিয়ে বাঁ হাতে একটি পায়ে-চলার পথ বেরিয়ে গেছে।

এইটিই সাবিত্রী পাহাড়ে যাবার পথ। সে পথে খানিকটা এগিয়ে দেখলাম যে চোখের সামনেই সাবিত্রী পাহাড় দেখা যায়, তার চূড়ায় সাদা মন্দির। পথের ধুলো এখানে বালির মতো, আরও এগিয়ে নাকি শুধুই বালি। ডান হাতে একখানা পাকা বাড়ি, বাঁ হাতে তৃণগুল্ম, বড় গাছও আছে। ইচ্ছা হল সেই পথে আরও এগিয়ে যাই, কিন্তু যাতায়াতে অনেক সময় লাগবে বলে সে দিকে আর গেলাম না।

ব্রহ্মার মন্দির বেশি দূর নয়, অল্পক্ষণেই পৌঁছে গেলাম। মন্দিরের সামনে একটা বড় গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে মন্দির প্রবেশের দ্বার দেখতে পেলাম। রাস্তা থেকে অসংখ্য ধাপ উঠে গেছে। ছোট দ্বার, তার উপরে নহবৎখানার মতো তিনটে গম্বুজ পাশাপাশি। তার পিছনেও বড় বড় গাছ দেখা যাচ্ছে। যাত্রীরা ওঠা নামা করছে সিঁড়ি দিয়ে।

মন্দিরের ভিতরে আমি ব্রহ্মার মূর্তি দেখলাম। চতুর্মুখ ব্রহ্মা স্থূলকায় ও রক্তবর্ণ, হংসবাহন, বামে গায়ত্রী দেবী। মন্দির প্রাঙ্গণে আরও অনেক দেবদেবী ও ঋষিমূর্তি দেখা গেল। দ্বারে ইন্দ্র ও কুবের, বাহন হস্তী, পঞ্চমুখ মহাদেব নারদ গৌরীশঙ্কর লক্ষ্মীনারায়ণ ও সূর্য। সনক সনন্দাদি ঋষি ও দত্তাত্রেয়। সাবিত্রী ও সরস্বতী।

ফেরার পথে দেখলাম মাগনিরাম বাঙ্গরের তৈরি রঙ্গনাথের নতুন মন্দির। উত্তর ভারতে দ্রাবিড় স্থাপত্যের নমুনা এখানেই প্রথম দেখলাম। পথের উপরে বিরাট গোপুর। মন্দিরের দেওয়ালে অসংখ্য পৌরাণিক চিত্র নানা বর্ণে সমুজ্জ্বল। জানা গেল যে সোয়া কোটি টাকায় এই মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে।



পুষ্করের পর সাধুজী নৈমিষারণ্য-র কথা শোনালেন।

বললেন: সত্যযুগে যেমন পুষ্কর, ত্রেতায় তেমনি নৈমিষারণ্য ছিল শ্রেষ্ঠ তীর্থ। এখন এই নৈমিষারণ্যে গেলে এ কথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, দুঃখ হয় এই তীর্থের দুর্গতি দেখে। এমন কিছু এখন এই তীর্থে নেই, যার আকর্ষণ আছে সাধারণ যাত্রীর কাছে।

নৈমিষারণ্য দণ্ডকারণ্যের নাম আমার শোনা ছিল. কিন্তু এই সব অরণ্য কোথায় তা আমার জানা ছিল না। অরণ্য যে তীর্থ হতে পারে তাও কোন দিন শুনি নি। আমার মনে হল যে আরও অনেকে আমার মত অজ্ঞ আছেন, কিন্তু কোন প্রশ্ন করার সুযোগ পাচ্ছেন না। তাউজী বোধহয় আমাদের মনের কথা অনুমান করতে পেরেছিলেন, বললেন ঃ নৈমিষারণ্যের অবস্থান সম্বন্ধে কিছু বলুন।

সাধুজী বললেন ঃ নৈমিষারণ্যের অক্ষ দ্রাঘিমা আমি বলতে পারব না। তবে কী ভাবে সেখানে পৌঁছানো যায় তা বলতে পারব। এই তীর্থটি হল উত্তর প্রদেশে লখনৌ থেকে খুব বেশী দূরে নয়। যাঁরা ট্রেনে যাবেন তাঁদের পশ্চিমগামী কোন ট্রেনে উঠতে হবে। প্রথম বড় স্টেশন বালামাউ জংশন, নামতে হবে সেইখানে। বালামাউ থেকে সীতাপুর পর্যন্ত শাখা লাইন আছে। সীতাপুর উত্তর প্রদেশের সদর রাস্তার উপরে। কিন্তু নৈমিষারণ্যের যাত্রীকে সীতাপুর পর্যন্ত যেতে হবে না, বালামাউ থেকে ষোল মাইল দূরে নিমসর নামে একটি স্টেশনে নেমে পড়তে হবে। নিমসর বা নিমখারই প্রাচীন নৈমিষারণ্য। গোমতী নদীর তীরে এ ছোট জায়গাটি।

সাধুজী একটু থেমে বললেন ঃ নৈমিষারণ্যের তীর্থ মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আমি অনেক দিন ভেবেছি। রামায়ণে মহাভারতে এই তীর্থের অনেক খ্যাতি আছে এবং মহাভারতের মতে নৈমিশ ক্ষেত্রই পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ তীর্থ। নৈমিশ এবং নৈমিষ এই দুই বানান নিয়ে এই তীর্থের উৎপত্তি বিষয়ে দুটি কাহিনী প্রচলিত আছে।

দেবী ভাগবতের কাহিনীটিই প্রাচীনতর বলে মনে হয়। সত্যযুগ শেষ হয়ে এসেছে, ত্রেতা ও দ্বাপরের পরেই আসবে কলিযুগ। ঋষিরা কলির আগমনের ভয়ে অস্থির হয়ে ব্রহ্মার নিকটে গিয়েছিলেন আশ্রয়ের জন্য। ব্রহ্মা তাঁদের এক মনোময় চক্র দিয়ে বলেছিলেন যে তোমরা এই চক্রের অনুগমন কর, যেখানে এই চক্রের নেমি বিশীর্ণ হয়ে পড়বে, সেই স্থানকেই তোমরা পবিত্র তীর্থ বলে মনে করবে। যত দিন সত্যযুগ আবার না উপস্থিত হয় তত দিন তোমরা নির্ভয়ে সেইখানে বাস কোরো, কলি সেখানে কখনও প্রবেশ করতে পারবে না। পিতামহ ব্রহ্মার আদেশে ঋষিরা তাই করলেন। সেই মনোময় চক্রের পিছনে চললেন সবাই, সমস্ত দেশ পরিভ্রমণ করে যখন এই স্থানে এসে পৌঁছলেন তখন চক্রের নেমি বিশীর্ণ হয়ে পড়ল। ঋষিরা আর এগোলেন না, সবাই মিলে সেখানেই বাস করতে লাগলেন। পরম তীর্থ বলে পরিগণিত হল এই স্থান, এর নাম হল নৈমিষারণ্য। কলি এখানে প্রবেশ করতে পারবে না বলে আজও নৈমিষারণ্য তীর্থ বলে স্বীকৃত।

দ্বিতীয় কাহিনীটি বরাহ পুরাণের। গৌরমুখ মুনি এখানে এক নিমেষে দানব বল নিহত করেছিলেন বলে এই স্থানের নাম হয়েছে নৈমিষারণ্য।

তাউজী প্রশ্ন করলেন: কোন মন্দির নেই নৈমিষারণ্যে ?

সাধুজী বললেন: মন্দির নেই এমন স্থান কি এ দেশে আছে! ছোট বড় অনেক মন্দির আছে, তার মধ্যে ললিতাদেবীর মন্দিরই প্রধান। আর একটি প্রধান স্থান হল চক্রতীর্থ, ছ কোণের একটি সরোবর। যাত্রীদের থাকবার জন্য ধর্মশালাও আছে।

নৈমিষারণ্য বা নিমসরে যাবার প্রশস্ত সময় হল ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষ। তখন সেখানে পরিক্রমা মেলা। সেই মেলা নানা স্থানে ঘুরে নিকটে আর একটি তীর্থে আসে, তার নাম মিশ্রিক। মিশ্রিকে আছে দধীচি কুণ্ড আর হত্যাহরণ তীর্থ। যে কুণ্ডের জলে স্নান করে দধীচি মুনি তাঁর দেহ দেবতাদের দান করেছিলেন, তারই নাম দধীচি কুণ্ড। আর হত্যাহরণ তীর্থে স্নান করে রামের ব্রহ্ম হত্যার পাপ স্খালন হয়েছিল। রাক্ষস রাজ রাবণ ছিলেন ব্রাহ্মণ!

নৈমিষারণ্যে শুধু চক্রতীর্থ নয়, আরও অনেক পবিত্র সরোবর আছে। তাদের নাম পঞ্চপ্রয়াগ কাশী গোদাবরী গঙ্গোত্রী ও গোমতী। শুধু ললিতা দেবীর মন্দির নয়, ছোট বড় আরও অনেক মন্দির আছে। পরিক্রমা মেলার সময় সেখানে গেলে একটা বড় তীর্থস্থান বলেই মনে হয়।

সাধুজী একটু থেমে বললেন: সে প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগের কথা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দেশ ছারখার হয়ে গেছে। জনমেজয়ের সর্প যজ্ঞ শেষ হয়েছে। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস সেখানে নিজে কথাবৃত্তি করেছিলেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁর পঞ্চম শিষ্য রোমহর্ষণ ও তাঁর পুত্র উগ্রশ্রবা। এঁরা সূতজাতি, পুরাণ কথন এঁদের পেশা। এঁরা দেবতা ঋষি ও রাজাদের বংশাবলী জেনে রাখতেন এবং ঋষি ও ব্রাহ্মণদের সভায় এঁরা পুরাণ ইতিহাস পাঠ করে শোনাতেন।

শৌনিক ঋষি এই নৈমিষারণ্যে এক বিরাট যজ্ঞ করেছিলেন। ষাট হাজার মুনি ঋষি সেই যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। যজ্ঞ শেষে পুরাণের আলোচনা আরম্ভ হল, তাতে সভাপতিত্ব করলেন রোমহর্ষণ। এমন অদ্ভুত ভাবে তিনি পুরাণের গল্প বলতে পারতেন যে তা শুনে শ্রোতাদের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত। সেই জন্যেই তাঁর নাম হয়েছিল রোমহর্ষণ।

সেদিন আষাঢ়ের শুক্ল পক্ষ দ্বাদশী তিথি। দশখানি পুরাণ পাঠ শেষ করে রোমহর্ষণ একাদশ পুরাণ শুরু করেছেন। এমন সময় তীর্থযাত্রী বলরাম এসে সভায় উপস্থিত হলেন। সমবেত ব্রাহ্মণেরা উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন, কিন্তু রোমহর্ষণ তাঁর সভাপতির আসন পরিত্যাগ করে বলরামকে সম্মান প্রদর্শন করলেন না। রোমহর্ষণের ক্ষত্রিয় পিতা

ও মাতা ব্রাহ্মণের কন্যা। বলরাম এই কারণেই বললেন, ব্রাহ্মণেরা তাঁকে সম্মান দিতে পারলেন, আর এত বড় স্পর্ধা একজন সূত পুত্রের! ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে বলরাম তাঁকে হত্যা করলেন।

তারপর অসমাপ্ত কাজের ভার পড়ল সৌতি উগ্রশ্রবার উপরে। বাকি সাড়ে সাতখানি পুরাণ পিতার উপযুক্ত পুত্র উগ্রশ্রবা আবৃত্তি করে শোনালেন।

তাউজী বললেন: এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ কেউ করলেন না?

সাধুজী বললেন: সে সাহস বোধহয় কারও ছিল না। কিন্তু পরে তাঁরা নিজেদের মধ্যে নিশ্চয়ই বলাবলি করেছিলেন যে দ্বাপরও শেষ হয়ে গেল, কলির পদধ্বনি শোনা গেছে বলরামের ব্যবহারে।

খানিকক্ষণ নীরব থেকে সাধুজী বললেন: নৈমিষারণ্যে আমি গিয়েছিলাম সাধু দেখবার জন্যে। ষাট হাজার ঋষির বংশধর কি আজ একজনও নেই।

কী দেখলেন?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন: আমাদের সঙ্গে তাদের আর কোন প্রভেদ দেখতে পেলাম না।



ত্রেতায় যেমন নৈমিষারণ্য দ্বাপরে তেমনি কুরুক্ষেত্র।

সাধুজী বললেন: ঋষিরা নৈমিষারণ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন সত্যযুগে না ত্রেতায় তা জানা যায় না। সত্যযুগের শেষেই ঋষিরা কলির ভয়ে ব্রহ্মার কাছে গিয়েছিলেন বলে অনুমান করা হয়। কাজেই ত্রেতায় তাঁরা নৈমিষারণ্যে ছিলেন, দ্বাপরেও ছিলেন সেইখানে। শৌনকের যজ্ঞ ও পুরাণ পাঠের ব্যবস্থা তারই প্রমাণ। কুরুক্ষেত্র তখন দ্বাপরের শ্রেষ্ঠ তীর্থ বলে স্বীকৃত হয়েছে।

পুরাকালে রাজর্ষি কুরু এই ক্ষেত্র কর্ষণ করেছিলেন বলে নাম কুরুক্ষেত্র। কুরু চন্দ্রবংশীয় রাজা সম্বরণের পুত্র, সূর্যকন্যা তপতী তাঁর মা। রাজর্ষি কেন এই ক্ষেত্র কর্ষণ করেছিলেন সে কথা বলরাম জিজ্ঞাসা

করেছিলেন মহর্ষিদের। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষিরা বলেছিলেন যে রাজা কুরুকে ক্ষেত্র কর্ষণ করতে দেখে দেবরাজ ইন্দ্র এসে এই কথাই জানতে চেয়েছিলেন। কুরু তাঁকে বলেছিলেন যে সাধারণ মানুষকে আমি অনায়াসে স্বর্গে পাঠাতে চাই। আমার এই কর্ষিত ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করে তারা স্বর্গে যাবে। ইন্দ্র এই কথা শুনে কুরুকে উপহাস করে ফিরে গিয়েছিলেন।

কিন্তু রাজর্ষি কুরু দেবরাজের উপহাসে উদ্যম হারান নি। তিনি একাগ্র হৃদয়ে নিজের কাজ করে চললেন। কঠিন তপস্যার মতো তাঁর অধ্যবসায় দেখে একসময় দেবরাজ ভয় পেলেন এবং অন্যান্য দেবতাদের কাছে রাজর্ষির বাসনার কথা প্রকাশ করলেন। মন্ত্রণায় স্থির হল যে কুরুর ইচ্ছা মেনে নিতে হবে। দেবরাজ আবার এলেন কুরুর কাছে, বললেন, তোমার শ্রম সার্থক হয়েছে। যারা এই স্থানে যুদ্ধে কিংবা আলস্যশূন্য হয়ে অনাহারে প্রাণত্যাগ করবে, তারা নিশ্চয়ই স্বর্গে যাবে। দেবরাজ ইন্দ্র এই বর দিয়ে ফিরে গেলেন এবং রাজর্ষি কুরু ক্ষান্ত হলেন ভূমিকর্ষণে।

সাধুজী বললেন ঃ এই কাহিনী আছে মহাভারতের শল্য পর্বে। আরও অনেক বৈদিক গ্রন্থ ও উপনিষদে এই তীর্থের উল্লেখ আছে।

মহাভারতে আমরা কুরুক্ষেত্রের সীমাও দেখতে পাই।—

উত্তরেণ দৃষদ্বত্যা দক্ষিণেন সরস্বতীম্।
যে বসন্তি কুরুক্ষেত্রে তে বসন্তি ত্রিপিষ্টপে ॥
ব্রহ্মবেদী কুরুক্ষেত্রং পুণ্যং ব্রহ্মর্ষি সেবিতম্।

সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুই নদীর মাঝখানে কুরুক্ষেত্র। যারা কুরুক্ষেত্রে বাস করে, তারা স্বর্গেই বাস করে। সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী প্রদেশকে ব্রহ্মাবর্তও বলা হয়েছে। তাই অনেক পণ্ডিতের মতে ব্রহ্মাবর্ত ও কুরুক্ষেত্র অভিন্ন।

কুরুক্ষেত্র এখন হরিয়ানা রাজ্যের একটি ছোট শহর, দিল্লী থেকে প্রায় একশো মাইল উত্তরে। একটি সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় ও নানাবিধ কুটীর শিল্পের জন্য যত আদৃত, তার চেয়ে বেশি আদৃত তীর্থ বলে। আট মাইল পরিধির মধ্যে ছোট বড় তিনশো পঁয়ষট্টিটি তীর্থ আছে বলে শুনেছি।

দিল্লী থেকে কুরুক্ষেত্র যাতায়াতের কোন অসুবিধা নেই। দিল্লী থেকে আম্বালা বড় লাইনের ট্রেন চলে। কুরুক্ষেত্র দিল্লী থেকে সাতানব্বুই মাইল, আর ছাব্বিশ মাইল আম্বালা থেকে। বাসেও যাতায়াত করা যায়। দিল্লী আম্বালা পাণিপথ ও কর্ণাল থেকে বাস আসে।

তাউজী বললেন ঃ কুরুক্ষেত্রের পৌরাণিক কথা আরও কিছু বলুন।

সাধুজী হেসে বললেন ঃ গীতার প্রথম শ্লোকে কুরুক্ষেত্রকে ধর্মক্ষেত্র বলা হয়েছে। অনেকেই মনে করেন যে গীতার জন্মস্থান বলেই এই ক্ষেত্র

ধর্মক্ষেত্র। কিন্তু কুরুক্ষেত্র যদি সে সময়ে ধর্মক্ষেত্র বলে পরিচিত না থাকত তাহলে নিশ্চয়ই এ রকম কথা বলা হত না।

মহাভারতের যুগে কুরুক্ষেত্র যে একটা বিরাট যুদ্ধের উপযোগী অতি প্রশস্ত ক্ষেত্র ছিল তাতে সন্দেহ নেই। তাইতেই পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে উত্তরে গিয়েছিলেন আর কৌরবরা এসেছিলেন হস্তিনাপুর থেকে। ইন্দ্রপ্রস্থের অবস্থান জানা গেছে। বর্তমান দিল্লীতেই ছিল ইন্দ্রপ্রস্থ, পুরনো কিল্লার কাছে ইন্দরপৎ নাম আজও বেঁচে আছে। কিন্তু হস্তিনাপুরের অবস্থান নিয়ে পণ্ডিতেরা এক মত হতে পারেন নি। কেউ বলেন থানেশ্বরে ছিল পুরনো হস্তিনাপুর। বর্তমান থানেশ্বর একেবারে কুরুক্ষেত্রের গায়ে। থানেশ্বর নাম কোন পুরাণে নেই, মহাভারতে স্থানুতীর্থের উল্লেখ আছে। সেখানে ছিলেন স্থানীশ্বর শিব। এই স্থান যে কুরুক্ষেত্রের নিকটে ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

এর পরেই সাধুজী বললেন: পুরাণ ও ইতিহাসের কথার শেষ নেই। তীর্থের কথায় সে আলোচনার দরকার নেই। তার চেয়ে যা বলছিলাম তাই বলি। কুরুক্ষেত্রে গিয়ে আমাদের মতো লোকের থাকবার কোন অসুবিধা নেই। শুনেছি রাজ্য সরকার নাকি দেড় লক্ষ টাকা খরচ করে মধ্যবিত্ত যাত্রীদের থাকবার উপযোগী একটি রেস্ট-হাউস নির্মাণের সংকল্প করেছেন।

এই তীর্থে চারটি পুষ্করিণী আছে। তার মধ্যে কুরুক্ষেত্রেরটিই সব চেয়ে বড়। লম্বায় তিন হাজার হাত, চওড়ায় প্রায় অর্ধেক। এই পুষ্করিণীর বাঁধানো ঘাটে দাঁড়িয়ে অসংখ্য যাত্রী এক সঙ্গে স্নান করে। আর মরসুমের সময় ভোর বেলায় হাজার হাজার পদ্মফুল ফুটে যাত্রীদের মনোহরণ করে।

বাণগঙ্গা নামে একটি পুষ্করিণী মাইল তিনেক দূরে। মহাভারতে পিতামহ ভীষ্মের মৃত্যুর সময় তাঁর তৃষ্ণা পেয়েছিল। অর্জুন মাটিতে একটা বাণ নিক্ষেপ করে জল বার করেছিলেন। তারই নাম বাণগঙ্গা। আর একটি পুষ্করিণী আছে থানেশ্বরে। সূর্যগ্রহণের সময় হয় যাত্রীর ভিড়। সেই সময়ে স্নান করলে এক হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায় বলে লোকের বিশ্বাস। কাজেই সে সময় সেখানে যত যাত্রী, তত বড় মেলা।

কুরুক্ষেত্রে মন্দিরও অনেক আছে। লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির দুর্গামন্দির কমলনাথ জ্যোতিসর ও কালীকমলিওয়ালা মন্দির। সীতা যেখানে পাতাল প্রবেশ করেছেন সেইখানে সীতামাই-এর মন্দির।

আমরা তাকিয়ে আছি দেখে সাধুজী বললেন: তারপরেও আছে গীতা-ভবন চন্দ্রকূপ। কুরুক্ষেত্রে না গেলে তিনশো পঁয়ষট্টি তীর্থের কথা বলে শেষ করা যাবে না।

দ্বাপরে শ্রেষ্ঠ তীর্থ কুরুক্ষেত্রের মাহাত্ম্য এ যুগে কমে গেছে, কিন্তু ফুরিয়ে যায় নি।



এর পরে সাধুজী গঙ্গার কথা বললেন ঃ কলিতে গঙ্গা হলেন শ্রেষ্ঠ তীর্থ। গঙ্গার চেয়ে পবিত্র তীর্থ পৃথিবীতে এখন নেই। গঙ্গার জল পবিত্র, গঙ্গায় স্নান করে শুধু দেহ নয় মনও পবিত্র হয়! পুরনো পাপও এই গঙ্গার জলে ধুয়ে মুছে নির্মূল হয়ে যায়।

কাশীখণ্ডে গঙ্গা মাহাত্ম্যের বর্ণনা আছে। স্বর্গ মর্ত্য ও পাতালে যত তীর্থ আছে, তার মধ্যে গঙ্গাই প্রধান। গঙ্গার সঙ্গে ত্রিলোকের আর কোন তীর্থের তুলনা হয় না। শাস্ত্রে অনেক রকমের যাগ যজ্ঞ বিহিত আছে, সেই সমস্ত যাগ যজ্ঞ করে যে ফল হয় তার শত গুণ ফল বেশি হয় গঙ্গার দর্শনে। এমন কোন পাপ নেই যা গঙ্গার জলে ধুয়ে যায় না, আর এমন কোন অভীষ্ট নেই যা গঙ্গাস্নানে পূর্ণ হয় না। গঙ্গাকে তাই পবিত্র রাখবার জন্য অনেক বিধি নিষেধ আরোপিত হয়েছে। শুধু শৌচ আচমন প্রভৃতি নয়, গঙ্গায় ক্রীড়া ও সন্তরণও নিষিদ্ধ। আর নিষিদ্ধ গঙ্গাতীরে দান গ্রহণ।

শাস্ত্র মতে গঙ্গার গর্ভ থেকে দেড়শো হাত পর্যন্ত ভূমিকে গঙ্গা তীর বলে। গঙ্গার গর্ভ মানে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে গঙ্গার জলধারা যতটা প্লাবিত করে ততটা ভূমি। গঙ্গার দুই তীরের দুই ক্রোশ পরিমিত স্থানকে গঙ্গার ক্ষেত্র বলে। গঙ্গা তীরে ক্ষুধা তৃষ্ণা অনাহার অর্থাভাবে প্রাণ ওষ্ঠাগত হলেও কারও দান প্রতিগ্রহ ধর্ম বিরুদ্ধ। আবার গঙ্গা ক্ষেত্রে দান করতে পারলে অনেক পুণ্য অর্জন হয়। যাগযজ্ঞ ধর্মানুষ্ঠানের প্রশস্ত স্থান হল গঙ্গা ক্ষেত্র। ব্রহ্মপুরাণে আছে যে গঙ্গা তীরে বাস করেই মুক্তি লাভ করা যায়, এক গণ্ডূষ গঙ্গা জল পান করে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়, ত্রিরাত্রি গঙ্গা তীরে বাস করে নরক ভোগ এড়ানো যায়।

গঙ্গার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে নানা পুরাণে নানা কথা আছে। এমনও কথা আছে যে গঙ্গার উদ্দেশে গমন করলে পরদ্রোহ পরদ্রব্য হরণ ও পারদার্য পাপও দূর হয়, গঙ্গা দর্শন করে লাভ হয় আয়ু জ্ঞান ঐশ্বর্য সম্মান ও প্রতিষ্ঠা।

তারপর গঙ্গাজল স্পর্শ করে গো হত্যা ব্রহ্ম হত্যা ও গুরু হত্যার পাপ থেকেও মুক্ত হওয়া যায়। পশুরাজ সিংহকে দেখে মৃগরা যেমন ভয়ে পলায়ন করে, তেমনি যমদূতেরাও মানুষকে গঙ্গা স্নান করতে দেখে পালিয়ে যায়। অজ্ঞানে স্নান করলেও সমস্ত পাপ ধুয়ে মুছে নির্মল হয়ে যায়।

সাধুজী এই পর্যন্ত বলে এক মুহূর্ত থামলেন, তারপরে বললেন: গঙ্গার এই মাহাত্ম্যের কারণ কী, তা নিয়ে কোন আলোচনা দেখা যায় না। কবে থেকে ও কেন গঙ্গা আমাদের কাছে এমন পবিত্র বলে স্বীকৃত হলেন সে কথা অবশ্যই ভেবে দেখা দরকার।

আমার মনে হল যে সাধুজী একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা বললেন। সকল তীর্থের সম্বন্ধেই একটা পৌরাণিক কাহিনী আছে। হয় সতীর দেহের একাংশ পড়ে পীঠস্থানে পরিণত হয়েছে, নয় দেবতারা প্রতিষ্ঠা করেছেন ত্রিমূর্তির একজনকে। তবেই সেই স্থান তীর্থরূপে আজও স্বীকৃত হচ্ছে। গঙ্গার সম্বন্ধে যে কাহিনী আছে সেই কথা শোনবার জন্য আমার কৌতূহল হল।

সাধুজী বললেন: গঙ্গা কে ছিলেন সেই কথাটি আমাদের প্রথমে জানতে হবে। গম্যতে ব্রহ্মপদমনয়া বা গচ্ছতীতি এই অর্থে গঙ্গা। ঋগ্বেদে শতপথ ব্রাহ্মণে কাত্যায়ণ শ্রৌত সূত্র প্রভৃতি গ্রন্থে গঙ্গার উল্লেখ আছে, কিন্তু সরস্বতীর মতো তার স্তুতি নেই। ঋগ্বেদের ঋষিদের কাছে সরস্বতী অনেক প্রিয় নদী। সরস্বতীর মহিমা কীর্তনে অনেক সময়েই তাঁরা আত্মবিস্মৃত হয়েছেন। কিন্তু গঙ্গার সম্বন্ধে তাঁদের সে ধারণা ছিল না। অনেকে অবশ্য মনে করেন যে ঋগ্বেদের রচনা কালে তাঁরা সরস্বতী নদীর উপত্যকা পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন, গঙ্গা দেখেছিলেন পরবর্তী কালে। তাই ঋগ্বেদে গঙ্গার উল্লেখ মাত্র আছে, স্তব স্তুতি নেই।

গঙ্গার মাহাত্ম্য আমরা নানা পুরাণে পেয়েছি। দেবী ভাগবতের মতে গঙ্গা বিষ্ণুর পত্নী। তাঁর অন্য দুই পত্নীর নাম লক্ষ্মী ও সরস্বতী। তাঁরা তিনজনেই বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর সঙ্গে বাস করতেন। এক দিন গঙ্গা বিষ্ণুকে কয়েকবার কটাক্ষ করেছিলেন। তাই দেখে বিষ্ণু হেসেছিলেন, আর সরস্বতী গিয়েছিলেন চটে। বিষ্ণু সেখান থেকে সরে যেতেই দুজনে কলহ বাধল। দুজনেই দুজনকে শাপ দিলেন, নদী হয়ে পৃথিবীতে প্রবাহিত হও।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে এই কাহিনী কিছু অন্য রকম। এক সময়ে গঙ্গার প্রতি বিষ্ণুর বেশি আসক্তি দেখে সরস্বতী ঈর্ষান্বিত হলেন। আর এই নিয়েই দুজনের মধ্যে বিবাদ বেধেছিল, আর দুজনে দুজনকে শাপ দিয়ে মর্ত্যে এসেছিলেন নদী হয়ে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের মতে বিষ্ণুর দেহ থেকে গঙ্গার জন্ম হয়েছে। গঙ্গার আর এক নাম বিষ্ণুপদী। তাই অনেকের ধারণা যে

বিষ্ণুর পা থেকে গঙ্গার জন্ম। কিন্তু এই কথা যে একটি রূপক তা বিষ্ণুপুরাণের কাহিনী থেকেই বোঝা যায়। আকাশে ধ্রুব নক্ষত্রকে অবলম্বন করে যে মেঘাবৃত জ্যোতিষ্ক মণ্ডল, পুরাণকার তাকেই বিষ্ণুর তৃতীয় পদ বলে বর্ণনা করেছেন। সেই মেঘের বর্ষণে গঙ্গার উৎপত্তি বলেই তিনি বিষ্ণুপদী নামে অভিহিত।

সাধুজী সহাস্যে বললেন ঃ গঙ্গার জন্ম বিষয়ে পুরাণে আর একটি কাহিনী আছে। দেবর্ষি নারদ সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। ভাল গাইতে না জানলেও তাঁর মনে গর্ব ছিল। তিনি নিজেকে একজন উঁচু দরের সঙ্গীতজ্ঞ বলে ভাবতেন। একবার বিষ্ণুর সভায় তুম্বুরু নামে এক গন্ধর্বের গান শুনে দেবর্ষি ঈর্ষান্বিত হলেন, স্থির করলেন যে সঙ্গীতে তাঁকে পরাজিত করতে হবে। এই তুম্বুরু ব্রহ্মার কাছে গান শিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বিষ্ণুর পরামর্শে নারদ উলুকেশ্বর নামে আর একজন গন্ধর্বের নিকট গান শিখতে গেলেন। এক হাজার দিব্য বৎসর গান শেখার পর তাঁর ধারণা হল যে তুম্বুরুকে এবারে সহজেই জয় করতে পারবেন। এই ভেবে তুম্বুরুর বাড়ির দিকে রওনা হলেন।

পথে কয়েকজন বিকলাঙ্গ স্ত্রী পুরুষ দেখে তিনি থমকে দাঁড়ালেন, জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কে আর তোমাদের এই দশা কেন ?

তারা উত্তর দিল, আমরা রাগ রাগিণী, নারদ মুনির জন্য আমাদের এই দশা। তাঁর গানেই আমরা বিকলাঙ্গ হয়েছি। এই উত্তর শুনে দেবর্ষি দুঃখিত হলেন, লজ্জিতও হলেন। বললেন, এখন কী উপায় করতে পারি বল। কী করলে তোমরা পূর্ব রূপ ফিরে পাবে ? রাগরাগিণীরা বলল, শিব যদি গান করেন, তাহলেই তা সম্ভব।

নারদ শিবের কাছে গিয়ে সব কথা নিবেদন করলেন। শিব গান গাইতে রাজী হলেন, কিন্তু তাঁর উপযুক্ত শ্রোতা চাই। নারদ বুঝলেন যে সঙ্গীতের শ্রোতা হবার যোগ্যতাও তাঁর হয় নি। তাই শিবের কথায় তিনি ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে ধরে আনলেন।

শিবের গানে রাগরাগিণীরা তাদের পূর্ব রূপ ফিরে পেল। কিন্তু ব্রহ্মা সেই সঙ্গীতের মর্ম কিছুই বুঝলেন না। বিষ্ণু বুঝলেন অল্প। তাতেই তিনি দ্রবীভূত হয়ে ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে আশ্রয় নিলেন। এই দ্রবীভূত বিষ্ণুই গঙ্গা। এই জন্যেই আমরা বিষ্ণুর দেহ থেকে গঙ্গার জন্ম বলি।

একটু থেমে সাধুজী বললেন ঃ ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে গঙ্গা কেমন করে আশ্রয় নিলেন সে সম্বন্ধে পুরাণে অন্য একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। নাগাধিরাজ হিমালয় বিবাহ করেছিলেন সুমেরু দুহিতা মেনকাকে। উমা ও গঙ্গা তাঁদের দুই কন্যা। উমার বিবাহ হয়েছিল শিবের সঙ্গে, আর কোন বিশেষ

কারণে দেবতারা গঙ্গাকে ভিক্ষা করে নিয়েছিলেন হিমালয়ের কাছ থেকে। একবার শিবের তেজ গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, গঙ্গা সেই তেজ ধারণে অসমর্থ হওয়ায় শর বনে তাকে রক্ষা করা হয়। কার্তিকেয়র জন্ম হয়েছিল এই শর বনে। সে অন্য কাহিনী। গঙ্গা এই ঘটনার পরে ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে বাস করছিলেন। সগর বংশের ভগীরথ তাঁর আরাধনা করে পূর্ব পুরুষের উদ্ধারের জন্য তাঁকে মর্ত্যে এনেছিলেন। সে কাহিনী আমরা রামায়ণে পড়েছি।

তাউজি এতক্ষণ কোন কথা বলেন নি। এইবারে বললেন ঃ আপনার মুখে আমরা সে কাহিনীও শুনব।

সাধুজী আমাদের দিকে চেয়ে বললেন ঃ এতো সবারই জানা।

তাউজি বললেন ঃ তা হোক।

ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের গল্প সাধুজী আমাদের সংক্ষেপে বললেন ঃ সগর রাজার দুই রাণী ছিল। বিদর্ভ রাজকন্যা কেশিনী তাঁর বড় রাণী আর কশ্যপের কন্যা ও গরুড়ের ভগিনী সুমতি তাঁর ছোট রাণী। পুত্র লাভের জন্য তিনি হিমালয়ে গিয়ে সস্ত্রীক তপস্যা করেছিলেন, তারপরে বর পেয়েছিলেন ভৃগু মুনির। কেশিনীর অসমঞ্জ নামে এক পুত্র হয়, আর সুমতির হয় ষাট হাজার পুত্র। সগর রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। সেই যজ্ঞের অশ্ব দেবরাজ ইন্দ্র রাক্ষসের বেশে চুরি করে পাতালে কপিল মুনির আশ্রমে বেঁধে রাখলেন। সগরের ষাট হাজার পুত্র পৃথিবী খনন করে পাতালে পৌঁছে কপিল মুনিকেই চোর মনে করে শাস্তি দিতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু মুনির এক হুঙ্কারেই তাঁরা ভস্মে পরিণত হলেন। এ দিকে সগর রাজা দেখলেন যে যজ্ঞের অশ্বও এল না, তাঁর পুত্ররাও ফিরল না। তখন তিনি অসমঞ্জের পুত্র অংশুমানকে পাঠালেন সকলের অন্বেষণে। অংশুমান যজ্ঞের অশ্ব ও পিতৃব্যদের সংবাদ নিয়ে ফিরে এলেন। এ সংবাদও আনলেন যে গঙ্গার ধারা সেই ভস্ম স্তূপের উপর দিয়ে প্রবাহিত হলে সগর বংশের মুক্তি হবে। সগর রাজা তিন হাজার বছর রাজত্ব করেছিলেন, কিন্তু তিনি দেবলোক থেকে গঙ্গাকে আনতে পারলেন না। তাঁর পৌত্র অংশুমান ও প্রপৌত্র দিলীপও এই কাজে ব্যর্থ হলেন। দিলীপের পুত্র ভগীরথ তাঁর মন্ত্রীদের উপর রাজ্যভার অর্পণ করে কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করলেন। গঙ্গা অবতরণ করবেন, কিন্তু তাঁর বেগ ধারণ করবেন কে? ভগীরথ এবার শিবের তপস্যা করে তাঁকে সম্মত করলেন, শিব নিজে ধারণ করবেন গঙ্গাকে। এ দিকে গঙ্গার মনে এক দুরভিসন্ধি এল। তিনি ঠিক করলেন যে এমন বেগে তিনি শিবের উপরে পড়বেন যে শিবকেও ভাসিয়ে নিয়ে পাতালে প্রবেশ করবেন। অন্তর্যামী শিব মনে মনে হেসে সতর্ক রইলেন এবং কৌশলে গঙ্গাকে নিজের জটার মধ্যেই আবদ্ধ করে ফেললেন। ফলে ভগীরথকে আবার তপস্যা করে অদৃশ্য গঙ্গার মুক্তির ব্যবস্থা

করতে হল। মহাদেবের জটা থেকে মুক্ত হয়ে গঙ্গা সপ্তধারায় প্রবাহিত হলেন। যে ধারায় গঙ্গা ভগীরথকে অনুসরণ করে পাতালে প্রবেশ করলেন, তারই নাম ভাগীরথী গঙ্গা।

এ গল্প আমরা শৈশবে পড়েছিলাম, ছবিও দেখেছিলাম রামায়ণে। কিন্তু সব কথা মনে ছিল না। তাউজী বললেন ঃ গঙ্গার জাহ্নবী নাম কেন হল সে গল্পটাও বলুন।

সাধুজী বললেন ঃ হরিবংশে আছে, গঙ্গা নাকি কোন সময় চন্দ্রবংশের রাজা জহ্নুকে বিবাহ করবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন। কিন্তু জহ্নু ছিলেন রাজর্ষি। তিনি এই প্রস্তাবে রাজী হন নি। তারপর ভগীরথ যখন গঙ্গাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, তখন সুযোগ পেয়ে গঙ্গা জহ্নু মুনির আশ্রম ও যজ্ঞের উপকরণ সব ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন। রাজর্ষি জহ্নু ক্রুদ্ধ হয়ে এক গণ্ডূষে গঙ্গাকে পান করে ফেললেন। আবার তপস্যা। জহ্নুকে সন্তুষ্ট করে ভগীরথ গঙ্গাকে ফিরে পেলেন। জহ্নু কান দিয়ে গঙ্গাকে বার করে দিলেন! দেবতারা গঙ্গাকে জহ্নুর কন্যা রূপে স্থির করে দিলেন, তাই গঙ্গার নাম হল জাহ্নবী।

আমরা ভেবেছিলাম যে গঙ্গার কাহিনী বুঝি এইখানেই সমাপ্ত হল। কিন্তু জানলাম যে তা নয়। সাধুজী বললেন ঃ গঙ্গার পরের কাহিনী আছে মহাভারতে। বশিষ্ঠের শাপে অষ্টবসুর মানব জন্ম নিতে হবে। তাঁরা গঙ্গার কাছে এসে তাঁদের জন্ম ও মুক্তির জন্য প্রার্থনা করলেন। তাঁদের অনুনয়ে সম্মত হয়ে গঙ্গা মোহিনী নারীর মূর্তিতে মহারাজা শান্তনুকে জয় করলেন। এই শর্তে তাঁদের বিবাহ হল যে তাঁর কোন কাজে বাধা দিলে গঙ্গা শান্তনুকে পরিত্যাগ করবেন। বসুগণ একে একে গঙ্গার গর্ভে জন্ম নিতে লাগলেন, আর গঙ্গা একে একে সাতজনকে গঙ্গার জলে বিসর্জন দিলেন। তিনি বাধা পেলেন অষ্টম বসুকে বিসর্জন দেবার সময়। মায়ের এই নিষ্ঠুরতার জন্য শান্তনু ক্ষেপে গিয়েছিলেন, বাধা দিয়েছিলেন গঙ্গাকে। তাতেই শর্ত ভঙ্গ হল। গঙ্গা নিজের পরিচয় দিয়ে শিশুকে নিয়ে চলে গেলেন। ষোল বছর পরে রাজোচিত শিক্ষা দিয়ে এই পুত্রকে তিনি শান্তনুর হাতে ফিরিয়ে দেন। এই পুত্রেরই নাম দেবব্রত, মহাভারতে তিনি ভীষ্ম নামে অদ্বিতীয় পুরুষ।

পিছন থেকে কে একজন বলে উঠলেন ঃ তারপর?

এই কৌতূহল দেখে সাধুজী হেসে বললেন ঃ এই সব কাহিনী শুনেই মনে হয় যে গঙ্গা নদী নয়, গঙ্গা দেবী, সরস্বতীর শাপে তিনি নদীতে পরিণত হয়েছেন ও মর্ত্যে প্রবাহিত হয়েছেন মানবের মুক্তির জন্য। তাঁর স্পর্শে সগর বংশের উদ্ধার হয়েছে। আজও উদ্ধার হচ্ছে অগণিত পাপী ও তাপী।

কিছুক্ষণ নীরব থাকবার পরে সাধুজী বললেন ঃ কিন্তু গঙ্গার নিজের যে

কোন দিন মুক্তি হবে না ! ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আমরা দেখি যে সরস্বতীর শাপে গঙ্গা যখন মর্ত্যে আসছেন নদী রূপে, গঙ্গার দু'চোখে তখন জলের ধারা। বিষ্ণু তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, সরস্বতীর শাপে মর্ত্যে তোমাকে পাঁচ হাজার বছর থাকতে হবে। তারপরে তুমি আমার নিকট ফিরে আসবে।

অনেক পুরাণেই এই ধরনের কথা আছে। সাড়ে চার হাজার বছর কেটেছে কলির। পাঁচ হাজার পূর্ণ হলেই গঙ্গা অন্তর্ধান হবেন। পৃথিবী গঙ্গায় হীনা ভবিষ্যঅন্তিমে কলৌ। এটি অন্তিম কলি কিনা জানি না। তাহলে আর পাঁচশো বছর পরে গঙ্গাকে আমরা দেখতে পাব না।

সময়ের কথা সাধুজী ভুলে গিয়েছিলেন আমরাও সচেতন ছিলুম না। তীর্থের কথা আমাদের ভাল লাগছিল। যে সব জায়গা কখনো দেখি নি, জীবনে হয় তো দেখবার সুযোগ পাব না, সে সব জায়গার কথা শুনতে ক্লান্তি আসে না, সময়ের কথাও মনে থাকে না। কিন্তু তাউজী অন্য ধরণের মানুষ। তিনি সারাক্ষণ সজাগ আছেন, তাঁর দৃষ্টি আছে সব দিকে। আশ্রম পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর ত্রুটি আমবা দেখতে পাই নে। তিনিই সাধুজীকে সময়ের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন : আজ এই পর্যন্তই থাক। নতুন তীর্থের কথা আমরা কাল শুনব।

সাধুজী লজ্জা পেয়ে চারি দিকে চেয়ে বলেছিলেন : সত্যিই আজ অনেক রাত হয়ে গেছে।

তারপরেই তিনি উঠে পড়েছিলেন।



বাগানের কাজ করতে করতে পাধ্যে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : তীর্থের কথা কেমন লাগছে ?

আমি সংক্ষেপে বললুম : ভাল।

পাধ্যে বললেন : এ কোন উত্তর হল না, উত্তরটা তুমি এড়িয়ে গেলে।

বললাম : তীর্থের কথায় শাস্ত্রপুরাণের কথাই প্রধান হয়ে উঠছে, তীর্থ স্থানটি চোখের সামনে তেমন করে ফুটে উঠছে না।

পাধ্যে বললেন ঃ একটা অরণ্য, একটা ময়দান বা একটা নদীকে কি চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলা যায়! চোখ বুজেই কল্পনা করে নিতে হয়।

তারপর বললেন ঃ পুষ্কর সম্বন্ধে তো আমাদের একটা মোটামুটি ধারণা হয়েছে।

তা হয়েছে।

বলে নিঃশব্দে আমি কাজ করতে লাগলাম। কিন্তু পাধ্যে বেশিক্ষণ নীরবে রইলেন না। এক সময়ে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কোন অসম্পূর্ণতার কথা তোমার মনে হয় নি?

অসম্পূর্ণতার কথা!

আমি ভাবতে লাগলাম। আমার জ্ঞানের পরিধি তো বিস্তীর্ণ নয়, আমার মনে কেন অসম্পূর্ণতার কথা আসবে!

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে পাধ্যে বললেন ঃ আজমীর স্টেশনে নেমে পুষ্কর তীর্থে যেতে হয়। আজমীর শুনেছি মুসলমানদেরও একটি বড় তীর্থ। আজমীর শরিফ। সুফি সম্প্রদায়ের কাছে এর চেয়ে বড় তীর্থ আর নেই। তারপর আনাসাগর আড়াই দিনকা ঝোঁপড়ি সরস্বতী মহল। জৈনদেরও একটি মন্দির আছে, আর আছে একটি ছোট জাদুঘর। এ সব কথা না শুনলে আলোচনা খানিকটা অসম্পূর্ণ মনে হয় না?

আমি বললাম ঃ এ তো আমাদের তীর্থের কথা নয়।

নাইবা হল। পুষ্করে গিয়ে আমরা কি শুধু পুষ্করে স্নান করে ব্রহ্মার মন্দিরই দেখি! আনাসাগর দেখি না! আজমীর শরিফ দেখি না!

আমি প্রতিবাদ করে বললাম ঃ সবাই দেখি না। আমার এক বন্ধুর মাকে দেখেছি, তিনি গীর্জার সামনে দিয়ে যাবার সময় চোখ বন্ধ করেন। কাশীতে গেলে গঙ্গার ঘাট আর বিশ্বনাথের গলি ছেড়ে সারনাথেও যেতে চান না।

পাধ্যে বললেন ঃ এ রকমের মানুষ সংসারে কম আছেন। আমি সাধারণ মানুষের কথা বলছি।

আমি বললাম ঃ তীর্থের কথায় শুধু তীর্থের কথাই থাক। নানারকমের কথা এলে তীর্থের মহিমা হয়তো ক্ষুণ্ণ হবে।

পাধ্যে আর কোন কথা কইলেন না। আমার মনে হল যে তিনি আমার কথায় ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। তাঁর ইচ্ছা অন্য রকম ছিল। কোন তীর্থে গিয়ে শুধু তীর্থ মাহাত্ম্য নয়, সে জায়গার একটা সামগ্রিক পরিচয় তিনি পেতে চান। হয়তো এও একটা মত। কিন্তু আমি পুষ্করে গিয়ে আড়াই দিনকা ঝোঁপড়িতে ঢুকতে চাই নে। চঞ্চল মনকে আমি একটি পবিত্র ধারায় প্রবাহিত করতে চাই। জীবনে অনেক প্রলোভন আছে, সে সমস্ত থেকে মনকে বিচ্ছিন্ন করতে না পারলে ধর্মের দিকে মনকে একাগ্র করা যায় না।

পরে আমি শকুন্তলাদির সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। তিনিও আমার মতে মত দিয়েছিলেন। বলেছিলেন : তীর্থের কথায় আমরা মন্দিরের কথাও শুনতে চাই নে।

তাঁর এই মন্তব্য আমি বুঝতে পারি নি। তাই সবিস্ময়ে তাকিয়েছিলাম তাঁর মুখের দিকে।

শকুন্তলাদি বললেন : বুঝতে পারলেন না বুঝি ?

আমি স্বীকার করলাম : না।

শকুন্তলাদি বললেন : আমাদের দেশে এমন অনেক মন্দির আছে, যার সৌন্দর্যের তুলনা নেই। কিন্তু সেগুলি আমাদের তীর্থস্থান নয়। উদাহরণ দেব ?

আমি বললাম : আপনি কি কোনারকের মন্দিরের কথা বলছেন ?

শুধু কোনারকের মন্দির নয়, খাজুরাহোর মন্দির, ইলোরার কৈলাস মন্দির বা মহিসুর রাজ্যের বেলুর সোমনাথপুর ও হালেবিদের মন্দির। এ রকম সুন্দর মন্দির এ দেশে কম, অথচ তীর্থ করতে কোন যাত্রী সেখানে যায় না।

এইবারে আমি বললাম : বুঝেছি।

কিন্তু চেনুলু এ কথা শুনে মহা আপত্তি জানাল। বলল : নৈমিষারণ্য আর কুরুক্ষেত্র যদি তীর্থ হতে পারে তো আমাদের গোদাবরীও তীর্থ। নদী পাহাড় মন্দির সব তীর্থ। সব কথা আমরা শুনব।

চেনুলুর চিৎকার পাধ্যে শুনতে পেয়েছিলেন। গম্ভীর ভাবে বললেন : তোমার ইচ্ছায় কিছুই হবে না, সাধুজী যা বলবেন তাই শুনতে হবে।

কেন জানি নে, চেনুলু আজ প্রতিবাদ করল না।



সাধুজীকে সারাদিন দেখতে পাই নি। সন্ধ্যার সময় তিনি উপাসনার মন্দিরে এসে গুরুজীর পাশে তাঁর সঙ্গে উপবেশন করলেন। তাউজী বসেছিলেন তাঁর সামনে। তাঁর দিকে তাকিয়ে সাধুজী সহাস্যে প্রশ্ন করলেন : আজ কি মোক্ষদায়িকা সপ্ত তীর্থের কথা বলতে হবে ?

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকা॥

তাউজীর চোখে রূপোর ফ্রেমের চশমা, ডান হাতে পেনসিল আর বাঁ হাতে খাতা। অত্যন্ত তৎপর ভাবে তিনি খানিকটা লিখেই সাধুজীর মুখের দিকে তাকালেন। সাধুজী বুঝতে পেরেছিলেন যে তাউজী সম্পূর্ণ শ্লোকটি লিখতে পারেন নি। তাই তিনি আবার শ্লোকটি বললেন। তাউজীও সঙ্গে সঙ্গে লিখে নিলেন। পড়ে গুণে বললেনঃ সাতটিতো নয়, আটটি নাম দেখতে পাচ্ছি।

সাধুজী হেসে বললেনঃ পুরী দ্বারাবতী মানে দ্বারাবতী বা দ্বারকাপুরী, পুরী ও দ্বারাবতী নয়। জগন্নাথধামের পুরী নাম মোটেই প্রাচীন নয়। কিন্তু এইভাবে তীর্থের কথা বললে গল্প জমবে না। অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী ও অবন্তী উত্তর ভারতে, কিন্তু কাঞ্চী দক্ষিণ ভারতের তীর্থ ও দ্বারাবতী ভারতের পশ্চিম প্রান্তে। চার ধামও এই রকম, দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অবস্থানও কাছাকাছি নয়।

পেনসিল নামিয়ে রেখে তাউজী বললেনঃ সত্যিই তো, এমন বিক্ষিপ্ত ভাবে তীর্থের কথা বললে মনে রাখাও কঠিন হবে।

সাধুজী বললেনঃ একান্ন পীঠের নাম তো মনে রাখাই যায় না। আর সতীর কোন অঙ্গ কোথায় পড়েছিল, তা নিয়েও মতভেদ আছে তন্ত্রে ও পুরাণে।

পীঠস্থানের কথা আমি জানি। সে দক্ষযজ্ঞের গল্প। দক্ষ প্রজাপতি তাঁর বিরাট যজ্ঞে ত্রিভুবনবাসিকে নিমন্ত্রণ করলেন, কিন্তু নিজের কন্যা সতী ও জামাতা শিবকে ডাকলেন না। এর একটা কারণ আছে। বিশ্বসৃজের সত্রে দক্ষ ভেবেছিলেন যে শিব তাঁর প্রাপ্য সম্মান দেন নি। তাই তিনি শিবহীন যজ্ঞের আয়োজন করলেন নিজের গৃহে।

নারদের মুখে সতী এই সংবাদ পেয়ে বাপের বাড়ি যাবার জন্য শিবের অনুমতি চাইলেন। কিন্তু আত্মসম্মান জ্ঞান শিবেরও আছে। তিনি বললেন ত্রিভুবন যেখানে নিমন্ত্রিত, সেখানে বিনা নিমন্ত্রণে যাওয়া যায় না। কিন্তু সতী যাবেনই। দশ মহাবিদ্যার রূপ ধারণ করে শিবকে বিভ্রান্ত করে তাঁর মত আদায় করলেন।

সতী একা এলেন দক্ষালয়ে। আর তাঁকে দেখেই দক্ষ জ্বলে উঠলেন। যা মুখে এল তাই বলে তিনি সতীকে অপমান করলেন আর গালাগালি দিলেন শিবের নামে। স্বামীর নিন্দা সতী সইতে না পেরে দেহত্যাগ করলেন।

নারদ ছুটে গিয়ে শিবকে এই সর্বনাশের খবর দিলেন। ক্রুদ্ধ শোকার্ত শিব মাথার একটা জটা ছিঁড়ে মাটিতে ফেলতেই সেই জটা থেকে বীরভদ্রের

জন্ম হল। বীরভদ্র দক্ষালয়ে গিয়ে যজ্ঞস্থল লণ্ডভণ্ড করে দক্ষের মুণ্ড কেটে ফেলল।

কিন্তু অনুতপ্ত শিব দক্ষের জীবন দিলেন ছাগমুণ্ড জুড়ে। কিন্তু গভীর শোকে আত্মবিস্মৃত হয়ে তিনি সতীর মৃত দেহ কাঁধে নিয়ে উন্মত্তের মতো বিচরণ করতে লাগলেন। বিপদ দেখে বিষ্ণু এগিয়ে এসে সুদর্শন চক্র দিয়ে সতীর দেহ খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলতে লাগলেন। দেহের একান্ন খণ্ড এ দেশের একান্ন স্থানে পড়ল। এই সমস্ত স্থান এখন পীঠস্থান নামে পরিচিত হয়েছে। শিব ও শক্তি দুই-ই সেখানে আছেন। অগণিত যাত্রীর প্রণামে ও পূজায় এই সব পীঠস্থান পবিত্র তীর্থে পরিণত হয়েছে।

সাধুজী এই গল্প নতুন করে শোনালেন না। তাউজী অন্য কথা জানতে চাইলেন, বললেন ঃ পীঠস্থানের কি নামের ঠিক নেই ?

সাধুজী হেসে বললেন ঃ তন্ত্র চূড়ামণিতে আছে একান্ন পীঠের পরিচয়। কিন্তু দেবী ভাগবতে দেখি যে জন্মেজয়ের প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি বেদব্যাস একশো আট পীঠের উল্লেখ করেছেন। কুব্জিকা তন্ত্র নামে আর একখানি তন্ত্রেও পীঠস্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু তার সঙ্গে তন্ত্রচূড়ামণির প্রভেদ আছে অনেক। এই সমস্ত মত ভেদ দেখে শিবচরিত নামে একখানি গ্রন্থে একটা সমন্বয়ের চেষ্টা করা হয়েছিল। তার ফলে পীঠস্থানের সংখ্যা হয়েছে সাতাত্তর, একান্নটি মহাপীঠ আর উপপীঠ ছাব্বিশটি।

সাধুজী থামতেই শকুন্তলাদি প্রশ্ন করলেন ঃ বাঙলা পঞ্জিকায় যে পীঠস্থানের নাম পাওয়া যায়, তা কোন্ মতে ?

সাধুজী হেসে বললেন ঃ জানি নে। তবে শুনেছি যে বাঙলার এক কবি ভারতচন্দ্র পীঠ নির্দেশের চেষ্টা করেছিলেন তাঁর অন্নদা মঙ্গল কাব্যে। কিন্তু তাতে ঐক্য সাধিত হয় নি, হওয়া সম্ভবও নয়। দেবী ভাগবতে যখন একশো আট নাম আছে, তখন কাউকে রাখতে হবে কাউকে বাদ দিয়ে। সমস্ত পীঠের স্থান নির্দেশও সম্ভব হয় নি। যেমন ত্রিনেত্র যে সর্বরায় পড়েছিল, তার কোন হদিস পাওয়া যায় না। তেমনি নেত্রাংশ তারা পড়েছে তারায়, এই নামের কোন স্থানের কথা আমরা শুনি নি। যে সব পীঠস্থান সম্বন্ধে কোন সংশয় নেই, তার পরিচয় আমি দিতে পারব।

সাধুজী চিন্তা করলেন খানিকক্ষণ, তারপরে গুরুজীর সঙ্গে পরামর্শ করে বললেন ঃ ভারতের এক প্রান্ত থেকে শুরু করি। পূর্ব থেকে পশ্চিমে, তারপরে উত্তর থেকে দক্ষিণে। চন্দ্রনাথ থেকে সোমনাথ। আর অমরনাথ থেকে রামেশ্বর।

তাউজী বললেন ঃ সেই ভাল। আমাদের তাতে মনে রাখবার সুবিধা হবে।



তারপর সাধুজী বললেন ঃ ভারতের পশ্চিম প্রান্তে হিংলাজ তীর্থ যেমন পাকিস্থানে পড়েছে, তেমনি পূর্ব প্রান্তের চন্দ্রনাথ তীর্থ পড়েছে বাংলা দেশে। আমার ভাগ্য ভাল যে দেশ বিভাগের অনেক আগেই আমি এই তীর্থ দর্শনের সুযোগ পেয়েছিলাম।

তারপর তিনি চন্দ্রনাথের যাবার পথ বললেন। কলকাতার শিয়ালদহ স্টেশন থেকে ছাড়ত চিটাগং মেল। সেই ট্রেণ পদ্মার পারে গোয়ালন্দ ঘাটে পৌঁছত। সেখান থেকে বড় স্টীমারে চেপে চাঁদপুর ঘাট। চাঁদপুর থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত রেললাইন আছে ত্রিপুরা ও নোয়াখালি জেলার উপর দিয়ে। চট্টগ্রাম থেকে সীতাকুণ্ড মাইল পঁচিশের কম। স্টেশন থেকে চন্দ্রনাথ পাহাড় মাত্র মাইল খানেক দূরে। পাহাড় খুব উঁচু নয়, প্রায় সাড়ে এগারো শো ফুট, সিঁড়ির সংখ্যা সাতশো। এই চন্দ্রনাথ একটি পীঠস্থান। এখানে সতীর দক্ষিণ বাহু পড়েছিল। দেবীর নাম ভবানী আর ভৈরব চন্দ্রশেখর।

এই তীর্থ নিয়ে একটি পৌরাণিক কাহিনীও প্রচলিত আছে। তপস্যার জন্য বেদব্যাস যখন বারাণসীতে ছিলেন, তখন ভৃগু তাঁকে নীচ জাতি বলে অপমান করেন। দুঃখে বেদব্যাস কঠোর তপস্যা করে শিবকে সন্তুষ্ট করেন এবং শিবের আদেশে দ্বিতীয় কাশী প্রতিষ্ঠা করেন চট্টলে চন্দ্রশেখরে। কলি যুগে শিব চন্দ্রশেখরে অবস্থান করবেন।

তারপরে সাধুজী চন্দ্রনাথ তীর্থের বর্ণনা শোনালেন ঃ এখানে শুধু মন্দির নয়, আরও যা আছে তার তুলনা নেই। পাশাপাশি দুটি পর্বতের চূড়া, উঁচুটির উপরে চন্দ্রনাথ ও অন্যটিতে বিরূপাক্ষের মন্দির। অনেক দূর থেকে এই মন্দির দুটি দেখা যায়। আবার উপর থেকে দেখা যায় দিগন্ত প্রসারী সমুদ্রের তরঙ্গ ভঙ্গ। একদিকে সন্দীপ দ্বীপ, অন্য দিকে বনরাজিনীলা উপকূলের পর্বতমালাকে পরম রমণীয় করেছে। পাহাড় ও সমুদ্রের এমন অপরূপ মিলন আর কোথাও দেখা যায় না।

চন্দ্রনাথে ছোট বড় তীর্থ আরও অনেক আছে। স্টেশন থেকে বাজারের পথ ধরে যেতে হয় পাহাড়ের দিকে। পথে ব্যাসকুণ্ড। বেদব্যাসের জন্য শিব তাঁর ত্রিশূল দিয়ে এই কুণ্ডটি খনন করে দেন। এর তীরে ব্যাসেশ্বর শিব ব্যাসদেব ভৈরব ও চণ্ডিকার মন্দির আছে। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠবার পথে আরও অনেক তীর্থ—হনুমানের মন্দির সীতাকুণ্ড রাম ও লক্ষ্মণ কুণ্ড মন্মথ নদ। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস যে বনবাস কালে রাম এখানে এসেছিলেন। সীতা দেবীর মন্দিরের পিছনে মাঝে মাঝে একটি আগুনের শিখা দেখতে পাওয়া যায়। লোকে এই শিখাকে বলে জ্যোতির্ময়।

চন্দ্রশেখরের পথে ভবানীর মন্দিব। মন্দিরে কালী ও দশভূজার মূর্তি। এটাই চন্দ্রনাথের পীঠস্থান। সতীর দক্ষিণ হস্ত পড়েছিল এইখানে। পর্বতের চূড়ায় অবস্থিত চন্দ্রশেখর তাঁর ভৈরব। কিন্তু সেখানে পেঁছবার আগে স্বয়ম্ভূনাথ মহাদেবের মন্দির। উত্তরে নব ভৈরব ও দ্বারে দ্বারপাল ভৈরব। রাম সীতা ও অন্নপূর্ণার মূর্তি মন্দিরের ভিতরে, বাহিরে লক্ষ্মী ও শিব। স্বয়ম্ভূনাথের মন্দিরে যে জলের ধারা সারাক্ষণ বইছে, যাত্রী সাধারণের তা বিস্ময় উদ্রেক করে। এই স্বয়ম্ভূনাথের সম্বন্ধে একটি অলৌকিক ঘটনাও প্রচলিত আছে। শম্ভু নামে এক ধোপা এই পাহাড়ের নিকট বাস করত। তার কপিলা গরুটি রোজ পালিয়ে যেত পাহাড়ে। সারাদিন পর রাতে ফিরে আসত। এক দিন সেই গরুকে অনুসরণ করে শম্ভু দেখল যে গরু দুধ দিচ্ছে একটি পাথরের উপর। রাতে শম্ভু স্বপ্ন দেখল। আর তার পরের দিন থেকেই স্বয়ম্ভূনাথের পূজার ব্যবস্থা করল।

এ রকম গল্প আমরা অনেক শুনেছি। ভারতের নানা স্থানে এই রকমের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু এখানে এর পরে নতুন ঘটনা ঘটল। লোকের মুখে খবর পেয়ে ত্রিপুরার রাজা ধন্যমাণিক্য এলেন স্বয়ম্ভূনাথকে নিজের রাজ্যে নিয়ে যেতে। কিন্তু তাঁকে তুলতে পারলেন না, হাতি লাগিয়েও বিফল হলেন। শেষ পর্যন্ত স্বপ্ন দেখলেন রাতে। শিব তো স্থানচ্যুত হবেন না, তাঁর বদলে ত্রিপুরা সুন্দরী যাবেন। কিন্তু এক রাত্রিতে যতটা সম্ভব ততটাই যাবেন, রাত্রি প্রভাত হলে তিনি হবেন অচলা। রাজা ধন্যমাণিক্য অনেক লোক নিযুক্ত করেছিলেন, কিন্তু উদয়পুরে রাত্রি প্রভাত হল। এবং উদয়পুরেই প্রতিষ্ঠা হল ত্রিপুরা সুন্দরীর। সেখানেই রাজা তাঁর মন্দির নির্মাণ করলেন। ত্রিপুরা রাজ্যের এই উদয়পুরও একটি পীঠস্থান বলে পরিচিত। আর প্রতি বছর এখানে নরবলি হত বলে আজও সবাই বিশ্বাস করে।

নরবলির নামে আমরা সবাই চমকে উঠলাম। তাই দেখে সাধুজী বললেন: রেভারেণ্ড জেম্‌স লঙ নামে এক সাহেব বলেছেন যে এখানে

কত নরবলি হয়েছে তার হিসেব নেই। কিন্তু ইংরেজ নয়, ত্রিপুরার এক রাজাই এই নরবলি তুলে দিয়েছেন। এখন নাকি ময়দার মানুষ তৈরী করে তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে সেই প্রাচীন প্রথাকে সম্মান করা হয়।

তাউজী আবার চন্দ্রনাথের কথা মনে করিয়ে দিতেই সাধুজী হেসে বললেন ঃ চন্দ্রনাথ পাহাড়ে একটি গয়া কুণ্ড আছে, যাত্রীরা পিণ্ড দেয় সেখানে। একটি গুহার মধ্যে আছে শিবলিঙ্গের মতো অনেক পাথর, সেখানে অবিরত জল পড়ছে। এর নাম ঊনকোটি শিব। তারপরে দুর্গম পথে অগ্রসর হয়ে বিরূপাক্ষের মন্দির। পুরাতন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ছাড়িয়ে নূতন মন্দির। এখান থেকেও দেখা যায় সমুদ্রের অপরূপ দৃশ্য।

চন্দ্রনাথ এখান থেকে দূরে নয়। কিন্তু মন্দির দেখে হতাশ হতে হয়। একটি চতুষ্কোন গৃহের উপরে গম্বুজ, একটি বড় ও দুটি ছোট, বারান্দায় টিনের চালা। মন্দিরের গায়ে কোন কারুকার্য নেই, কোন আকর্ষণ নেই শিল্প নৈপুণ্যের। আকর্ষণ শুধু চন্দ্রশেখর শিবের ও অদূরবর্তী সমুদ্র ও তার সৌন্দর্যের।

চন্দ্রনাথ বৌদ্ধদেরও তীর্থস্থান। মন্দিরের পিছনে এক পাথরে আছে বুদ্ধের পদচিহ্ন। তাঁর অঙ্গুলির অস্থি এই শিখরে সমাহিত আছে। চৈত্র মাসে বৌদ্ধ মেলা হয় চন্দ্রনাথ পাহাড়ে। দলে দলে বৌদ্ধ যাত্রী তখন বুদ্ধ কূপ নামে একটি কুণ্ডের মধ্যে মৃত আত্মীয় বন্ধুর অস্থি নিক্ষেপ করতে আসে।

সাধুজী একটু থেমে বললেন ঃ সীতাকুণ্ডের পারে স্টেশন বাড়বা কুণ্ড। এই কুণ্ডের জলে সারাক্ষণ আগুনের শিখা জ্বলছে। লোকে বলে মহাদেবের তৃতীয় নেত্র এটি। জ্বালামুখীতেও এমনি কুণ্ড আছে। পীঠস্থান সেটি। সতীর জিহ্বা তীর্থ। সেখানেও এমনি আগুনের শিখা দেখা যায় কুণ্ডের জলে।

শকুন্তলাদিকে আজ আমার সামনে দেখতে পাচ্ছিলাম। এবারে তিনি মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকালেন। নিঃশব্দেই তাকিয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। আমার মনে হল যে আমি তাঁর চোখের তারায় মনের কথাটি পড়তে পেরেছি। চন্দ্রনাথ বাঙালীর তীর্থ, কিন্তু এই তীর্থ আর আমরা দেখতে পাব না।



সাধুজী বললেন ঃ পূর্ব ভারতের আর একটি বড় তীর্থ হল কামাখ্যা। আসাম রাজ্যের তীর্থ। নীল পর্বতের উপরে এই তীর্থ। সুন্দর রাস্তা হয়েছে পাহাড়ের নিচে থেকে উপর পর্যন্ত। ট্যাক্সি যাতায়াত করে।

কামাখ্যাও পীঠস্থান। সতীর দক্ষিণ জঙ্ঘা পড়েছিল নেপালে, বাম জঙ্ঘা জয়ন্তি পাহাড়ে। ত্রিপুরায় তাঁর দক্ষিণ পদ পড়েছিল, আর বামপদ পড়েছিল ত্রিস্রোতায়। কামরূপের এই নীল পর্বতে যোনী পীঠ। দেবী এখানে কামাখ্যা, ভৈরব উমানন্দ।

সাধুজী বললেন ঃ কালের নিয়মে এই পীঠস্থানটিও লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এটি আবিষ্কার করেছিলেন কামদেব। সে সম্বন্ধে একটি সুন্দর পৌরাণিক উপাখ্যান আছে।

সতীর দেহ ত্যাগের শোক প্রশমিত হলে শিব হিমালয়ে ফিরে গিয়ে কঠোর তপস্যায় মগ্ন হলেন। বিপত্নীক নিঃসন্তান শিব তাপস-শ্রেষ্ঠ মহাযোগী। জীবনের একটি দুঃখের অধ্যায় তিনি কঠোর তপস্যায় বিস্মৃত হলেন। সতী জন্ম নিলেন হিমালয় গৃহে মেনকার কোলে। পর্বত কন্যার নাম হল পার্বতী। পার্বতী বড় হয়ে শিবের জন্য তপস্যা শুরু করলেন। কিন্তু শিবের ধ্যান আর ভাঙে না। দেবতারাও ব্যস্ত হলেন তাঁর বিবাহের জন্য। কিন্তু কে যাবে মহাযোগীর যোগ ভঙ্গের জন্য। শেষ পর্যন্ত বৃহস্পতির পরামর্শে দেবরাজ ইন্দ্র কামদেবকে পাঠালেন। না পাঠিয়ে তাঁর উপায় ছিল না। তারকাসুরের অত্যাচারে দেবতারা তখন জর্জরিত এবং ব্রহ্মা বলেছেন যে শিবের পুত্রই তারকাসুর বধে সমর্থ হবে। কাজেই শিবের বিবাহ দেওয়া একান্তই প্রয়োজন। কামদেব ভয়ে ভয়ে এলেন শিবের সামনে। তাঁর তপস্যা ভঙ্গ করে পার্বতীর প্রতি তাঁকে আকৃষ্ট করতে হবে বলে তিনি পুষ্পময় পঞ্চশর নিক্ষেপ করলেন। শিব চোখ মেলে দেখলেন তাঁকে, তাঁর রোষানলে কামদেব ভস্ম হয়ে গেলেন। আর শিব আবার তপস্যায় মগ্ন হয়ে গেলেন।

এই ঘটনার পিছনে ছিল ব্রহ্মার অভিশাপ। ব্রহ্মা যখন তাঁর মানস পুত্রদের সৃষ্টি করেন, তখন তাঁর মন থেকে এক সুন্দরী কন্যার জন্ম হয়। তাঁর নাম সন্ধ্যা। ব্রহ্মা তাঁর মন থেকে আর একটি পুরুষ সৃষ্টি করেন – মকরবাহন মীনকেতু কম্বুগ্রীব, পুষ্পময় পঞ্চশর ও কুসুম কার্মুকে সজ্জিত। ইনিই কামদেব, নাম মদন। ব্রহ্মাকে মদন বললেন, আমার প্রতি আদেশ? ব্রহ্মা বললেন, ত্রিভুবনে তুমি সৃষ্টির সহায়তা কর। দেব দানব মানুষ ও পশু তোমার পুষ্পবাণে মত্ত হবে। মদন বললেন, বেশ, প্রথম পরীক্ষা হোক আপনার উপরেই। বলে মদন ব্রহ্মার প্রতি শর নিক্ষেপ করলেন। সম্মুখে সন্ধ্যা। সৃষ্টিকর্তা তাঁর রূপে মোহিত হলেন। শিব বললেন, ধিক তোমাকে। ব্রহ্মা শাপ দিলেন মদনকে, শিবের রোষানলে তুমি দগ্ধ হবে। অনুতপ্ত মদন ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। ব্রহ্মা বললেন, বেশ, তোমার পুনর্জন্ম হবে। শিব যখন বিবাহ করবেন, তখন তাঁর দয়াতেই তোমার দেহ ফিরে পাবে। ধ্যানমগ্ন শিবের প্রতি পঞ্চশর নিক্ষেপ করে মদন ব্রহ্মার এই অভিশাপেই দগ্ধ হয়েছিলেন।

কিন্তু দেবতারা প্রমাদ গণলেন। পার্বতী হলেন মর্মাহত, কিন্তু নিরাশ হলেন না। আরও কঠোর তপস্যায় শিবের ধ্যান ভঙ্গ করলেন। শিব জাগলেন, জানলেনও সব। ব্রহ্মা এসে বিবাহের সম্বন্ধ করলেন। হর পার্বতীর বিবাহ হল হিমালয় গৃহে। এই বিবাহে এসেছিলেন অতনু মদনের পত্নী রতি। শিবের কাছে প্রার্থনা করে স্বামীর পুনর্জীবন লাভের বর পেলেন।

কিন্তু এইখান থেকেই কামাখ্যার কিংবদন্তীর আরম্ভ। মদন পুনর্জীবন পেলেও তাঁর স্বরূপ ফিরে পেলেন না। তারপর স্বামী স্ত্রীর স্তব স্তুতিতে তুষ্ট হয়ে শিব বললেন, ভারতের ঈশাণ কোণে সতী দেহের এক অংশ এখনও গোপন আছে, তা আবিষ্কার করে দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার করলেই তোমার পূর্বরূপ ফিরে পাবে। এই আদেশ পেয়ে কামদেব রতিকে নিয়ে এলেন নীল পর্বতে। তারপর দেবীর এই পীঠ আবিষ্কার করে নিজের পূর্ব রূপ ফিরে পেলেন। এই ঘটনার জন্যেই তীর্থের নাম হল কামরূপ, আর দেবী কামাখ্যা নামে পরিচিত হলেন। কামদেবই কামাখ্যার প্রথম মন্দির প্রতিষ্ঠা করে তার নাম দিয়েছিলেন আনন্দাখ্য মন্দির। বিশ্বকর্মা এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। যে অন্ধকার গুহায় দেবীর পীঠস্থান, কামদেবের নামে তার নাম হয়েছে মনোভব গুহা।

তখন এই নীলাচল পর্বতে ওঠার কোন পথ ছিল না। প্রথম পথ নির্মাণ করেছিলেন নরকাসুর। মন্দিরটিও তিনি নির্মাণ করেছিলেন বলে অনেকের বিশ্বাস। দেবী ভগবতী নাকি একদিন নরককে দেখা দিয়েছিলেন।

নরক তাঁর অলৌকিক রূপে মুগ্ধ হয়ে দেবীকে পত্নী রূপে পাবার বাসনা প্রকাশ করেন। দেবী বললেন, বেশ, এক রাত্রির মধ্যে এই পাহাড়ের চারি দিকে চারটি পাথরের সোপান পথ আর একটি বিশ্রাম গৃহ নির্মাণ করে দিলে তিনি ধরা দেবেন। কিন্তু তা না পারলে তাঁকে মৃত্যু বরণ করতে হবে। গর্বোদ্ধত অসুর বললেন, তথাস্তু। তারপর সেই পথ নির্মাণ শুরু হল। এক রাত্রির মধ্যেই নরক চারটি পথ নির্মাণ শেষ করে বিশ্রাম গৃহ তৈরির আয়োজন করলেন। নরকের কর্মকুশলতায় দেবী বিস্মিত ও উদ্বিগ্ন হলেন। তারপর আশ্রয় নিলেন ছলনার। এক মায়া মোরগ সৃষ্টি করে রাত্রি শেষের সংকেত ধ্বনি জানিয়ে দিলেন। অসময়ে এই মোরগের ডাক শুনে নরক আশ্চর্য হয়েছিলেন। আর দেবী বলেছিলেন, বন্ধ কর কাজ, তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়েছে। ক্রোধে অন্ধ হয়ে নরকাসুর সেই মোরগের পিছনে ধাওয়া করে ব্রহ্মপুত্রের পরপারে তাকে বধ করেন।

পাণ্ডুঘাট থেকে যে পথ এই পাহাড়ে উঠেছে, সেই পথের উপরে আছে সিংহদ্বার। সেখানে গণেশের মূর্তির নিকটে একটি শিলা নরকাসুরের স্মৃতি বহন করছে। আর তিনটি পথের উপরে আছে স্বর্ণদ্বার ব্যাঘ্রদ্বার ও হনুমন্তদ্বার। পাণ্ডু গৌহাটি পথের পাশে নীলাচল পর্বতের দক্ষিণে যে পাহাড়, তার নাম নরকাসুরের পর্বত। লোকে বলে যে এই পাহাড়ে ছিল নরকাসুরের রাজধানী।

পুরাকালে এই পর্বতারোহণের একটা বিধি ছিল। পূর্ব দিকের পথ ধরে আরোহণ করলে ধন লাভ হয়, রাজ্য লাভ হয় পশ্চিমের পথ দিয়ে আরোহণে। মুক্তি লাভের আশা থাকলে উত্তরের পথ ধরতে হবে, আর দক্ষিণের পথ ধরলে মৃত্যু সুনিশ্চিত। উত্তর ও পশ্চিম দিকের পথের চিহ্ন এখন আর নেই। এখন শুধু দক্ষিণ ও পূর্বের পথই সুগম আছে। পূর্বের পথটিই যাত্রীদের প্রিয়। পথের দুধারে গুলঞ্চ ফুলের গাছ, তারই ছায়ায় ছায়ায় পথের শোভা দেখতে দেখতে অনেক যাত্রী ওঠেন। পাহাড় বেশী উঁচু নয়, মন্দিরের উচ্চতা মাত্র পাঁচশো পঁচিশ ফুট। এই পাহাড়েরই শৃঙ্গে ভুবনেশ্বরীর মন্দির, তার উচ্চতা ছশো নব্বুই ফুট। এই পাহাড়ে ওঠার কষ্ট যাত্রীদের আর স্বীকার করতে হয় না। প্রায় সবাই আজকাল মোটরে যাতায়াত করছে। মোটর এসে যেখানে দাঁড়ায়, সেখানেই ছোট ছোট দোকানে নানা রকমের জিনিষ আছে সাজানো। পূজার জন্য সব কিছুই সেখানে পাওয়া যায়। নিকটে ব্রাহ্মণ পল্লী আছে বলে অন্যান্য সব রকম জিনিষও কিছু কিছু আছে। পাণ্ডাদের গৃহে যাত্রীদের বসবাসের ব্যবস্থা আছে। তাঁরা এই পাহাড়েই থাকেন।

মন্দিরের উত্তর দিকে এক পুষ্করিণীর নাম সৌভাগ্য কুণ্ড। ইন্দ্রাদি

দেবতারা এই কুণ্ড নির্মাণ করেছেন। এখানে স্নান তর্পণের বিধি আছে। সিদ্ধিদাতা গণেশ আছেন কুণ্ডের ধারে। দেবীর মন্দিরের ভিতর প্রথমেই দ্বাদশ স্তম্ভের মাঝখানে হরগৌরীর ভোগ মূর্তি। সেখানে বলে চলন্তা মূর্তি, তার মানে উৎসবের জন্য নির্মিত দেবতার একটি সচল মূর্তি। পাথরের এক সিংহাসনে অষ্টধাতুর হরগৌরী অধিষ্ঠিত। কৃষ্ণবাহন কামেশ্বর শিবের পঞ্চবক্র ও দশভুজ, সিংহ-শব পদ্মাসন দেবী মহামায়ার ষড়ানন ও দ্বাদশ বাহু। পদ্ম সিংহ ও শব ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের প্রতীক। শক্তিশালী মহামায়াকে তাঁরাই ধারণ করে আছেন। দেবীকে এই মূর্তিতে পূজা করলে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরেরও পূজা করা হয়। উৎসবের দিনে এই মূর্তি নিয়ে মন্দিরের বাহিরে শোভাযাত্রা হয়।

তারপরে একটি স্বল্পালোকিত গর্ভগৃহ। অন্ধকারে চারি দিক ভাল করে দেখা যায় না। খুব সন্তর্পণে একটি একটি করে দশটি ধাপ নিচে নামতে হয়। ঘন অন্ধকারে আবৃত একটি গুহা। এরই নাম মনোভব গুহা। সেখানে একটি প্রদীপ জ্বলে। পূজারী ব্রাহ্মণেরা এইখানে অপেক্ষা করেন যাত্রীর। কোন দেবতা নেই, কোন বিগ্রহ নেই। প্রদীপের আলোয় শুধু একটি শিলাপীঠ দেখতে পাওয়া যায়। আধখানা সোনার টোপর ও কাপড় দিয়ে ঢাকা, তার উপর ফুলের মালা। সামনে জলের ধারা, যাত্রীরা হাত বাড়িয়ে জল স্পর্শ করেন।

দেবীর পীঠের এই জল নাকি পাতাল থেকে উঠছে। যোগিনী তন্ত্রে আছে যে দেবীকে স্পর্শ করে এই জল পান করলে দেবঋণ ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ পরিশোধ হয়। কালিকা পুরাণের মতে দেবীর পূজা করে এক কোটি গোদানের পুণ্যফল লাভ হয়।

সাধুজী ভাবলেন খানিকক্ষণ, তারপরে বললেন: কামাখ্যায় দশ মহাবিদ্যারও পীঠ আছে। কামাখ্যা নিজে এখানে ষোড়শী, লক্ষ্মী সরস্বতী হলেন কমলা ও মাতঙ্গী। পাহাড়ের চূড়ায় ভুবনেশ্বরী, আর অন্যান্য বিদ্যার মন্দিরগুলি কিছু দূরে দূরে। এ ছাড়াও এখানে আরও অনেক মন্দির আছে। পঞ্চাননের পঞ্চমুখের পাঁচটি শিব মন্দির ও কমলাখ্য নামে বিষ্ণুর মন্দির। বনের ভিতরে বনবাসিনী জয়দুর্গা ও ললিতকান্তার শিলাপীঠ এবং কামেশ্বর ও সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের মাঝখানে কেদারক্ষেত্র। দেবী এখানে কুমারী রূপে বিরাজিতা বলে যাত্রীরা কুমারী পূজা না করে ফেরেন না। একটি কুমারীর পূজাতেই নাকি এখানে সকলের পূজা হয়।

সাধুজী থামতেই তাউজী বললেন: ভৈরবের কথা কিছু বললেন না?

সাধুজী বললেন: কামাখ্যার ভৈরব উমানন্দ আছেন ভারতের বিপুলতম নদী ব্রহ্মপুত্রের বুকে একটি অরণ্য বেষ্টিত শৈলে। ভুবনেশ্বরের মন্দির দেখতে

পাহাড়ের চূড়ায় উঠে ব্রহ্মপুত্র দেখেছিলাম এক দিকে, আর হিমালয়ের কয়েকটি তুষার শৃঙ্গ, অন্য দিকে দেখেছিলাম গোহাটি শহর। চমৎকার দৃশ্য। কিন্তু উমানন্দ দেখতে হলে ব্রহ্মপুত্রের তীরে খেয়াঘাটে যেতে হয়। নৌকো ও মোটর লঞ্চ দুইই আছে। ব্রহ্মপুত্রের মাঝখানে এই দ্বীপ, নাম পিকক্ আইল্যাণ্ড। বর্ষার সময় খেয়া পারাপার খুবই বিপজ্জনক, অন্য সময় নয়। উমানন্দ ঠিক দ্বীপ নয়। একটি অনুচ্চ পাহাড় জলের উপরে জেগে আছে। শোনা যায় যে কামাখ্যা পাহাড়ের সঙ্গে এই উমানন্দ পাহাড় এক সময় যুক্ত ছিল, এটি ছিল নীল পর্বতেরই অংশ। এখন এর দূরত্ব প্রায় মাইল দুয়েক।

খাড়া সিঁড়ি ভেঙে মন্দিরে উঠতে হয়। কামাখ্যার মতো একই ধরণের মন্দির। আর দেবতাও আছেন নিচে একটি গুহার ভিতরে। শিবলিঙ্গ একটি পিতলের পাত্র দিয়ে ঢাকা থাকে।

আমি ভেবেছিলাম যে কামাখ্যার কথা বুঝি ফুরিয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই দেখলাম যে তা নয়। সাধুজী বললেন : কামাখ্যা দর্শনে এলে লোকে কামাখ্যা আর উমানন্দ দেখেই ফিরে যায় না, মাইল সাতেক দূরে বশিষ্ঠাশ্রমও দেখতে যায়। বশিষ্ঠ মুনি তপস্যা করেছিলেন এইখানে। রাজর্ষি নিমির শাপে বশিষ্ঠ বিদেহ হয়েছিলেন। এইখানে তপস্যা করে তিনি দেহ লাভ করেছিলেন। গঙ্গা এখানে নাকি সন্ধ্যা ললিতা ও কান্তা নামে ত্রিধারায় প্রবাহিতা। এই ত্রিধারায় বশিষ্ঠ নিত্য স্নান করতেন বলে এখন এই ঝর্ণাটি বশিষ্ঠ গঙ্গা নামে পরিচিত। বশিষ্ঠের মন্দির আছে, মন্দিরে তাঁর পদচিহ্ন বিদ্যমান। অরুন্ধতীর নামেও একটি শিলাচিহ্ন আছে খানিকটা দূরে।

ব্রহ্মপুত্রের এপারে ওপারে এবং নদীবক্ষেও আরও অনেক ছোট বড় তীর্থস্থান আছে। কয়েক দিন থেকে ঘুরে ঘুরে সেগুলি দেখতে হয়।



সাধুজী বললেন : শুনে আশ্চর্য হতে হয় যে কলকাতার কালীঘাটও একটি পীঠস্থান। সতীর দক্ষিণ পদাঙ্গুলি পড়ে এই পীঠস্থান হয়েছে। দেবী এখানে কালী ও নকুলেশ্বর তাঁর ভৈরব। আদি গঙ্গার তীরে এই কালীঘাট।

সামনে আদি গঙ্গা। একটি নালা, ইংরেজরা একে টলি সাহেবের নালা বলত। কোন সময়ে গঙ্গার ধারা এই খাল দিয়ে বইত বলেই এর নাম হয়েছে আদি গঙ্গা। আদি গঙ্গায় স্নান করে যাত্রীরা কালী দর্শন করেন। এখন আমরা যে মন্দির দেখি, তা নির্মিত হয়েছে সাবর্ণ চৌধুরী সন্তোষ রায়ের ব্যয়ে দেড় শো বছরের কিছু আগে।

হাওড়া বা শিয়ালদহ স্টেশন থেকে এবং শহরের যে কোন স্থান থেকে কালীঘাটে এসে নামা যায়! সদর রাস্তা থেকে পায়ে হেঁটেই মন্দিরে পৌঁছানো যায়। গাড়ি ঘোড়াও আসে মন্দির পর্যন্ত। আদি গঙ্গা মন্দিরের সামনে নয়, আদি গঙ্গা পিছনে। পরিচ্ছন্ন পথে খানিকটা এগিয়ে গেলেই আদি গঙ্গা।

তাউজি বললেন : মন্দির ও দেবতার কথা কিছু বলবেন না ?

সাধুজী বললেন : মন্দিরের বর্ণনা দিতে পারি এমন স্মৃতি শক্তি আমার নেই। তবে এইটুকু মনে আছে যে কামরূপে যেমন মন্দিরের একটা বিশিষ্ট রূপ দেখেছি, এখানেও তেমনি। একেবারে বাঙলার নিজস্ব রূপ। চার চালার মতো গর্ভগৃহ, তার উপরে শিখর। আর দেবতার রূপ ? কালীকরালবদনা দশমহাবিদ্যার প্রথম রূপ। অতি বিস্তার বদনা জিহ্বাললনভীষন্দ। মায়ের এই ভয়ঙ্কর রূপের সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত আছি। এই রূপেই সতী শিবকে ভয় দেখিয়ে দক্ষযজ্ঞে যাবার অনুমতি আদায় করেছিলেন।

কিন্তু শিব সর্বত্রই শান্ত সমাহিত রূপহীন শিলাখণ্ড। পাথরকে আমরা শিব কল্পনা করে পূজা করি। কালীঘাটের মন্দিরে শিব আছেন, আছেন শ্যামরায় ও গোবিন্দজী। কিন্তু মায়ের ভৈরব নকুলেশ্বর শিব আছেন খানিকটা তফাতে। শতাধিক বছর আগে তিনি একটি কুটীরে ছিলেন। শুনে আশ্চর্য হতে হয় যে তারা সিং নামে একজন পাঞ্জাবী বণিক শিবের মন্দির তৈরি করে দিয়েছেন। শোনা যায় যে বিদেশী খ্রীষ্টানরাও এই মন্দিরে দান করেছেন।



এর পরেই সাধুজী বললেন ঃ কোন পীঠস্থান নয়, কোন পৌরাণিক তীর্থও নয়, অথচ তারকেশ্বর বাঙলার একটি প্রিয় তীর্থ। স্বীকার করতে আমার সঙ্কোচ নেই যে এই তীর্থের নাম আমার জানা ছিল না। আমি দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে রামকৃষ্ণদেবের সাধনার স্থান দেখেছি, দেখেছি বেলুড় মঠ। চৈতন্য দেবের জন্মস্থান নবদ্বীপও দেখে এসেছি। তমলুকের বর্গভীমা, বক্রেশ্বর, হংসেশ্বরীর নাম যেমন শুনেছিলাম, তেমনি তারকেশ্বরের নামও শুনলাম। কলকাতা থেকে ছত্রিশ মাইল পথ, শাখা লাইনে হলেও যাতায়াতের অসুবিধা নেই। তাই ভেবেছিলাম, দেখে আসি তারকেশ্বর। শিবরাত্রি নয়, অন্য কোন তিথি ছিল সেদিন। অনেক যাত্রী আছে। আমিও গেলাম। আর সেখানে গিয়েই বুঝলাম যে তারকেশ্বরে না গেলে সেখানকার মাহাত্ম্য আমার জানা হত না।

তাউজী তাঁর রুপোর ফ্রেমের চশমা নামিয়ে গপ্পে মনোযোগ দিয়েছিলেন। এখন কিছু লিখতে হবে না বুঝতে পেরে হাতের পেন্সিলটিও নামিয়ে রাখলেন খাতার উপরে। আমরাও বেশ স্বচ্ছন্দে বসে ছিলাম।

সাধুজী বললেন ঃ প্রথমে দৃষ্টি পড়ল এক দল লোকের উপর। তারা কাঁধে বাঁক নিয়ে হনহন করে পায়ে হেঁটে চলেছে। এঁরা সকলেই দরিদ্র গ্রামবাসী নয়, সুখী ভদ্রলোক ও মহিলাও দেখলাম কয়েকজন। ধবধবে সাদা ধুতির উপরে গেঞ্জি পরেছেন, খালি পা, কাঁধে বাঁক। মহিলারা শাড়ির আঁচল কোমরে জড়িয়ে চলেছেন। ক্লান্ত দেখাচ্ছে কয়েকজনকে। তাই ট্রেনের এক সহযাত্রীকে আমি এঁদের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। জানতে পারলাম যে এঁরা শেষ রাতে গঙ্গা থেকে জল নিয়ে যাত্রা করেছেন, তারকেশ্বরের মাথায় এই জল চড়াবেন। সাধারণত সন্ধ্যা রাতে যাত্রা করে যাত্রীরা ভোর বেলায় পৌঁছায় তারকেশ্বরে। মানৎ করে এই রকমের। শিবের জন্ম মাস শ্রাবণেই এ পুণ্য অর্জনের সময়।

সাধুজী বললেন ঃ নানা রকমের মানৎ থাকে, তার মধ্যে রোগ মুক্তির

মানতই বেশি। শিব তো বৈদ্যনাথ। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বৈদ্য। তাই রোগ থেকে মুক্তি পাবার জন্যেই বাবার কাছে ছুটোছুটি, হত্যা, ধর্না, দণ্ডী খাটা।

তাউজী বললেন: সে সব আবার কী?

সহাস্যে সাধুজী বললেন: মানুষের চাওয়ার তো শেষ নেই। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কিছু না কিছু চাই। মৃত্যুটাও এড়াতে চাই। যেমন চাওয়া, তেমনি প্রতিশ্রুতি। কেউ গঙ্গা থেকে জল আনছে পায়ে হেঁটে, কেউ মন্দিরের প্রাঙ্গণে যথাবিধি হত্যা বা ধর্না দিয়ে পড়ে আছে। অনাহারে অনিদ্রায় বাবার নাম করছে সারাক্ষণ। নিতান্ত অশক্ত হলে তিন দিন পর একটু চরণামৃত পান করতে পারে। বাবার স্বপ্নাদেশ পেলেই ব্রত শেষ। একাগ্রতা থাকলে স্বপ্নাদেশ পাবেই, মনস্কামনা নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে। দণ্ডী খেটেও যাত্রী আসে, মন্দির পরিক্রমা করে। সে বড় কঠিন কাজ। সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়তে হবে, হাতের আঙুল দিয়ে দাগ কেটে উঠে কয়েক পা এগিয়ে আবার শুয়ে পড়তে হবে। আবার দাগ কাটা। দাগ কেটে কেটে এগোনো। এরই নাম দণ্ডী খাটা। এই যে বিশ্বাস, এই বিশ্বাসেই তারকেশ্বর মহিমান্বিত।

তারকেশ্বরের ইতিহাস খুব পুরানো নয়। মনে হয় যে আড়াই শো বছর আগে এই তীর্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানেও সেই চন্দ্রনাথের মতো গল্প। কপিলা নামে গাভী এসে দুধ দিত পাথরের উপরে। এই পাথরের উপরে মেয়েরা ধান ভানত। পাথরের মাথায় একটি গর্ত হয়েছিল এই জন্যে। আর কপিলা এই গর্তেই দুধ দিত। দুধ কম হচ্ছে দেখে মুকুন্দ ঘোষ গাভীকে অনুসরণ করে এই ঘটনা দেখতে পেল। অনেকে বলে মুকুন্দ ঘোষ ছিল বামনগরের রাজা ভারমল্লের গো-রক্ষক। রাজা এই সংবাদ পেলেন মুকুন্দ ঘোষের কাছে। তারপরে বাবার মন্দির তৈরি হল, পুরোহিত নিযুক্ত হল। মঠ হল, মোহন্তরা এলেন। সে অন্য গল্প।

তাউজী বললেন: মন্দিরে কী দেখেছেন বলবেন না?

সাধুজী বললেন: স্টেশন থেকে মন্দির বেশি দূরে নয়। বাজারের মধ্যে দিয়ে পথ আধ-মাইলের বেশি হবে না। মন্দিরের পাশে একটি পরিষ্কার জলের সরোবর আছে। তার স্থানীয় নাম দুধ পুকুর। যাত্রীরা এই পুকুরে স্নান করে মন্দিরে প্রবেশ করেন। তার জন্যে লাইন দিয়ে দাঁড়াতে হয়। ছোট মন্দির, ভিতরে যাত্রী দাঁড়াবার স্থান কম। কাজেই যাত্রীরা বেশি সময় ভিতরে থাকলে বাহিরের যাত্রীদের বহুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। মন্দিরের ভিতরে অন্ধকারও বটে। কাজেই বাবার দর্শন আমার ভাল করে হয় নি। ভিড়ের চাপে ভিতরে ঢুকেছিলাম, আবার সেই চাপেই বেরিয়ে এসেছিলাম।

মন্দিরের বাহিরে নাটমন্দির নহবৎখানা গদীঘর আছে। কালীর মন্দির আছে একটি। ছোটখাট মন্দির আরও আছে। মুকুন্দ ঘোষের সমাধিও আছে মন্দিরের নিকটে।

তারপর সাধুজী বললেন: তারকেশ্বর থেকে ফেরার পথে আমি অনেক অলৌকিক গল্প শুনেছিলাম। তার কয়েকটি আমার এখনও মনে আছে। তারকেশ্বরের কাছে নাকি হিন্দু মুসলমান কোন প্রভেদ নেই। এক দিন এক অন্ধ মুসলমান চলেছিল বাবার পুজো দিতে। পথে এক ব্রাহ্মণ বলল, তোমার চোখে কী হয়েছে? বলে তার চোখে হাত বুলিয়ে দিল। মুসলমান ভক্তটি আশ্চর্য হয়ে দেখল যে সে তখন সব দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু যে ব্রাহ্মণ তার সঙ্গে কথা বলেছিল, তাকে কোথাও দেখতে পেল না। আর একবার আর এক মুসলমান মানৎ করেছিল বাবার কাছে, তার গরুর মৃতবৎসা দোষ যেন দূর হয়। দোষ যখন দূর হল, তখন সে সেই গরুর দুধ আনল বাবার ভোগের জন্য। কিন্তু দ্বারীরা তাকে অস্পৃশ্য বলে তাড়িয়ে দিল। সে বেচারা এক নির্জন স্থানে বসে কাঁদতে লাগল। এই সময়ে এক সন্ন্যাসী এসে বললেন, আমি তোমার দুধ খাব। বলে এক সোনার বাটিতে দুধ খেয়ে বাটি ফেলে চলে গেলেন। এদিকে মন্দিরের মধ্যে হৈ চৈ। বাবার ভোগের সময় তাঁর সোনার বাটি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ব্রাহ্মণেরা ছুটলেন চারি দিকে। সেই মুসলমানের কাছে এসে দেখলেন যে সোনার বাটি তারই কাছে পড়ে আছে। ভক্তের হাত থেকে দুধ খেয়ে গেছেন ভক্তের ভগবান।

এমনি আরও কত গল্প, কত অলৌকিক কাহিনী। এ সবে বিশ্বাস আমাদের আজও হারায় নি। এ বিশ্বাস হারালে আমরা নিঃস্ব হয়ে যাব।



সাধুজী আজ আর কিছু বলবেন কিনা, আমি সেই কথা ভাবছিলাম। আমার মতো আরও অনেকের বোধ হয় এই কথা মনে হয়েছিল। সাধুজী কিছু বলতে না পেরে তাউজীর দিকে তাকালেন। তাউজী বললেন: যদি কষ্ট না হয় তো পূর্ব ভারতের তীর্থগুলির কথা আজই শেষ করুন।

সাধুজী বললেন : কলকাতা থেকে আমি পুরী ও ভুবনেশ্বরে গিয়েছিলাম, তারপরে ফিরেছিলাম এই দিকে। কলকাতা থেকে পুরী কত মাইল দূরে, আমি তা বলতে পারব না। তবে এক রাত্রির যাত্রা। খেয়ে দেয়ে রাতের ট্রেনে চাপলে সকালবেলায় পুরী পৌঁছনো যায়। এই গাড়ি ভুবনেশ্বরের উপর দিয়েই যায়। ভুবনেশ্বর উড়িষ্যার রাজধানী, কিন্তু আকর্ষণ বেশি পুরীর। পুরীর সমুদ্র তীর্থের আকর্ষণ আরও বাড়িয়েছে। তীর্থ মাহাত্ম্যেও পুরী ভুবনেশ্বরের উপরে।

পুরীতে বাসস্থানের অভাব নেই। তীর্থযাত্রীরা ধর্মশালায় ওঠেন, আর সমুদ্র বিলাসীরা ওঠেন সমুদ্রের ধারের হোটেলগুলিতে। মন্দির সমুদ্রের ধারে নয়, শহরের মাঝখানে জগন্নাথদেবের মন্দির। স্টেশনে নেমে স্থির করতে হয়, সমুদ্রের ধারে থাকলে ভাল লাগবে, না মন্দিরের কাছে। সমুদ্রের ধার থেকেও মন্দির বেশি দূরে নয়। স্বর্গদ্বার নামে যে স্থান, সেখান থেকে কয়েক মিনিট হাঁটলেই মন্দিরের সিংহদ্বারে পৌঁছানো যায়। উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা মন্দির, চারি দিকে চারটি দরজা আছে। প্রধান দরজা সিংহদ্বার হল পূর্বে। এই দ্বারের সামনেই আছে অরুণস্তম্ভ। বাজার হাটও এই দিকে, যাত্রীরাও এই দ্বার দিয়ে যাতায়াত করেন।

সাধুজী হেসে বললেন : সকল তীর্থস্থানের মতো পাণ্ডারা আক্রমণ করবেই, আর আটকিয়া বন্ধনের জন্য পীড়াপীড়ি করবে যাত্রীকে।

আটকিয়া বন্ধন কী ?

বলে তাউজী সাধুজীর দিকে তাকাতেই তিনি বললেন : পণ্ডায়েতের খাতায় টাকা জমা দিয়ে জগন্নাথ দেবের ভোগের ব্যবস্থা করাকে আটকিয়া বন্ধন বলে। টাকার পরিমাণ শুনলে আশ্চর্য হতে হয়। সাধারণ ডাল ভাত তরকারীর ভোগ দিতে হলে একশো বত্রিশ টাকা জমা দিতে হবে, আর ছাপ্পান্ন পদের ভোগের জন্য পাঁচ হাজার ছশো টাকা। সাধারণ যাত্রীকে পাণ্ডার সঙ্গে দরাদরি করে ব্যবস্থা করতে হয়। সাড়ে সাত টাকার নিচে আর আটকিয়া বন্ধন বা আটকে হয় না। অন্য ভোগ হয়, পূজা হয়, মালা হয়।

উড়িষ্যার অন্যান্য মন্দিরের মতো এ মন্দিরেও চারটি ভাগ—মূল মন্দির, নাট মন্দির, ভোগ মন্দির ও জগমোহন। প্রাঙ্গণ দুটি—অন্তর্প্রাঙ্গণ ও বহির্প্রাঙ্গণ। কালোপাথরের অরুণ স্তম্ভ সিংহদ্বারের সামনে, আর গরুড় স্তম্ভ ভোগ মন্দিরে। অন্তর্প্রাঙ্গনে আছেন অনেক দেবদেবী। অক্ষয়বট দেখিয়ে পাণ্ডারা বলে, স্পর্শ করুন এই কল্পতরুকে, ধন মান পত্নী পুত্র কন্যা যা চাইবেন, তাই পাবেন।

মূল মন্দিরের দরজা দিয়ে ঢুকে দেবতার দর্শন পেলাম। কালো পাথরের বেদীর উপরে জগন্নাথদেব। ঠুঁটো জগন্নাথ একা নন, সঙ্গে

বলরাম ও সুভদ্রা, সুদর্শন চক্রও আছে। রঙ করা কাঠের মূর্তি। তাই কলেবর পরিবর্তন করতে হয়। নব কলেবর এখানকার সব চেয়ে বড় উৎসব। তারপর রথযাত্রা। বড় বড় তিনটি রথে এই তিন দেবতা গুণ্ডিচা বাড়ি যাবেন, আর ফিরবেন এক সপ্তাহ পরে।

স্বর্গদ্বারের কাছে আছে হরিদাস ঠাকুরের সমাধি, আর সারস্বত গৌরীয় মঠ। যবন হরিদাস ছিলেন চৈতন্যদেবের ভক্ত। পুরীতে মঠ ও আশ্রমের শেষ নেই। পুরোষোত্তম গৌড়ীয় মঠ, মিশন গৌড়ীয় মঠ, আর গোবর্ধন মঠ। গোবর্ধন মঠের কথায় শঙ্করাচার্যের কথা এসে পড়ে। শঙ্করাচার্য ভারতে চারটি মঠ স্থাপন করেছিলেন বেদান্ত চর্চার জন্যে—পূর্বে পুরীতে গোবর্ধন মঠ, পশ্চিমে দ্বারকায় সারদা মঠ, উত্তরে যোশীমঠ আর দক্ষিণে শৃঙ্গেরী মঠ। এই সব মঠে নানা দেবদেবীর মন্দির আছে, আর আছে শাস্ত্র চর্চার ব্যবস্থা। বাসুদেব আশ্রমে কৃষ্ণের মূর্তি আছে, আর সিদ্ধবকুলে আছে একটি প্রাচীন বকুল গাছ। এই বকুল গাছের নিচে তপস্যা করে যবন হরিদাস সিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

এই নিয়ে একটি সুন্দর গল্প আছে। যবন হরিদাস তপস্যা করতেন প্রখর সূর্যের নিচে। এক দিন একখণ্ড বকুলের ডালে দাঁত ঘষতে ঘষতে চৈতন্যদেব এলেন ভক্তকে দেখতে। এসে তাঁর কষ্ট দেখে সেই ডালটি মাটিতে পুঁতে দিলেন। দেখতে দেখতে একটি বকুল গাছ বেড়ে উঠে তাঁর মাথার উপরে স্নিগ্ধ ছায়া বিস্তার করল। একবার জগন্নাথদেবের নব কলেবরের সময় রাজা বললেন, ঐ বকুল গাছটি চাই। তিনি কোন কথা মানলেন না, লোক পাঠালেন গাছটা কাটবার জন্য। তারা এসে দেখল, আশ্চর্য ব্যাপার! গাছ আছে, গুঁড়ি নেই। কাঠের বদলে ভিতরটা একেবারে ফাঁপা, শুধু বাকলের উপরে ডালপালা। সিদ্ধ বকুলের সেই অবস্থা আমি দেখে এসেছিলাম।

সাধুজী বললেন: গম্ভীরার আবহাওয়া সত্যিই গম্ভীর। সেখানে চৈতন্যদেবের পাদুকা কমণ্ডলু ও কাঁথা সযত্নে রাখা আছে। বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য যেখানে চৈতন্যদেবের সঙ্গে তর্ক করেন, সে জায়গাটিও আছে। আর আছে রাধাকান্ত মন্দির। এ সব জায়গায় এসে নিশ্চিন্তে বসতে হয়। দেবতার দর্শন হয় চিন্তার গভীরতায়।

শ্বেত গঙ্গা একটি বাঁধানো চতুষ্কোণ সরোবর। ত্রেতাযুগে শত বর্ষ অনশন করবার পর শ্বেতরাজ মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের সঙ্গে জগন্নাথদেবের অর্চনা করেছিলেন। এখন তিনি ভগবানের মৎস্য অবতারের সঙ্গে শ্বেতমাধব রূপে বিরাজিত। এই সরোবরের তীরে দাঁড়িয়ে জগন্নাথদেবের মন্দিরের চূড়া দেখা যায়। মন্দিরের পিছন দিয়ে ঘুরে মার্কণ্ডেয় সরোবরে যেতে

হয়। বেশ গ্রাম্য পরিবেশ। কিন্তু সরোবরটি বাঁধানো। মার্কণ্ডেশ্বর মহাদেবের মন্দির রাস্তার ধারেই। লোকে বলে যে সত্য যুগে মহারাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এই মন্দির নির্মাণ করেছেন। এই তীর্থ দর্শনে নাকি অশ্বমেধ যজ্ঞের পুণ্য হয়।

সাধুজী বললেন ঃ দ্রষ্টব্য স্থানের শেষ নেই পুরীতে। মহাদেবই কত—মার্কণ্ডেশ্বর কপোতেশ্বর লোকনাথ। সদর রাস্তার উপরে জগন্নাথ বল্লভ একটি মঠ। নিকটে নরেন্দ্র সরোবর স্বচ্ছ জলের বিরাট পুষ্করিণী। এরই ধার দিয়ে বাঁধানো রাস্তায় আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সমাধি মন্দিরে যেতে হয়। এই নিঃসম্বল সাধু পুরীতে এসে ধনী হয়েছিলেন। মানুষ তাঁকে অঞ্জলি ভরে দিয়েছিল। এই সমাধি মন্দিরে তাঁর উপদেশ স্পষ্ট অক্ষরে লেখা আছে। আর একটু এগিয়েই কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর সমাধি আশ্রম।

এখান থেকে গ্রাম্য পথে আঠারো নালা যেতে হয়। রাস্তার ধারে সবুজ ধানের ক্ষেত দিগন্ত বিস্তৃত। এই নালাকে বলে ভাগীরথী নদী। অনেক দিন আগে সমুদ্রের সঙ্গে যোগ ছিল। আজও তাই বারো বছর পর পর সমুদ্রের পূজা হয়। দেশের কোন কল্যাণের জন্য রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন নাকি তাঁর আঠারোটি ছেলেকে এইখানে কেটেছিলেন। এরই কাছে লক্ষ্মীজলায় বারো মাস ধান হয়।

মন্দিরের সামনে থেকে যে বড় রাস্তাটা সোজা এগিয়ে গেছে, তারই শেষ প্রান্তে গুণ্ডিচা বাড়ি। দূরত্ব প্রায় দু মাইল হবে। এই তীর্থের সঙ্গে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের নাম ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে। গুণ্ডিচা নাকি তাঁর পাটরাণীর নাম। এই নামেই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা। মন্দির খুব পুরনো মনে হয় না। বাহির থেকে প্রাচীর দেখে জেলখানার মতোই মনে হয়। রথযাত্রার সময় জগন্নাথ দেবের দারুমূর্তি সিংহদ্বার দিয়ে ভিতরে আনা হয় এবং বাহিরে নিয়ে যাওয়া হয় বিজয় দ্বার দিয়ে। বিশ্বকর্মা নাকি এই গুণ্ডিচা বাড়িতেই দারুব্রহ্মের ওঙ্কার মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন।

ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর বেশি দূরে নয়। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন যজ্ঞের দক্ষিণায় অসংখ্য গাভী দান করেছিলেন। সেই গরুর ক্ষুরে গর্ত ও উৎসর্গের জলে জলাশয় হয়েছে। এই সরোবরে স্নান ও তর্পণ করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয়। পাথর দিয়ে বাঁধানো এই সরোবরটি ছোট নয়, কিন্তু অসংখ্য কচ্ছপ দেখে জলে নামতে ভয় হয়।

ফেরার পথে চক্রতীর্থ ও সোনার গৌরাঙ্গ। সমুদ্রের ধারে একটি ছোট জলাশয়, তারই নাম চক্রতীর্থ। কৃষ্ণ দেহত্যাগ করেছিলেন প্রভাস তীর্থে। যে গাছটির উপরে দেহত্যাগ করেছিলেন, এক দিন সেই গাছটিই ভেসে এসে এই চক্রতীর্থে ঠেকেছিল। এর নাম দারুব্রহ্মের আবির্ভাব। এই কাঠেই

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন জগন্নাথের মূর্তি করিয়েছিলেন। শিল্পীর শর্ত ভঙ্গ করে বন্ধ ঘরে ঢুকে পড়েছিলেন বলেই মূর্তি অসমাপ্ত রেখেই শিল্পী বিদায় নেন। আজও তাই জগন্নাথের ঠুঁটো মূর্তি।

এ দিকে চক্র নারায়ণ দেখে সোনার গৌরাঙ্গ দেখতে হয়। একটি ছোট মন্দিরের মধ্যে সোনার গৌরাঙ্গ মূর্তি। এইখানেই পুরী পরিক্রমার শেষ।



সাধুজী বললেন: ভুবনেশ্বর মন্দিরের শহর। একদা এখানে নাকি সাত হাজার মন্দির ছিল। আজও আছে শ পাঁচেক মন্দির। সবই ভেঙে পড়ে নি, অনেক মন্দির এখনও সগৌরবে প্রাচীন উড়িষ্যার গৌরব ঘোষণা করছে।

পুরী থেকে ভুবনেশ্বর দেখে এক দিনেই ফিরে আসা যায়। ট্রেনের পথ চল্লিশ মাইলের কম, দু ঘণ্টা সময় লাগে। মোটরে সময় আরও কম লাগে। মাঝ পথে পিপলি নামে একটা জায়গা থেকে কোনারকের রাস্তা বেরিয়েছে। পুরী থেকে কোনারক আর ভুবনেশ্বর থেকে কোনারক প্রায় একই দূরত্বে।

সাক্ষীগোপাল নামে আরও একটি তীর্থ আছে পুরী থেকে বারো মাইল উত্তরে। এই সব তীর্থস্থান দেখবার ব্যবস্থা খুব ভাল। সকালবেলায় ভুবনেশ্বর ও কোনারকের টুরিস্ট বাস ছাড়ে, সন্ধ্যের আগেই আসে ফিরে। সাক্ষীগোপাল হয়েই যায়। প্রধান মন্দিরগুলি দেখবার পর চলে যায় উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি পাহাড়ে। এই সব বৌদ্ধ গুহা দেখিয়ে ফিরিয়ে আনে।

ট্রেনেও সাক্ষীগোপাল দেখতে পাওয়া যায়। স্টেশন থেকে আধ মাইলের কম পথ।

উড়িষ্যার নিজস্ব রীতিতে তৈরি একটি ছোট মন্দির। সামনে অরুণ স্তম্ভ। বৃন্দাবন থেকে কৃষ্ণ নাকি এক ভক্তের জন্যে সাক্ষী দিতে এসেছিলেন, দেবতার নাম তাই সাক্ষীগোপাল।

সাধুজী বললেন: অনুসন্ধান করে ভুবনেশ্বরে মন্দিরের এই প্রাচুর্যের একটা কারণ জেনেছিলাম। খ্রীষ্টের জন্মের তিনশো বছর আগে থেকেই

এ অঞ্চলে বৌদ্ধ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জৈন প্রভাবও ছিল। পাঁচ ছ মাইল দূরে উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি তার প্রমাণ। ধৌলি নামে এক জায়গায় অশোকের শিলালিপিও আছে। অষ্টম শতাব্দীর একেবারে শেষে যযাতি হলেন দেশের রাজা। রাতারাতি তিনি দেশের চেহারা বদলে দিলেন। লিঙ্গরাজের মন্দির প্রতিষ্ঠা হল। পাঁচ শ বছর ধরে এই মন্দিরকে ঘিরে নতুন নতুন মন্দির তৈরি হল। লিঙ্গরাজ মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। মন্দির যে এমন বিশাল হয় তা আমার ধারণার অতীত ছিল। মূল মন্দিরই এখানে সবচেয়ে উঁচু, আর ছোট ছোট অসংখ্য মন্দিরে সমস্ত প্রাঙ্গণ ছেয়ে আছে। অপরূপ কারুকার্য সারা গায়ে। সব চেয়ে উঁচু শিখরটির নাম বিমান, তার নিচে দেবতার গর্ভগৃহ। তার সামনে জগমোহন, নাটমন্দির ও ভোগমণ্ডপ। এই চারিটি অংশ নিয়ে একটি মন্দির সম্পূর্ণ হয়েছে। মন্দিরের ভিতরে বিরাট আকারের অনুচ্চ লিঙ্গমূর্তি। সার্থক তাঁর লিঙ্গরাজ নাম।

পৌরাণিক যুগে এ স্থানের নাম ছিল একাম্রকানন। এক দিন শিব পার্বতীকে বললেন যে কাশীর চেয়ে একাম্রকানন তাঁর বেশি প্রিয়। পার্বতীর ভারি কৌতূহল হল। তিনি গোপিনী বেশে এই স্থান দেখতে এলেন। তাঁর রূপ দেখে কৃত্তি আর বাস নামে দুই দৈত্য মোহিত হল, এগিয়ে এসে তাঁকে বিয়ে করতে চাইল। পার্বতী বললেন, বেশ, আগে আমাকে কাঁধে চড়াও। দৈত্যদের মহাপুলক। দুজনে মিলে তাঁকে কাঁধে তুলে নিল। আর যায় কোথায়! দেবীর ভারে তারা ছাতু হয়ে গেল। কিন্তু পার্বতীর পেল তৃষ্ণা। ততক্ষণে শিব এসে উপস্থিত হয়েছেন। জলের জন্য যে সরোবর তৈরি করে দিলেন, তারই নাম বিন্দু সরোবর। শিব সমস্ত নদী ও সরোবরকে আহ্বান করে বললেন, এক এক বিন্দু করে জল দাও। আর সবাই দিল বিন্দু বিন্দু জল। বিন্দু সরোবরে স্নান করে তাই সমস্ত তীর্থের পুণ্য হয়। মন্দির থেকে বেরিয়ে উত্তরের পথ ধরতে হয়। বাজারের ভিতর দিয়ে সেই পথ বিন্দু সরোবরে পেঁছেছে। এরই পূর্ব পারে অনন্ত বাসুদেবের মন্দির।

এর পরে সিদ্ধারণ্য। সেখানে এক সময় একটি আম্রবন ছিল, আর ছিল সুস্বাদু জলের প্রস্রবণ। তাই দেখে কয়েকজন সিদ্ধ এসে বসবাস শুরু করেন। পাহাড় নেই, সমুদ্র নেই, নদীও নেই। তবু এই মনোরম স্থান মন্দির নির্মাণের উপযোগী বলে রাজাদের মনে হল। একে একে অনেক মন্দির নির্মিত হল—মুক্তেশ্বর, কেদারেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর ও পরশুরামেশ্বর। সিদ্ধারণ্যে আজ আম্রবন নেই, কোন অরণ্যই নেই। শুধু প্রস্রবন আছে—কেদার গৌরী আর গৌরীকুণ্ড। গৌরীকুণ্ড এখন একটি বাঁধানো সরোবর। অনেক

মেয়ে পুরুষ ঘাটে স্নান করে। কেদার গৌরীর জলে যেমন নানা গুণ আছে, তেমনি স্বাদও সুন্দর।

সাধুজী থামলেন খানিকক্ষণ, তারপরে বললেন : আরও অনেক মন্দির দেখেছিলাম ভুবনেশ্বরে। মুক্তেশ্বরের মন্দিরে দেবতা আছেন, দেবতা নেই রাজরাণীর মন্দিরে। কিন্তু ঠাকুর দেখবার জন্য এ সব মন্দিরে কেউ আসে না, যাত্রীরা আসে মন্দিরের শিল্পকলা দেখতে। একবার দেখলে সে কথা আর ভোলা যায় না।

নূতন রাজধানীর উপর দিয়ে যেতে হয় উদয়গিরি খণ্ডগিরি। ভুবনেশ্বরে এসে এ জায়গা সবাই দেখে। দুই দিকে দুই পাহাড়, তাতে বৌদ্ধ ও জৈন নিদর্শন আছে অনেক। মন্দিরের শহর ভুবনেশ্বরে এ স্থানের আকর্ষণও কম নয়।

সাধুজীকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। তিনি আমাদের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন। আমরা বোধহয় ক্লান্ত হই নি। তাউজী আরও কিছু শোনবার জন্য উৎসুক ছিলেন। কিন্তু গুরুজী সাধুজীর অভিপ্রায় বুঝতে পেরে বললেন : আজ এই পর্যন্তই থাক। এক দিনে বেশি কথা বললে সবাই মনে রাখতে পারবে না।

সাধুজী যেন বেঁচে গেলেন। বললেন : ঠিক কথা।

তাউজী আর কোন প্রতিবাদ করলেন না। আমরা সবাই এক সঙ্গে উঠে পড়লাম।



সন্ধ্যাবেলায় আবার আমরা একত্র হলাম। তাউজী এসে আগে ভাগেই বসেছিলেন, গুরুজী এলেন সাধুজীকে সঙ্গে নিয়ে। প্রসন্ন মুখ সাধুজীর, মনটি প্রসন্ন বলেই বোধহয় সারাক্ষণ এই প্রসন্নতা তাঁর মুখে লেগে থাকে। আজ যে বৈদ্যনাথের কথা দিয়ে গল্প শুরু হবে তা আমাদের জানা ছিল। সাধুজীরও এই কথা মনে ছিল। উপবেশন করেই তাউজীর দিকে চেয়ে বললেন : আজ বৈদ্যনাথের কথা বলতে হবে তো?

তাউজী বললেন : কিংবা গয়ার কথা।

সাধুজী বললেন ঃ গয়ার কথা বৈদ্যনাথের পরে। কলকাতা থেকে সকালের দিকে কোন গাড়িতে চাপলে বিকেলে জসিডি জংসন। সেখান থেকে বৈদ্যনাথ ধাম মাইল চারেক পথ। ট্রেন আছে, অন্য যানবাহনেও যাওয়া যায়। বৈদ্যনাথ থেকে গয়া যেতে হয় কিউল জংসন হয়ে। কিংবা সরাসরি কলকাতা থেকে।

তাউজী বললেন ঃ তবে বৈদ্যনাথের কথাই আগে বলুন।

সাধুজী বললেন ঃ বৈদ্যনাথ একটি পীঠস্থান। সতীর হৃদয় পড়েছিল এই স্থানে। দেবীর নাম জয়দুর্গা, আর ভৈরব বৈদ্যনাথ। অন্যান্য পীঠস্থানের মতো দেবী এখানে প্রধান নন, প্রধান ভৈরব। নিয়মের ব্যতিক্রম এটা। কতকটা চন্দ্রনাথের মতো।

কামাখ্যা ও কালীঘাটের কথা তখনি আমার মনে পড়ল। সত্যিই তাই। সেখানে উমানন্দ ও নকুলীশ প্রধান নন, প্রধান হলেন দেবী। কামাখ্যায় গিয়ে উমানন্দকে অনেকে ব্রহ্মপুত্রের এপার থেকেই প্রণাম করে, আর কালীঘাটের নকুলীশ শিবের কথা অনেকেই জানে না। কালী মন্দিরের প্রাঙ্গণে যে শিব আছেন তাঁকেই প্রণাম করে ফেরে যাত্রীরা।

সাধুজী বললেন ঃ বৈদ্যনাথ ধাম দেওঘর নামেও পরিচিত। একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। তীর্থ যাত্রীর ভিড় হয় শিবরাত্রিতে। বৈদ্যনাথের মন্দিরে সেদিন তিল ধারনের স্থান থাকে না। রাবণেশ্বর শিব বৈদ্যনাথ। এই নামের একটি পৌরাণিক কাহিনী আছে। আবার রাবণেশ্বর শিবের নাম বৈদ্যনাথ কেন হল, তা নিয়েও আছে একটি কিংবদন্তী।

সাধুজী প্রথমে পৌরাণিক কাহিনী বললেন। ত্রেতা যুগে রাক্ষসরাজ রাবণ ছিলেন শিবের বড় ভক্ত। শিবকে তিনি লঙ্কায় নিয়ে যাবেন। শিব যেতে রাজী না হলে পুরো কৈলাস পর্বতটাই নিয়ে যাবেন মাথায় করে। শিব বললেন, তার দরকার নেই। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের একটি লিঙ্গ নিয়ে গিয়ে লঙ্কায় প্রতিষ্ঠা কর। কিন্তু সাবধান, পথে কোথাও নামিও না। তাহলে সেইখানেই শিব লিঙ্গ অচল হবে। শিবের এই কথা শুনে দেবতারা উদ্বিগ্ন হলেন। লঙ্কায় শিবের প্রতিষ্ঠা হলে লঙ্কাপুরী হবে অজেয়। দশানন রাবণ তখন তাঁর বিশ হাতে সবার মাথা কাটবেন। বিষ্ণু এর বিহিত করলেন। জ্যোতির্লিঙ্গ হাতে নেবার আগে রাবণ যখন হাত পা ধুয়ে আচমন করছিলেন, তখন বরুণ তাঁর পেটে প্রবেশ করলেন।

শিবলিঙ্গ নিয়ে রাবণ যখন এই দেওঘরের উপর দিয়ে যাচ্ছেন, তখন বরুণের চাপে তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। দূর দিয়ে এক ব্রাহ্মণ যাচ্ছেন দেখে তাঁকে ডেকে বললেন, এই শিবলিঙ্গটা একটু ধর, আমি এখুনি আসছি। ব্রাহ্মণ শিবলিঙ্গ হাতে নিয়ে বললেন, এ যে বিষম ভারী। এ

আমি বেশিক্ষণ ধরতে পারব না।

এ দিকে রাবণ রাস্তার ধারেই বসে পড়েছিলেন। কর্মনাশা নদী বয়ে গেল, তবু রাবণ উঠতে পারছিলেন না। পেট থেকে বরুণ না বেরলে শান্তি নেই। এ দিকে বিরক্ত হয়ে ব্রাহ্মণ বললেন, আমি আর পারছি না, এই রইল তোমার শিবলিঙ্গ। এই বলে জ্যোতির্লিঙ্গটি মাটিতে নামাতেই বরুণ বেরিয়ে গেলেন, ব্রাহ্মণও হলেন অন্তর্হিত। ব্রাহ্মণ তো অন্য কেউ নন, স্বয়ং বিষ্ণু এসেছিলেন ছলনা করতে।

কিন্তু বেচারা রাবণ শিবলিঙ্গ আর মাটি থেকে তুলতে পারলেন না। অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে শিবের মাথায় যে আঘাত করেছিলেন, আজও লোকে তা দেখতে পায়।

সাধুজী বললেন ঃ ত্রেতা যুগে তিনি রাবণেশ্বর শিব নামেই পরিচিত ছিলেন। রাবণ তাঁর মন্দির নির্মাণ করেন ও চন্দ্রকূপ কুণ্ড খনন করেন। তারপরে লোকে এ সব ভুলে যায়। ঘন অরণ্যে আবৃত হয় এই স্থান। শুধু কয়েকঘর অনার্য সাঁওতাল এখানে বাস করত। সুখের মধ্যে একটি সুস্বাদু জলের সরোবর এখানে ছিল। তাই দেখে এক দল আর্য ব্রাহ্মণ এসে এখানে বসবাস শুরু করেন। তাঁরা ছিলেন শিবের উপাসক, একটি শিবলিঙ্গ স্থাপন করে পূজা করতে থাকেন। এরই নিকটে সাঁওতালদের তিন খণ্ড পাথর ছিল। তাদের পূর্বপুরুষেরা এই পাথরের পূজা করত বলে তারাও এসে পাথরের পূজা করত।

আর্যরা চাষবাস শুরু করল, সরোবরের জল সেচ করে প্রচুর শস্য পেল। অনার্যরা শিকার করে মাছ মাংস খেয়ে জীবন ধারণ করত। আর্যদের ফসল ফলানো দেখে তারা আশ্চর্য হল, ভাবল যে শিব পূজার জন্যই বোধহয় ব্রাহ্মণদের এই সম্পদ। তারাও শিবের ভক্ত হয়ে ব্রাহ্মণদের জীবন যাত্রার অনুকরণ করতে লাগল।

ক্রমে অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। এই অঞ্চলের ব্রাহ্মণরা অলস ও বিলাসী হয়ে পড়ল। শিবের পূজায় তাদের আগ্রহ আর রইল না, দেবতাকে তারা অশ্রদ্ধা করতে লাগল। এবারে ব্রাহ্মণদের এই আচরণে অনার্যরা ক্রুদ্ধ হল। অদ্ভুত উপায়ে প্রতিবাদ জানাল বৈজু নামে এক অনার্য দলপতি। সে ভাবল যে শিবের অসম্মান করলে ব্রাহ্মণদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা হবে, আর স্থির করল যে শিবের মাথায় একটি দণ্ডের আঘাত না করে সে কোন দিন জল স্পর্শ করবে না। কিন্তু প্রতি দিন এই কাজ করতে গিয়ে এক নতুন বিপদ উপস্থিত হল। উপবাসী অবস্থায় শিবের দর্শন ও তাঁকে স্পর্শ করবার জন্য মন তার আকুল হয়ে উঠত। শেষে এই রকম অবস্থা হল যে প্রতিজ্ঞার চেয়ে মনের ব্যাকুলতা তার বড় হয়ে উঠল।

এক দিন বনের ভিতর তার গরু হারিয়ে গিয়েছিল। সেই গরু খুঁজতে দিন উত্তীর্ণ হয়ে গেল। সন্ধ্যেবেলায় স্নান করে বৈজু যেই খেতে বসেছে, অমনি তার শিবের কথা মনে পড়ে গেল। শিবের দর্শন হয় নি। লাঠির আঘাত করে নি তাঁর মাথায়। কাজেই বৈজু তখুনি খাওয়া ফেলে শিবের কাছে ছুটল। শিব ভাবলেন, এই বৈজুই আমার যথার্থ ভক্ত, আমার কথা মনে হতেই তার ক্ষুধা তৃষ্ণা ও পরিশ্রমের কথা ভুল হয়ে যায়। তাই বৈজুকে তিনি দেখা দিয়ে বললেন, বর নাও। বৈজু বলল, আমার তো কোন প্রয়োজন নেই প্রভু, যদি কিছু দিতে চাও তো আমার নামেই যেন তোমার পরিচয় হয়। শিব বললেন, তথাস্তু। আজ থেকে তোমার নাম হবে বৈজুনাথ, আর আমাকে সবাই বৈদ্যনাথ বলে জানবে। এরপর থেকেই রাবণেশ্বর শিবের নাম হল বৈদ্যনাথ।

তাউজী তাঁর রূপোর ফ্রেমের চশমা খাতার উপরে নামিয়ে রেখে বলে উঠলেন ঃ শিবের এক নাম তো বৈদ্যনাথ।

সাধুজী বললেন ঃ হ্যাঁ, অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী বৈদ্য ছিলেন তিনি। শিবপুরাণেই আছে যে শিবকে লঙ্কায় নিয়ে যাবার জন্যে রাবণ একটি একটি করে নটি মুণ্ড কেটে শিবের পায়ে দিয়েছিলেন। ভক্ত তার শেষ মাথাটিও কেটে ফেলবে এই ভয়ে শিব তাঁকে বর দিয়েছিলেন, রাজী হয়েছিলেন লঙ্কায় যেতে। তারপর বৈদ্যনাথ শিবের প্রসন্ন দৃষ্টিতে সেই মুণ্ডগুলি জোড়া লেগেছিল। আর রাবণেশ্বর শিবের নাম হয়েছিল বৈদ্যনাথ।

খুশি হয়ে তাউজী বললেন ঃ এবারে মন্দির সম্বন্ধে কিছু বলুন।

সাধুজী বললেন ঃ স্টেশন থেকে বেশি দূরে নয়, শহরের মাঝখানে বাজারের গায়েই মন্দির। পাথরে বাঁধানো একটি প্রশস্ত অঙ্গনের মধ্যে দুটি বড় মন্দির—বৈদ্যনাথ ও জয়দুর্গার। দুই মন্দিরের চূড়ায় নানা রঙের ধ্বজা নিশান—রঙীন কাপড় বা জরির সূতো দিয়ে দুটি মন্দিরের চূড়ো যুক্ত করা আছে। যাত্রীরা মানৎ করে এই ধ্বজা নিশান বাঁধে। স্বামী স্ত্রী গাঁটছড়া বেঁধে মন্দির প্রদক্ষিণ করে, ঢাক ঢোল বাজে। অঙ্গনের চারি দিকে আরও গোটা দশেক ছোট ছোট মন্দির আছে নানা দেবদেবীর। কিন্তু শিল্প সমন্বিত কারুকার্যময় কিছু নেই। প্রাচীন বলেই এ মন্দির সমাদৃত। মন্দির নয়, মন্দিরের দেবতা। মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছিলেন গিধোরের প্রথম রাজা পূরণমল প্রায় পৌনে চারশো বছর আগে।

তারকেশ্বরের সঙ্গে বৈদ্যনাথের একটা মিল আছে। এখানেও অগণিত যাত্রী আসে রোগমুক্তির আশা নিয়ে। পায়ে হেঁটে কাঁধে করে তারা গঙ্গাজল আনে। বাঁশের বাঁকের দুধারে দুটো ঝুড়ি, নিচে তিনটি পায়া। মাটিতে নামালে তা মাটি স্পর্শ করে না। রঙীন কাপড়ের টুকরো সাজানো সেই

গঙ্গাজলের বাঁক নিয়ে এক সঙ্গে অনেক যাত্রী আসে। গঙ্গোত্রীর জল আনে, আগে মানস সরোবরের জলও আনত। শিব গঙ্গায় বাঁধানো ঘাটে স্নান করে যাত্রীরা বৈদ্যনাথের পুজো করে, মানৎ করে, ধর্না দেয়, কায়িক পরিশ্রম দিয়ে দণ্ড খেটে দেবতার আশীর্বাদ চায়।



সাধুজী থামলেন না, বললেন: বৈদ্যনাথের পরে বিহার রাজ্যের আর একটি তীর্থস্থান হল গয়া। গয়ার মতো তীর্থ ভারতে আর নেই। কিন্তু সে পীঠস্থান বলে নয়, এক অসুরের আত্মত্যাগে গয়া ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থে পরিণত হয়েছে।

আমরা সকলেই আশ্চর্য হলাম এই কথা শুনে। দেবতার অধিষ্ঠানে নয়, অসুরের আত্মত্যাগেও যে কোন স্থান তীর্থে পরিণত হতে পারে, এ যেন আমাদের ধারণার অতীত। সাধুজীর পরবর্তী কথা শোনবার জন্যে আমরা আগ্রহী হয়ে উঠলাম।

সাধুজী বললেন: যাঁরা গয়া গেছেন, গয়াসুরের গল্প তাঁরা সকলেই জানেন। বায়ুপুরাণে এই গল্প আছে। সে গল্প বলে সময় নষ্ট করা উচিত হবে না।

বাধা দিয়ে তাউজী বললেন: না না, আপনি বলুন। সবাই এ গল্প জানে না।

সাধুজী হেসে বললেন: জাতে অসুর হলেও গয়াসুরের আচরণ ছিল ধার্মিকের মতো। একবার সে কোলাহল পর্বতে উঠে কঠোর তপস্যায় বসল। দেবতারা দেখলেন মহা বিপদ। একে ধার্মিক, তার ওপর এই তপস্যা। এ তো স্বর্গরাজ্য থেকে দেবতাদের তাড়াবে না, নিজেই দেবতা হয়ে বসবে, আর দেবতারা বঞ্চিত হবেন নিজ নিজ অধিকারে। কাজেই দেবতারা পরামর্শ করে ঠিক করলেন যে তপস্যা শেষ করবার আগেই গয়াসুরকে বর দেওয়া যাক। তারপর দেবতারা সবাই গিয়ে কোলাহল পর্বতে উঠে বললেন, বৎস, তোমার তপস্যায় আমরা সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি বর নাও। গয়াসুর বলল, তবে এই বর দাও প্রভু যে আমার দেহ যেন পৃথিবীর পবিত্রতম বস্তু হয়।

দেবতারা ভাবলেন, এ আবার এমন কি বর! তথাস্তু বলে সবাই বিদায় নিলেন।

এ দিকে গয়াসুর তার দেশে ফিরে বুক ফুলিয়ে রাস্তা দিয়ে বেড়াতে লাগল। যত পশু পাখি পাপী তাপী তার পবিত্র দেহ দেখে উদ্ধার হয়ে যেতে লাগল। একেবারে সোজা স্বর্গবাস। গয়াসুর এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাচ্ছে, এক নগর থেকে অন্য নগরে, এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে। জীবের মুক্তির জন্য সে দিশেহারা। আর তার দর্শন পেয়েই সবাই স্বর্গে যাচ্ছে। নরক শূন্য হয়ে গেল, আর স্বর্গে হল স্থানাভাব। বিপদ দেখে দেবতারা স্থির করলেন, গয়াসুরকে নিশ্চল কর, ও যেন আর নড়তে না পারে। তারা এসে গয়াসুরকে বললেন, যজ্ঞের জন্য তোমার দেহের দরকার। আমরা তোমার পবিত্র দেহের উপরেই যজ্ঞ করব। গয়াসুর বলল, সে তো আমার সৌভাগ্য প্রভু। বলেই শুয়ে পড়ল। গয়ায় মাথা, উড়িষ্যার যাজপুরে নাভি ও অন্ধের পীঠাপুরমে পা। তাকে নিশ্চল করবার জন্য ব্রহ্মা যমরাজকে বললেন ধর্মশিলাটি তার দেহের উপর রাখতে। আর সমস্ত দেবতারা সেই ধর্মশিলার উপরে উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু গয়াসুর নিশ্চল হল না। তখন বিষ্ণুও তার উপরে উঠলেন। গয়াসুর নিশ্চল হয়ে বলল, আমাকে নিশ্চল করবার জন্য আপনাদের এত কষ্টের কী দরকার ছিল! আমাকে একবার বললেই তো পারতেন! দেবতারা স্বীকার করে বললেন, সত্যিই তো, তাহলে তুমি আর একটি বর নাও। গয়াসুর বলল, আমার নিজের জন্য আমি কিছুই চাই না, আপনারা এই বর দিন যে যত দিন পৃথিবী থাকবে আর আকাশে উঠবে চন্দ্রসূর্য, তত দিন আপনারা সকলেই এই শিলায় অবস্থান করবেন, আর এই স্থান একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থে পরিণত হবে। দেবতারা এবারেও বললেন, তথাস্তু। গয়াসুরের নামে এই তীর্থের নাম হল গয়া। উড়িষ্যার যাজপুর ও অন্ধের পীঠাপুরমও তীর্থে পরিণত হল।

তারপরে সাধুজী বললেন ঃ ধর্মশিলারও একটি কাহিনী আছে। ব্রহ্মার পুত্র মরীচি মুনির পত্নী ধর্মব্রতা তাঁর স্বামীর শাপে শিলায় পরিণত হয়েছিলেন। কিন্তু গৌতমের স্ত্রী অহল্যার মতো পাপ করে নয়, বিনা দোষেই তিনি শিলা হয়েছিলেন। মরীচি মুনি পৃথিবী পরিভ্রমণ করে বেড়াবার সময় এই যুবতী কন্যাকে দেখেছিলেন কঠোর তপস্যারত। প্রশ্ন করে তাঁর পরিচয় জানলেন যে তিনি রাজা ধর্মের কন্যা ধর্মব্রতা, বিশ্বরূপা তাঁর মা; পতিব্রতা হবার জন্য তপস্যায় নিজের যৌবন ক্ষয় করেছেন। এ কথা জেনে মরীচি বললেন যে তিনিও এমনি এক পতিব্রতাকে পাবার জন্য সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বিবাহ করতে চাইলেন তাঁকে, কিন্তু ধর্মব্রতা তাঁর পিতার কাছে প্রস্তাব করতে বললেন। শেষ পর্যন্ত তাঁদের বিবাহ হয়ে

গেল। এবং এই পতিব্রতা স্ত্রী ধর্মব্রতা শিলায় পরিণত হলেন অতি তুচ্ছ কারণে। মরীচি তাঁকে পদসেবার আদেশ দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঘুম ভাঙলে দেখলেন যে স্ত্রী নেই, কোলের উপর থেকে পা নামিয়ে রেখে কখন এক সময় তিনি উঠে গেছেন। আর যায় কোথা! কিছু জানতে না চেয়েই শাপ দিলেন যে তুমি শিলা হও। ধর্মব্রতা অকারণে উঠে যান নি। তাঁর শ্বশুর ব্রহ্মা এসেছিলেন বেড়াতে, তাঁরই অভ্যর্থনার জন্য তাঁকে উঠে যেতে হয়েছিল। স্বামীর এই অন্যায় শাপে ধর্মব্রতাও ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন যে এর জন্য শিব মরীচিকে শাপ দেবেন। কিন্তু ধর্মব্রতার দুঃখ তাতে ঘুচল না, দেবতাদের কাছে তিনি প্রার্থনা জানালেন যে স্বামীর অভিশাপ তো খণ্ডাবার নয়, তাই তিনি যে শিলায় পরিণত হবেন তা যেন পবিত্র হয় তীর্থের মতো। দেবতারা বললেন যে তাই হবে, কিন্তু পরে গয়াসুরের দেহের উপরে স্থাপন করে দেবতারা যখন তার উপরে উঠবেন, তখন তা পবিত্র হবে, আর সেই শিলার উপরে পিণ্ড দিলে মুক্তি হবে পূর্বপুরুষের।

সাধুজী বললেন ঃ অনেকে মনে করেন যে বুদ্ধগয়াই বেশি প্রাচীন। পরবর্তী কালে গয়া হিন্দু তীর্থে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। রামায়ণ ও মহাভারতে গয়ার উল্লেখ আছে এবং তা বুদ্ধের জন্মের অনেক আগের ঘটনা। রাজর্ষি গয় এখানে একটি বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন বলেই এই স্থানের নাম হয়েছিল গয়া। হরিবংশে আবার অন্য কথা আছে। মনুর এক পৌত্রের নাম গয়। এই গয় গয়াপুরীতে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। গয়া একটি পবিত্র স্থান ছিল বলেই রাজকুমার গৌতম এখানে তপস্যার জন্য এসেছিলেন। তিনি বুদ্ধ হবার পরে এটি বৌদ্ধ তীর্থে পরিণত হয়েছে।

এর পরে সাধুজী গয়ার দর্শনীয় স্থানের কথা আমাদের শোনালেন। গয়ায় পাহাড় আছে তিনটি—রামশিলা প্রেতশিলা ও ব্রহ্মযোনি পাহাড়। আর ফল্গু নদী বয়ে গেছে শহরের পাশ দিয়ে। বিষ্ণুপাদ মন্দির ঘিরেই গয়া শহর গড়ে উঠেছে। গয়ায় এসে পিতৃপুরুষের প্রথম পিণ্ড দিতে হয় প্রেতশিলায়, তারপর রামশিলায়। আসল পিণ্ড ফল্গু নদীর ধারে। বিষ্ণুপাদেও পিণ্ড দেবার নিয়ম আছে। এই মন্দিরের প্রাঙ্গণে ছোট বড় অনেকগুলি মন্দির আছে। আঁকা বাঁকা পথে ফল্গু নদীর ধারে আসা যায়। নদীর তীর অনেক নীচে। সেখানে শুধু শুকনো বালি। ফল্গু অন্তঃসলিলা। যাত্রীরা বালি খুঁড়ে জল বার করে। ওপারে সীতাকুণ্ড, মন্দিরে রাজা দশরথের হাত আছে। হাত বাড়িয়ে তিনি মা জানকীর হাত থেকে পিণ্ডগ্রহণ করেছিলেন।

বুদ্ধগয়া যাবার পথে ব্রহ্মযোনি পাহাড় মাইল খানেক দূরে। যাবার পথে অক্ষয় বট ও মঙ্গলা গৌরী। রুক্মিণী কুণ্ডে স্নান করে অক্ষয় বটের নিচে শেষ পিণ্ডদানের বিধি। পাণ্ডারা সেইখানেই সুফল দেয়।

সুফল মানে ?

শ্রাদ্ধ শান্তি পিণ্ডদানের পর বট গাছের নিচে বসে যাত্রীরা পাণ্ডাকে দক্ষিণা দেয়, আর পাণ্ডা দেয় সুফল। যাত্রীকে বলে, তোমার গয়া কার্য সফল হল। এই খানেই একটি প্রিয় ফল পিতৃ পুরুষের নামে যাত্রীকে ত্যাগ করতে হয়। সে ফল সে আর কখনও খাবে না।

তাউজী বললেন : বিষ্ণুপাদ মন্দিরের কথা কিছু বলেন নি।

সাধুজী বললেন : ফল্গু নদীর ধার থেকে ফেরার সময় প্রথমে গয়েশ্বরী দেবী। শক্তি মূর্তি, অন্ধকার ঘরে তাঁর উজ্জ্বল চোখ জ্বল জ্বল করে জ্বলে। শিব অন্যত্র আছেন। পূর্ব দিকের সদর দরজার সামনেই হনুমানের বিশাল মূর্তি। উত্তরে রাণী অহল্যাবাঈ-এর মূর্তিও আছে। বিষ্ণুপাদ মন্দির তিনিই নির্মাণ করে দিয়েছেন। মূল মন্দির সংলগ্ন সভামণ্ডপটিও সুন্দর। প্রাঙ্গণের একটি বৃক্ষের নিচেও যাত্রীরা পিণ্ডদান করেন।

বিষ্ণুপাদ মন্দিরে বিষ্ণুর পদচিহ্ন, তারই উপরে মন্দির। কোন মূর্তি নেই, কোন চিত্র নেই, শুধু পায়ের চিহ্ন। এই চিহ্নই দেবতা, এই চিহ্নই সেই বিরাট পুরুষের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

চৈতন্যদেবের কথা আমার মনে পড়ে গেল। আমি শুনেছিলাম যে বাঙলার যুবক নিমাই পিতার পিণ্ড দিতে এসে এই বিষ্ণুপাদ দেখে সম্মোহিত হয়েছিলেন। জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য পূর্ণ তাঁর যৌবনের ঔদ্ধত্য এই খানেই ফুরিয়ে গিয়েছিল। তিনি দীক্ষা নিয়েছিলেন ঈশ্বর পুরীর নিকটে। তারপর জীবের দুঃখ তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল সংসারের সংকীর্ণ গণ্ডির ভিতর থেকে। নিমাই হলেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।

আর একটি অলৌকিক কথা আছে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে। পরম পুরুষ রামকৃষ্ণের পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় এই বিষ্ণুপাদ মন্দির দর্শনের পরে স্বপ্ন দেখেছিলেন রাতে। নবদূর্বাদলশ্যাম এক জ্যোতির্ময় দিব্যপুরুষ তাঁর সামনে এসে বলেছিলেন যে তিনি তাঁর পুত্র রূপে জন্ম নেবেন। রাম নয়, কৃষ্ণ নয়, জন্ম হয়েছিল রামকৃষ্ণের।

সাধুজী এ সব কথা বললেন না। বুদ্ধগয়ার কথাও আমাদের শোনালেন না। শুধু বললেন : বুদ্ধগয়া রেল স্টেশন থেকে সাত মাইল দূরে। বাসে যাতায়াত করা যায়। রিক্সা টাঙ্গা ট্যাক্সিও আছে। এক বেলাতেই দেখে ফেরা যায়। গয়ায় তীর্থ করতে গিয়ে বুদ্ধগয়া না দেখে কেউ ফেরে না।



সাধুজী বললেনঃ কাশী হিন্দুর পরম তীর্থ। গয়া থেকে শ খানেক মাইল পশ্চিমে গঙ্গার তীরে এই শহর। গয়া থেকে সকাল বেলার ট্রেন ধরলে চার ঘণ্টায় সেখানে পৌঁছানো যায়। যাত্রীরা মোগলসরাই জংসনেই নেমে পড়ে। সেখান থেকে দশ পনর মিনিট অন্তর বাস ছাড়ে। এক ঘণ্টার পথ। ট্রেনে গেলেও এতটা সময় লাগে। তারপরে টাঙ্গা বা রিক্সায় করে যেতে হয় শহরে। মোগলসরাই থেকে ট্যাক্সিও পাওয়া যায়, তাতে কিছু সময় সংক্ষেপ হয়। ট্রেনে বা মোটরে গেলে গঙ্গার পুল পার হতে হয়। তার নাম মালব্য পুল। মদন মোহন মালব্যের নামে এই পুল। কিন্তু যাঁরা ব্যাসকাশী দেখে বারাণসী যান, তাঁদের এই পুল না পেরলেও চলে। রামনগর গঙ্গার এপারে, ব্যাসকাশী রামনগরে। মূল ব্যাসকাশীতে কেউ আর যায় না। রাজপ্রাসাদের মধ্যে যে ব্যাসকাশী, যাত্রীরা সেখানেই যায়। রাজবাড়ির সিংহদ্বার দিয়ে ঢোকা যায়। আবার খেয়া ঘাট থেকে নৌকো করেও যাওয়া যায়। নৌকোয় গেলে ঘাটের সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতে হয়। মূল প্রাসাদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন একটি অংশে এই দেবালয়। মন্দিরের ভিতর বড় বড় তিনটি লিঙ্গমূর্তি সোনার মতো ঝকঝক করে। অষ্টধাতুর মূর্তি। মাঝখানের বড় লিঙ্গটি ব্যাসদেব, তাঁর দুধারে শুকদেব ও বিশ্বনাথ। মন্দিরের দেওয়ালে একখানি আড়াই শো বছরের প্রাচীন তৈলচিত্র আছে ব্যাসদেবের। তাঁর দুই পাশে দুই রাজার ছবি। এরই নাম ব্যাসকাশী। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের মন্দির। বশিষ্ঠের প্রপৌত্র তিনি, পরাশরের পুত্র, মৎস্যগন্ধা সত্যবতী তাঁর মাতা। শুকদেব তাঁর পুত্র। পিতা পুত্র এই মন্দিরে পূজা পাচ্ছেন বিশ্বনাথের সঙ্গে। কাশীবাসী ব্যাসদেব নির্বাসিত হবার পরে এই ব্যাসকাশীতেই বসবাস করেছিলেন।

সাধুজী খুব তাড়াতাড়ি এই গল্প বলছিলেন, কিন্তু তাউজী এই তাড়া পছন্দ করলেন না। বললেনঃ কেন নির্বাসিত হয়েছিলেন সে গল্প বলবেন না?

এ গল্প তো সবাই জানে !

তাউজী বললেন ঃ সবাই জানে বলবেন না, যারা জানে তাদেরও হয়তো স্মরণ নেই ।

সাধুজী বললেন ঃ স্কন্দ পুরাণের অন্তর্গত কাশীখণ্ডে এই গল্প আছে । বেদব্যাস প্রতি দিন তাঁর শিষ্যদের কাশীর মহিমা কীর্তন করে শোনাতেন। এক দিন শিবের ইচ্ছা হল বেদব্যাসকে পরীক্ষা করবার । তিনি অন্নপূর্ণাকে বললেন যে আজ যেন বেদব্যাসকে কেউ ভিক্ষা না দেয় । অন্নপূর্ণার ইচ্ছায় তাই হল । সেদিন সারা দিন ঘুরে বেদব্যাস এক মুঠো ভিক্ষাও পেলেন না । ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে তিনি শাপ দিলেন, মুক্তির গর্বেই তো কাশীবাসী ভিক্ষা দেয় না, ত্রৈপুরুষী মুক্তি তাদের হবে না । রাগে দুঃখে তিনি ভিক্ষার পাত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আশ্রমের দিকে অগ্রসর হলেন । এমন সময় ছদ্মবেশে অন্নপূর্ণা এসে তাঁকে বললেন, অতিথি সৎকার না করে আমার স্বামী খান না, আজ আপনি আমাদের অতিথি হন ।

বেদব্যাস একা নয়, সশিষ্যে তাঁর অতিথি হলেন । সৎকারের পর অন্নপূর্ণা প্রশ্ন করলেন, স্বার্থসিদ্ধি না হবার জন্যে যে শাপ দেয়, সে শাপ কাকে লাগে ? বেদব্যাস বললেন যে তা শাপদাতারই প্রাপ্য । তখন বিশ্বেশ্বর শিব বললেন, অকারণে তুমি কাশীবাসীকে শাপ দিয়েছ, তুমি এ স্থানে থাকবার যোগ্য নও । কাশী তোমাকে পরিত্যাগ করতে হবে ।

এই ঘটনার পরেই বেদব্যাস গঙ্গার পরপারে রামনগরে এসে বসবাস শুরু করলেন । এই জায়গার নাম হল ব্যাসকাশী । কিন্তু লোকে বলে, কাশীতে মরলে যেমন মুক্তি হয়, তেমনি ব্যাসকাশীতে মরলে পর জন্মে গাধা হয়ে জন্মায় । এ গল্প নিশ্চয়ই সকলের জানা ।

তাউজী সেই পুরনো কথাই বললেন ; জানা গল্প আর একবার শুনলে তো দোষ নেই !

কাজেই সাধুজীকে গল্পটি আবার বলতে হল ঃ অভিমানী বেদব্যাস স্থির করলেন যে এ পারে তিনি এমন কাশীর প্রতিষ্ঠা করবেন যে যারা পাপ করে এসে এখানে মরবে তাদের তো মুক্তি হবেই, যারা তাঁর কাশীতে বাস করে পাপ করবে তাদেরও মুক্তি হবে । বেদব্যাসের এই সংকল্পের কথা জেনে শিবের দুর্ভাবনা হয়েছিল, কিন্তু অন্নপূর্ণা তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বৃদ্ধার বেশ ধারণ করে বেরিয়ে পড়লেন । লাঠি ঠক ঠক করে ব্যাসদেবের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এখানে কী করছ বাবা ?

বেদব্যাস তাঁর নতুন কাশীর কথা বুঝিয়ে বললেন । সব শুনে বুড়ি বললেন, তা বেশ । বলে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এসে বললেন, এখানে মরলে কী হয় বললে ? বেদব্যাস বললেন, মুক্তি হয় । কিন্তু বুড়ি

আবারও ফিরে এসে বললেন, কানে কম শুনি বাবা, ঠিক বুঝতে পারলাম না। এখানে মরলে কী হয় বললে ? বেদব্যাস এবার রেগে গিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, গাধা হয়। তথাস্তু। বলে বুড়ি অন্তর্হিত হলেন। আর বেদব্যাস তখুনি বুঝতে পারলেন যে শিবের সোনার কাশী রক্ষা করবার জন্যে অন্নপূর্ণা নিজে এসেছিলেন তাঁকে ছলনা করতে।

সাধুজী একটু থেমে বললেন ঃ ব্যাসকাশী থেকে নৌকোয় করে কাশী যাবার একটা অপার আনন্দ আছে। নৌকোয় বসেই একটা সাদা মন্দিরের চুড়ো দেখতে পাওয়া যায়! এ মন্দির কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন বিশ্বনাথ মন্দির। উত্তরবাহিনী গঙ্গার তীরে অর্ধচন্দ্রাকার কাশী শহর খানিকটা দূরে। অসংখ্য বাঁধানো ঘাট আছে পাশাপাশি। প্রত্যেকটি ঘাটের একটা নাম আছে, আর তার সঙ্গে কোন ঘটনার স্মৃতি আছে জড়িয়ে। শহরের দুই প্রান্তই এক সঙ্গে দেখা যায়। পশ্চিম বাহিনী অসি নদী যেখানে গঙ্গায় পড়েছে সেইখানেই অসি ঘাট। জন বিরল, কোন বাঁধানো ঘাট নেই, নেই কোন সমারোহ। রামনগরের দিক থেকে আসবার সময় এই ঘাটই প্রথম দেখা যায়। কাশীবিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া যায় এই ঘাট থেকে। শহর যেখানে শেষ হয়েছে সেই খানেই মালব্য পুল। একই পুলের উপর দিয়ে ট্রেন আর মোটর বাস যাতয়াত করছে। এই পুলেব নিচেই রাজঘাট কাশী স্টেশনের সংলগ্ন। কাঁচা মাটির ঘাট। শহর এইখানেই শেষ হয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু পঞ্চক্রোশী কাশী পরিক্রমাব শেষ এখানে নয়। আরও খানিক দূরে গিয়ে বরুণাসঙ্গম ঘাট। দক্ষিণমুখী বরুণা এঁকে বেঁকে এসে গঙ্গায় মিলেছে। পঞ্চতীর্থের শেষ সেইখানে। অসি ও বরুণার সঙ্গমের মধ্যে অবস্থিত বলে কাশীর অন্য নাম বারাণসী। সমগ্র বারাণসী এই গঙ্গার ঘাটে স্পন্দিত হচ্ছে। অবিচ্ছিন্ন শহর ঘাটে ঘাটে সংলগ্ন হয়ে এক আশ্চর্য দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে। কেদার ঘাট হরিশ্চন্দ্র ঘাট দশাশ্বমেধ ঘাট মনিকর্ণিকা ঘাট, ছোট বড় আরও কত ঘাট। নৌকোয় চেপে এই সব ঘাট দেখতেই একটা দিন সময় লাগে। হরিশ্চন্দ্র ঘাট আর মনিকর্ণিকা ঘাট হল কাশীর শ্মশান। যাত্রীরা স্নান করেন দশাশ্বমেধ ঘাটে, আর এই ঘাটের কাছেই বিশ্বনাথের মন্দির।

সাধুজী বললেন ঃ কাশীতে এলে গোধূলিয়া নামটা মনে রাখা দরকার। মোগলসরাই স্টেশনে গোধূলিয়ার বাসে উঠতে হয়, বারাণসী স্টেশনে নামলেও রিক্সা নিতে হয় গোধূলিয়া পর্যন্ত। নানা দিক থেকে রাস্তা এসে এইখানে মিলেছে। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ও যেতে হয় এইখান থেকে। বিশ্বনাথ গলি আর দশাশ্বমেধ ঘাটও এইখানে। বাস, ট্যাক্সি, সাইকেল রিক্সা, দোকানপাট, লোকজন, চারি দিক জমজমাট।

বিশ্বনাথ গলির মতো পথ এ দেশে আর নেই। সঙ্কীর্ণ গলি, দুধারে নানা পণ্যের দোকান ক্রেতা ও বিক্রেতার কলরবে সারাক্ষণ মুখর। পিতল ও সিলভারের বাসন, কাঠের খেলনা, বেনারসী শাড়ি ও পানের মশলা। এ সবই কাশীর নিজস্ব জিনিষ। এই পথের ধারেই ঢুণ্ডি গণেশ, সাক্ষী বিনায়ক, শনৈশ্চরের মন্দির। পথের ধারে জুতো খুলে অন্নপূর্ণার মন্দির প্রাঙ্গণে ঢুকতে হয়। প্রাঙ্গণের চারি ধারে দোতলা বাড়ি, মাঝখানে ছোট মন্দির অন্নপূর্ণার। সুন্দর কারুকার্য করা কয়েকটি স্তম্ভের উপরে গম্বুজাকৃতি ছাদ নাটমন্দিরের মতো দেখতে, তারই সঙ্গে সংলগ্ন গর্ভগৃহে অন্নপূর্ণার মূর্তি। বিশ্বেশ্বরের আদেশে মা অন্নপূর্ণা সমস্ত কাশীবাসীকে অন্নদান করছেন। অন্নাভাবে কাশীতে কারও মৃত্যু হয় না। অন্নকূট মায়ের সব চেয়ে বড় উৎসব।

আরও খানিকটা এগিযে বিশ্বনাথের মন্দির। পথ এমন সঙ্কীর্ণ যে প্রাচীর ও দরজা ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। মন্দিরের চূড়া দেখতে হলে সামনের কোন বাড়ির দোতলায় উঠতে হয়। পাশাপাশি দুটি শিখরের মাঝখানে একটি গম্বুজ। সব চেয়ে বাঁ ধারেরটি মহাদেবের শিখর, পাশের গম্বুজটি সোনার পাতে মোড়া। বিশ্বনাথের মন্দিরের শিখরও সোনার। দুশো বছর আগে এই মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছেন ইন্দোরের রাণী অহল্যা বাঈ, পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ এই মন্দিরের চূড়া তামার পাতের উপরে সোনায় মুড়ে দিয়েছেন। মন্দিরের ভিতরে সব চেয়ে সুন্দর ঘণ্টাটি পাওয়া গেছে নেপালের মহারাজার কাছে।

মূল মন্দিরের ভিতর বিশ্বনাথের লিঙ্গ মূর্তি। আরও অনেক দেবদেবী আছেন। মহাদেবের মন্দিরের সামনে অনেকগুলি লিঙ্গ ও মূর্তি আছে দেওয়ালের গায়ে। এগুলি পুরনো বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে ছিল বলে সকলের বিশ্বাস। বর্তমান মন্দিরের উত্তর পশ্চিমেই ছিল আদি বিশ্বেশ্বরের মন্দির। দিল্লীর বাদশাহ ঔরঙ্গজেব এরই উপরে মসজিদ নির্মাণ করেছেন। জ্ঞানবাপী নামে যে কূপ আছে মন্দিরের পিছনে. তা দেখতে গেলে এই মসজিদটি দেখতে পাওয়া যায়। আটচল্লিশটি পাথরের থামের উপরে একটি মণ্ডপ, তারই নিচে পাথরের উঁচু জালি দিয়ে ঘেরা এই জ্ঞানবাপীর জল পবিত্র বলে স্বীকৃত। কাশীখণ্ডে আছে যে রুদ্ররূপী ঈশান তাঁর ত্রিশূল দিয়ে এই কুণ্ড খনন করেছিলেন। কুণ্ডের জলে পৃথিবী আবৃত হলে ঈশান সহস্র কলস জলে বিশ্বেশ্বরের স্নান করালেন। প্রসন্ন হয়ে বিশ্বেশ্বর বর দিলেন যে শিব অর্থাৎ জ্ঞান জলরূপে এই বাপীতে বিদ্যমান থাকবেন। শোনা যায় যে কালাপাহাড় যখন কাশীতে এসেছিলেন মন্দির ধ্বংসের অভিযানে, বিশ্বেশ্বর তখন এই জ্ঞানবাপীর মধ্যে আত্মগোপন করেছিলেন। যাত্রীরা আজও এই

কূপের জল পান করতে আগ্রহী। তাঁদের ধারণা যে এতে আত্মার আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়। উঁচু একটি নন্দী আছে এই মণ্ডপে, আর কয়েকজন দেবদেবীও আছেন।

মন্দিরের শেষ নেই বারাণসীতে। নূতন মন্দিরও তৈরি হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বিশ্বনাথের নূতন মন্দির তৈরি হয়েছে। ফুলের বাগানের মাঝখান দিয়ে সুন্দর পরিচ্ছন্ন পথ মন্দিরের সিঁড়ি পর্যন্ত চলে গেছে। শ্বেত পাথরের মতো সাদা মন্দিরের চূড়া যেন আকাশ ছুঁয়ে আছে। প্রবেশ পথের দুধারে দুটি দ্বারপালের মূর্তি আছে দণ্ড হাতে, ভিতরে মার্বল পাথরের মেঝে পরিষ্কার ঝকঝক করছে। মন্দিরের মধ্যেই মস্ত বড় সভা বসতে পারে, এমন প্রশস্ত নাট মন্দির। দোতলাতেও বিশ্বনাথ আছেন। আরও আছেন দেবদেবী, গণেশ, পার্বতী ও দুর্গা, লক্ষ্মীনারায়ণও আছেন। তাঁদের আলাদা আলাদা ঘর। মন্দিরের দেওয়ালে কত সুন্দর চিত্র ও শাস্ত্র কথা। সাধু মহাত্মা ও মহাপুরুষের কত বাণী চিত্রিত আছে তার অন্ত নাই।

কাশীতে আরও একটি নূতন মন্দির তৈরি হয়েছে। তার নাম তুলসী মানস মন্দির। এক ধনী ব্যবসায়ী প্রায় বিশ লাখ টাকা খরচ করে এই সুন্দর মন্দিরটি নির্মাণ করেছেন। মন্দিরের কোন চূড়া নেই, সামনে থেকে এই দোতলা গৃহটি একটি বাসগৃহ বলেই মনে হয়। কিন্তু ভিতরে ঢুকে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। সমস্ত মন্দিরটি মার্বল পাথরে তৈরি। সত্যিই যেন তুলসী দাসের মানস মন্দির। কবির প্রাণবন্ত মর্মর মূর্তি আছে, আর আছে রাম সীতার মূর্তি, লক্ষ্মীনারায়ণের মূর্তি, বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার মূর্তি। আর যা আছে, তা এ দেশের কোনখানে নেই। কবি তুলসীদাস রচিত সমগ্র রামচরিত মানস দেওয়ালের গায়ে লেখা আছে।

এই মন্দিরের নিকটেই সঙ্কটমোচন। কবির পদধূলিতে এই স্থান পবিত্র হয়ে আছে। শান্ত সমাহিত পরিবেশ। হনুমানের মন্দির এখানে। কবি তুলসীদাস নাকি নিজে এই মন্দির নির্মাণ করেন। প্রাঙ্গণের অন্য ধারে আর একটি মন্দির আছে রামচন্দ্রের। এখান থেকে গঙ্গার অসিঘাট বেশি দূরে নয়। কবি সেখানে সাধন-ভজন করতেন, থাকতেন একটি ছোট ঘরের মধ্যে। সেখানে বসেই তাঁর অমর কাব্য রচনা করেছেন। আজও সেখানে তাঁর স্মৃতিচিহ্ন রক্ষিত আছে।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফেরার পথে এই সব দেখতে হয়। প্রথমে সঙ্কট-মোচন নয়, তার আগে দুর্গাবাড়ি। একটি উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণের মধ্যে দুর্গার মন্দির। লাল রঙের এই মন্দির অপরূপ শিল্পকলা মণ্ডিত। অন্নপূর্ণার মন্দির বলেই ভ্রম হয়। দেবী এখানে দুর্গা, দণ্ডায়-মান প্রসন্ন মূর্তি। ধূপ ধুনা চন্দন ও ফুলের গন্ধে এমন গম্ভীর পরিবেশ যে

বেরিয়ে আসতে ইচ্ছা করে না। প্রাচীরের বাহিরে যে বিরাট পুষ্করিণী তার নাম দুর্গাকুণ্ড। দুর্গার মন্দির ও দুর্গাকুণ্ড বাঙলার রাণী ভবানীর কীর্তি। ভারতের ধর্ম জীবনে রাণী অহল্যা বাঈ এর পরেই রাণী ভবানীর নাম।

নাটোরের রাণী ভবানীর কথা আমি জানি। দানের মহিমায় তিনি অমর হয়ে আছেন। কিন্তু সাধুজী অন্য কথায় চলে গেলেন, বললেনঃ শহরের অন্য প্রান্তে আছে কাল ভৈরবের মন্দির। নানা অলঙ্কারে কণ্টকিত এই মন্দিরের চূড়া। দরজার পাশে দ্বারপাল ও দশাবতারের চিত্র, ভিতরে কাল ভৈরবের ভয়ঙ্কর মূর্তি। পাথরের দেহ নীল, জ্বলজ্বল করে রূপার চোখ, পাশে একটি কুকুর। ব্রহ্মার উপরে রাগ করে শিব এই কালভৈরব সৃষ্টি করেছিলেন। আর কালভৈরব তখনই ব্রহ্মার নকল মুণ্ডটি কেটে ফেলেছিলেন। কিন্তু সেই কপাল তাঁর হাত থেকে খসল না। সমগ্র পৃথিবী ঘুরেও তাঁর পাপ স্খালন হল না। শেষে এই কাশীতেই এসে পৌঁছতেই কপালটি খসে পড়ল। কালভৈরব পাপমুক্ত হলেন। যেখানে কপাল পড়েছিল, সেই তীর্থের নাম হয়েছে কপালমোচন। এই রকম পিশাচমোচন, তিলভাণ্ডেশ্বর, বৃদ্ধকালেশ্বর—কত তীর্থ। কাশীতে তীর্থের সংখ্যা হাজার দেড়েকের কম নয়। এক দশাশ্বমেধ ঘাটেই নাকি দুশো বিরানব্বইটি মন্দির আছে।

সাধুজীর এই কথা শুনে আমরা বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিলাম। কিন্তু তাউজী সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেনঃ এখন বোধহয় এত তীর্থ নেই।

সাধুজী হেসে বললেনঃ আছে কিনা একবার দেখেই আসুন।

তারপরে তিনি সারনাথের কথা খুবই সংক্ষেপে বললেনঃ গয়ায় যেমন বুদ্ধ গয়া, কাশীতে তেমনি সারনাথ। কাশীতে তীর্থ করতে এলে সারনাথ না দেখে কেউ ফেরে না। রাজকুমার গৌতম তপস্যা করে বুদ্ধ হয়েছিলেন বুদ্ধ গয়ায়, আর সাবনাথে এসে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেছিলেন। সারনাথে ছোট লাইনের স্টেশন আছে। কিন্তু যাত্রীরা বাসেই যায়, ট্যাক্সি ও সাইকেল রিক্সাতেও যায়। মাইল চারেক পথ। সারনাথে পৌঁছে ঘুরে ঘুরে সব দেখতে হয়।



আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে সাধুজী এই বৌদ্ধ তীর্থের কথা সযত্নে এড়িয়ে যাচ্ছেন। বুদ্ধগয়ার মতো সারনাথের কথাও অসমাপ্ত রেখে বিন্ধ্যাচলের কথা শুরু করলেন। বললেনঃ কাশী থেকে এলাহাবাদের ট্রেন পাওয়া যায়। কিন্তু বিন্ধ্যাচলে যেতে হলে মোগলসরাই থেকে এলাহাবাদের ট্রেন ধরতে হয়। মাঝ পথে মির্জাপুরের পরের স্টেশনই বিন্ধ্যাচল। বিন্ধ্যাচলে বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দির। একান্ন মহাপীঠের অন্যতম। সতীর বাম পদাঙ্গুলি পড়েছিল এইখানে, ভৈরব পুণ্যভাজন। মন্দির পথের ধারে নয়, ছোট একটি পাহাড়ের উপরে মন্দির। সদর রাস্তার দুধারে দোকানপাট, যাত্রীর ভীড়। মিষ্টি ও পুজোর উপকরণের দোকান, পাথরের বাসন আর বাঁশের লাঠি। যাত্রীর ঠেলাঠেলি আর কলরবের মাঝেই স্বচ্ছন্দে কেনাবেচা হচ্ছে। মন্দিরটি বড় নয়, তার প্রাঙ্গণও ছোট। সামনের দরজাটি প্রবেশের পথ নয়, এই পথে যাত্রীরা দেবী দর্শন করে বের হচ্ছে। অন্য ধারে একটি সঙ্কীর্ণ দরজা দিয়ে ঢুকতে হয়। তার জন্য লাইন দিয়ে দাঁড়াতে হয় যাত্রীদের। কোন বিশেষ তিথিতে এই দেবী দর্শন একটি কঠিন কাজ। মন্দিরের অন্য ধারে খানিকটা দূরে গঙ্গা গয়ার ফল্গু নদীর মতো অনেক নিচে দিয়ে বয়ে গেছে। বাঁধানো সিঁড়ি আছে গঙ্গার ধার পর্যন্ত। যাত্রীরা স্নান করে মন্দিরে পূজা করতে আসে।

সাধুজী এবারে পুরাণের কথা শোনালেন, বললেনঃ বামন পুরাণে আছে যে সহস্রাক্ষ ইন্দ্র দুর্গাকে নিয়ে গিয়ে বিন্ধ্য পর্বতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আর দেবতাদের পূজা পেয়ে তিনি বিন্ধ্যবাসিনী নামে বিখ্যাত হয়েছেন। যে চণ্ডী আমাদের ঘরে ঘরে পাঠ হয়, তার কাহিনী সকলেরই জানা। দেবী দুর্গা-মূর্তিতে মহিষাসুর বধ করেছিলেন, বধ করেছিলেন চণ্ড মুণ্ড রক্তবীজ শুম্ভ ও নিশুম্ভকে। দেবী পুরাণের মতে এই যুদ্ধ হিমালয়ে হয়েছিল, কিন্তু অন্য পুরাণের মতে এই যুদ্ধ হয়েছিল বিন্ধ্যাচলে। মহিষাসুরকে বধ করে দেবী বিন্ধ্য পর্বতে বাস করছিলেন, রক্তবীজ এই সংবাদ দিল শুম্ভ নিশুম্ভকে। পূর্ব

জন্মে রক্তবীজ ছিল মহিষাসুরের পিতা রম্ভাসুর। আর মহিষাসুরের দুই অমাত্য চণ্ড ও মুণ্ড দেবীর ভয়ে নর্মদার জলে লুকিয়ে ছিল। সবাই মিলে প্রতিশোধ নেবার সংকল্প করল।

প্রথমে তারা সুগ্রীব নামে এক অসুরকে বিন্ধ্য পর্বতে দেবীর কাছে পাঠাল দূত রূপে। সুগ্রীব দেবীর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, দেবি, ত্রিলোকে তোমার মতো সুন্দরী যেমন নেই, শুম্ভ নিশুম্ভও তেমনি সর্বশ্রেষ্ঠ বীর, তুমি তাদের একজনকে বরণ কর। দেবী বললেন, খুব ভাল কথা, কিন্তু বাধা কি জান! আমি একটা প্রতিজ্ঞা করে বসে আছি, যুদ্ধে আমায় জয় করে যে আমার দর্পনাশ করবে আমি তারই গলায় বরমাল্য দেব। শুম্ভ নিশুম্ভ যখন দেবতাদের জয় করছেন তখন আমাকে জয় করা তাঁদের পক্ষে কঠিন হবে না। যুদ্ধে আমাকে জয় করতে বল।

কাজেই যুদ্ধ অনিবার্য হল। শুম্ভ নিশুম্ভ মহিষাসুর বধের প্রতিশোধ নেবে, আর দেবী অসুরদের বধ করে দেবতাদের প্রতিষ্ঠিত করবেন স্বর্গ রাজ্যে। সুগ্রীব গিয়ে দেবীর উত্তর জানাতেই শুম্ভ নিশুম্ভ রেগে অস্থির। ধূম্রলোচনকে ডেকে বলল, তুমি সসৈন্যে গিয়ে তার কেশাকর্ষণ করে এইখানে নিয়ে এস। তারপর ঘোর যুদ্ধ বাধল। দেবী যেমন করে মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন, তেমনি করে একে একে বধ করলেন ধূম্রলোচন চণ্ড মুণ্ড ও রক্তবীজকে, তারপরে শুম্ভ নিশুম্ভকে। এই যুদ্ধের প্রাণবন্ত বিবরণ আছে দেবী মাহাত্ম্য চণ্ডীতে।

সাধুজী একটু বিশ্রাম নিয়ে বললেন: বিন্ধ্যাচলে আর একটি মন্দির আছে লোকালয় থেকে দু আড়াই মাইল দূরে একটি জনহীন পাহাড়ের উপরে। দেবীর নাম অষ্টভুজা। অনেক অলৌকিক কাহিনী শোনা যায় স্থানীয় লোকের মুখে। টাঙ্গায় এসে পাহাড়ের পাদদেশে নামতে হয়, তারপর ধাপে ধাপে সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে ওঠা। ছোট একটি প্রাঙ্গণের প্রান্তে দেবালয়। মন্দির নয়, একটি গুহার মধ্যে আছেন দেবী অষ্টভুজা। এই গুহা অজন্তা বা ইলোরার মতো কারুকার্য-মণ্ডিত নয়, গুহাকে মন্দির বলেও মনে হয় না। পাহাড়ের গুহা বলতে যা বোঝা যায় তাই। সংকীর্ণ প্রবেশের পথ, মাথা নিচু করে ঢুকতে হয়। এক সঙ্গে কয়েকজন দাঁড়াতে পারে গুহার ভিতরে। গুহার দেওয়ালের গায়ে দেবীর মূর্তি। বিন্ধ্যবাসিনী দুর্গা বোধহয় এখানে অষ্টভুজা নামে পরিচিত।

এরই পাশে আর একটি মন্দির। সেও একটি গুহা, কিন্তু আরও বেশি সংকীর্ণ তার প্রবেশের পথ। অত্যন্ত সন্তর্পণে শরীর ও মাথা বাঁচিয়ে এই গুহা মন্দিরের দেবী দর্শন করতে হয়। দেবীর নাম মহাকালী। মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতীও আছেন বিন্ধ্যাচলে। পাহাড়ের উপরে দর্শনীয় স্থান আরও

আছে—কয়েকটি কুণ্ড, সীতাকুণ্ড ব্রহ্মকুণ্ড অগস্ত্যকুণ্ড।

তাউজী এতক্ষণ নীরবে ছিলেন, এইবারে বললেন : কোন অলৌকিক কাহিনী বলবেন না ?

সাধুজী বললেন : অলৌকিক কাহিনীতে কি সবার বিশ্বাস আছে !

না থাক সবার বিশ্বাস, যার আছে তার জন্যেই বলুন।

সাধুজী বললেন : পাহাড়ের উপরে যে গুহা আছে তার ভিতরে নাকি অনেক দূর যাওয়া যায়। কিন্তু আজকাল আর কেউ বেশি দূর অগ্রসর হতে সাহস পায় না। অনেক দিন আগে তিনজন সন্ন্যাসী এসেছিলেন এই গুহায় প্রবেশের জন্য। দেবীর পূজারী তাঁদের বাধা দেয়, বলে যে গুহার ভিতরে প্রবেশ করতে হলে মির্জাপুর থেকে সরকারের অনুমতি পত্র আনতে হবে। সন্ন্যাসীরা নিজের দায়িত্বে এই কাজ করছেন, এই মর্মে একটি দলিলে সই করে সরকারের নিকট অনুমতি পত্র সংগ্রহ করলেন। তারপরে ঢুকলেন মন্দিরের মধ্যে। কিছু দূর অগ্রসর হতে না হতেই একজন সন্ন্যাসীর মৃত্যু হল। তবু সাহস করে অন্য দুজন এগিয়ে গেলেন এবং শেষ পর্যন্ত গিয়ে এক অপরূপ কন্যার সাক্ষাৎ পেলেন। তিনি দোলনায় দুলছিলেন, আর তাঁর সখীরা তাঁকে ব্যজন করছিল। সন্ন্যাসীদের দেখতে পেয়ে কন্যা বললেন, কী চাও তোমরা ? তাঁরা বললেন, আপনাকে দর্শনের জন্যই এসেছি। দেবী বললেন, তাহলে এখনি ফিরে যাও। আর সাবধান, কাউকে এ সব কথা বোলো না। সন্ন্যাসীরা বাহিরে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু সহসা একজনের বাক্‌রোধ হয়ে গেল। তাঁর বোধহয় বাসনা হয়েছিল এই কথা প্রচার করবার। আর একজনের বাকরোধ হল পরে, তৃতীয় ব্যক্তির কাছে এই কথা প্রকাশ করবার পাপে।

সাধুজী আর একটি গল্প বললেন আমাদের। এক বালকের গল্প। মায়ের সামনে সে নিত্য চণ্ডীপাঠ করত। কিন্তু তার পাঠ কিছু অশুদ্ধ হত। তাই দেখে এক পণ্ডিত তাকে মূর্খ বলে গাল দিলেন। রাতে সেই পণ্ডিত স্বপ্ন দেখলেন যে দেবী তাঁকেই মূর্খ বলছেন। আর পণ্ডিত তাঁর সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হলে দেবী শাপ দিলেন যে তাঁর কুষ্ঠ হবে। প্রভাতে উঠে পণ্ডিত দেখলেন যে তাঁর সর্বাঙ্গে কুষ্ঠ হয়েছে, আর যন্ত্রণার যেন শেষ নেই। এক ব্রহ্মচারী বাস করতেন নিকটে, পণ্ডিত তাঁর কাছে গিয়ে সব কথা জানালেন। ব্রহ্মচারী বললেন, এক কাজ কর। গরম ঘৃতে তুলসীপাতা ভিজিয়ে সেই ঘৃত মায়ের দেহে লাগাও। পণ্ডিত এই কাজ করে অনেক আরাম পেলেন। তারপরে ব্রহ্মচারী বললেন, এবারে চন্দনে তুলসীপাতা ভিজিয়ে সেই চন্দন মাখাও মায়ের গায়ে। পণ্ডিত ভাবলেন, মায়ের পাথরের দেহে চন্দন না মাখিয়ে নিজের দেহে মাখালেই তো আরও আরাম হবে। পণ্ডিত এবারে

তাই করলেন। ব্রহ্মচারী এ কথা জেনে বললেন, সর্বনাশ! মায়ের দেহ পাথরের, এই তোমার বিশ্বাস হলে কি তুমি আর বাঁচবে! সত্যি সত্যিই পর দিন পণ্ডিতের মৃত্যু হল।

বিন্ধ্যাচলের কথাও শেষ হল এইখানে।



সাধুজী বললেনঃ বিন্ধ্যাচল থেকে এলাহাবাদ। এলাহাবাদ কোন তীর্থ-স্থান নয়, তীর্থ হল প্রয়াগ। প্রয়াগে ত্রিবেণী সঙ্গম, গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী এখানে মিলিত হয়েছেন। সরস্বতীর ধারা অদৃশ্য, এখানে এই নদী গুপ্ত ভাবে প্রবাহিত। সমুদ্র মন্থনে যে অমৃত উঠেছিল, দেবাসুরের কাড়াকাড়ির সময় এক বিন্দু অমৃত কুম্ভ থেকে প্রয়াগের মাটিতে পড়েছিল। প্রয়াগ তাই কুম্ভের অধিকারী হয়েছে। ১৯৭৮ সালে প্রয়াগে কুম্ভযোগ হয়েছে, বারো বছর পর আবার সেই যোগ আসবে।

প্রয়াগ ভারতের প্রাচীনতম তীর্থের অন্যতম। ঋগ্বেদে এই নামের উল্লেখ আছে কিনা জানি না, কিন্তু গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে স্নানের মাহাত্ম্যের কথা আছে। এই সাদা ও কালো জলের মিলিত ধারায় স্নান করে স্বর্গলাভ হয়, আর অমরত্ব লাভ হয় এইখানে দেহ রক্ষা করে। মহাভারতে ঋষি পুলস্ত্য বলেছেন যে পিতামহ ব্রহ্মা এখানে পুষ্করের মতো বিরাট যজ্ঞ করেছিলেন। যাগ শব্দ থেকেই প্রয়াগ। প্রয়াগের নিকটে ছিল কুমার বন। বৈবস্বত রাজার পুত্র সুদ্যুম্ন সেই বনের নিষিদ্ধ স্থানে গিয়ে নারী হয়ে যায়। তার নাম হয় ইলা। চন্দ্রের পুত্র বুধের সংসর্গে এসে ইলার যে পুত্র হয় তারই নাম পুরুরবা। শিবের বরে ইলা এক মাস পুরুষ ও এক মাস নারীর জীবন যাপন করতেন।

রামায়ণের যুগে এটি অরণ্যময় প্রদেশ ছিল, আর ঋষি ভরদ্বাজের আশ্রম ছিল এইখানে। রাম এই পথে বনবাসে গিয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির বড় বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন। আত্মীয় পরিজনের মৃত্যুতে শোকে তিনি অধীর হয়েছিলেন। মার্কণ্ডেয় ঋষি তখন বারাণসীতে ছিলেন, তিনি তাড়াতাড়ি হস্তিনাপুরে এসে যুধিষ্ঠিরকে প্রয়াগে যাবার উপদেশ দিয়েছিলেন। শুধু পাপ স্খালন হবে না, মানসিক শান্তিও ফিরে

পাওয়া যাবে।

সাধুজী বললেন ঃ প্রয়াগে তীর্থ যাত্রার নানা নিয়ম আছে। তার মধ্যে প্রথম হল যে পদব্রজে এই যাত্রা করতে হয়। সে যুগে যানবাহন ছিল না, সে যুগের কথা অন্য। এখন আর এ নিয়ম কেউ মানে না। দ্বিতীয় হল মাথা মুড়োবার নিয়ম। এ নিয়মও আমাদের অনেক তীর্থে আছে। প্রয়াগেও আছে। পুরুষ ও বিধবারা মাথা মুড়োয়, সধবারা দু আঙুল পরিমাণ চুল কেটে গঙ্গার জলে দেয়। এ সবে বিশ্বাস যাদের নেই, তাদেরও অনেকে গোঁফ দাড়ি চেঁচে জলে ফেলে।

চোখের চশমা সরিয়ে তাউজী বললেন ঃ তীর্থস্থানে মাথা মুড়োবার নিয়ম হয়েছে কেন ?

সাধুজী বললেন ঃ শাস্ত্রের কথায়। পাপ নাকি চুলের গোড়া আশ্রয় করে, তাই পাপ তাড়াতে মাথা মুড়োতে হয়।

আমার এক বন্ধুর কথা মনে পড়ল। সে আমাকে বলেছিল যে প্রয়াগের নাপিতেরা নাকি একটি মজার কথা বলে—প্রয়াগেতে মুড়িয়ে মাথা, মর গে পাপী যথা তথা। কিন্তু এলাহাবাদের নাপিত বাঙলা বলে, এ কথা আমার বিশ্বাস হয় নি। আর সবাই যে মাথা মুড়োয়, তাও নয়। রামকৃষ্ণ দেব যখন তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে প্রয়াগে এসেছিলেন তখন মথুরবাবুরা মাথা মুড়িয়েছিলেন, আর রামকৃষ্ণ দেব বলেছিলেন যে তাঁর মাথা মুড়োবার প্রয়োজন নেই।

এলাহাবাদ সম্বন্ধে তাউজী কিছু জানতে চাইলেন, কিন্তু সাধুজী নিজে থেকেই বললেন ঃ এলাহাবাদে দুটো রেলওয়ে স্টেশন। একটা ছোট লাইনের, আর বড় লাইনের একটা। এক্কা টাঙ্গা সাইকেল রিক্সা আছে। হেঁটে যাওয়া অসম্ভব নয়। তীর্থের টান না থাকলেও প্রয়াগে একবার যাওয়া দরকার। একখানা নৌকো ভাড়া করে ত্রিবেণী সঙ্গমের দিকে এগোতে হয়। আকবর বাদশাহর তৈরি দুর্গের ধার দিয়ে যমুনা বয়ে যাচ্ছে। আর গঙ্গা নেমে আসছে অন্য ধার থেকে। রৌদ্র কিরণে গঙ্গার জল রূপোর পাতের মতো ঝিকমিকিয়ে উঠবে। যমুনার নীল জল সেই সাদা জলে রঙ বদলাতে পারবে না। যত দূর দেখা যায় সাদা আর নীল জল যেন পাশাপাশি বয়ে যাচ্ছে। যাত্রীরা এখানে অক্ষয় বট দেখে, দেখে পাতাল পুরী মন্দির। ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম আর নেই, লোকে বলে যে সেই আশ্রমের উপরেই এলাহাবাদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়েছে। দুর্গের ভিতরে নাকি একটি অশোক স্তম্ভ পুরনো বৌদ্ধ কীর্তির সাক্ষ্য দিচ্ছে।

আর একটি কথা না বললে প্রয়াগের কথা অসম্পূর্ণ থাকবে। এই প্রয়াগে সম্রাট হর্ষবর্ধন পঞ্চবার্ষিক মহোৎসব করতেন। গঙ্গা যমুনার সঙ্গম স্থলের

পশ্চিম দিকের ময়দানকে বলা হত দানক্ষেত্র বা সন্তোষ ক্ষেত্র। সম্রাট তাঁর রাজকোষের ঐশ্বর্য এনে এইখানে স্তূপীকৃত করতেন। নানা দেশ থেকে আসত হিন্দু বৌদ্ধ জৈন ও দরিদ্র নারায়ণ। অকৃপণ হাতে সম্রাট দান করতেন। এখন দান করতে কেউ আসে না, দান গ্রহণ করতেও আসে না কেউ। এখন সাধু মহাত্মারাই আসেন ভাব বিনিময় করতে।



প্রয়াগের কথা শেষ করে সাধুজী জিজ্ঞাসা করলেন: এবারে কোন্ দিকে যাব? মথুরা-বৃন্দাবনের দিকে, না অযোধ্যায়?

তাউজী বললেন: যে দিকে আপনার খুশি।

সাধুজী বললেন: খুশির কথা নয়। মথুরা বৃন্দাবন গেলে দিল্লী হয়ে হরিদ্বারে যাওয়া যায়, অযোধ্যা বাদ পড়ে। আর অযোধ্যায় গেলে সোজা হরিদ্বারে চলে যেতে হয়।

তাউজী বললেন: তাহলে ফেরার পথে মথুরা-বৃন্দাবন দেখা যাবে।

সাধুজী বললেন: সেই ভাল। সেখান থেকে দ্বারকাপুরী। কৃষ্ণের কথার আগে তাহলে রামের কথা বলি। কিন্তু রামের কথার আগেও কিছু কথা আছে। অযোধ্যার নাম মোক্ষদায়িকা পুরী হল কেন, সেই কথা। ব্রহ্মার প্রপৌত্র সূর্য, তাঁর পুত্র মনু এই অযোধ্যার পত্তন করেছিলেন। যুদ্ধে অজেয় বলে নগরের নাম হয়েছিল অযোধ্যা। এই সূর্য বংশে মনুর তেত্রিশ পুরুষ পরে রাম।

অযোধ্যার বর্ণনা আছে রামায়ণের আদি কাণ্ডে। প্রশস্ত রাজপথে এক কণা ধুলো থাকত না, ভিজে পথের দু ধারে ফুটে থাকত নানা রঙের ফুল। কত সৌধ, কত উদ্যান, কত আম্রকানন, অস্ত্রাগারও কত। নগরের চারি দিকে শালগাছের মেখলা, বাহিরে জলদুর্গম পরিখা। নানা দেশ থেকে বণিক আসত বাণিজ্যে, করদ রাজারাও আসতেন। তাঁদের জন্যে স্থানে স্থানে সীমন্তিনীদের নাট্যশালা।

সাধুজী একটু থেমে বললেন: রাম রাজ্যে সদম্ভে নদী বইত, কিন্তু মানুষের কোন দম্ভ ছিল না। বংশে লোক কুলীন ছিল, কিন্তু তাদের ধন

[illegible] ছিল না। বিভ্রম ছিল নারীর বিলাসে, পণ্ডিতের কোন বিভ্রম ছিল না। কুটিলগামী ছিল দেশের নদী, প্রজারা নয়। আর কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি ছিল তমোযুক্ত, মানুষ নয়। রজোযুক্ত হত রমণী, ধার্মিক মানুষের কোন রাজসিক ভাব ছিল না। মানুষের ধনে আনন্দ ছিল, কিন্তু ভোজনে নয়। তার মানে, ধনগৌরবে মানুষ মত্ত হত না, অন্ন থাকত আহারে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সাধুজী বললেন ঃ সেই রাম নেই, সেই অযোধ্যাও নেই। অতীতের অযোধ্যা অনেকবার অরণ্যে পরিণত হয়েছে। এখন একটি শহর রামের স্মৃতি বুকে নিয়ে বেঁচে আছে। পাণ্ডাদের কাছে শুনেছি যে এখন সেখানে ছিয়ানব্বুইটি মন্দির আছে. তার মধ্যে বিষ্ণুর মন্দিরের সংখ্যা তেষট্টি আর শিবের মন্দির তেত্রিশ। শুনে আশ্চর্য হতে হয় যে মসজিদও আছে ছত্রিশটি। বৌদ্ধ জৈন ও খ্রীষ্টানদেরও তীর্থস্থান এই অযোধ্যা।

বাধা দিয়ে তাউজী বললেন ঃ এত সংক্ষেপে নয়। দর্শনীয় স্থানগুলির কথা একটু ভাল করে বলুন।

সাধুজী হেসে বললেন ঃ অযোধ্যায় লোকে এখন রামকোট দেখে, রামের দুর্গ। জন্মস্থান রাম-সীতার স্থান ও স্বর্গদ্বার দেখে। রামায়ণের অনেক মূর্তি আছে—দশরথ ও কৈকেয়ী, বিশ্বামিত্র, কনক সীতা, রাজবেশে হনুমান প্রভৃতি। এই সব মূর্তি শিল্পমণ্ডিত না হলেও ধর্মভাবের সহায়ক। লোকে মণি পর্বত সুগ্রীব পর্বত কুবের পর্বত দেখে, আর দেখে সরযূর ঘাটগুলো—রাম লক্ষ্মণের ঘাট, স্বর্গ ঘাট। সকল সম্প্রদায়ের মঠ আছে এখানে। বৈষ্ণবদেরই আছে সাতটি মঠ।

সাধুজীর কথায় আমি লক্ষ্য করলাম যে তিনি যে সব নাম করলেন তা সবই রাম ও রামায়ণের স্মৃতি। রামায়ণ ইতিহাস না কাব্য, তা আমাদের জানা নেই। কেউ ইতিহাস বলেন, কেউ বলেন কাব্য। যাঁরা ইতিহাস বলে মেনে নিয়েছেন, তাঁরা রামায়ণের কালও নির্ণয় করেছেন। রাম নাকি রাজত্ব করেছেন খ্রীষ্টের জন্মের দু হাজার বছর আগে। এ কথা আমি কার কাছে শুনেছিলাম, তা মনে করতে পারলাম না। আমার অন্য কথা মনে এল। ইতিহাসের এক রাজা আজ দেবতায় পরিণত হয়েছেন কিংবা এক মহাকাব্যের নায়ক। কৃষ্ণের কথাও তাই। মহাভারতের কাহিনী যদি ঐতিহাসিক হয় তো কৃষ্ণ ছিলেন একজন সাধারণ মানুষ। মহাভারত উপন্যাস বা মহাকাব্য হলে তিনিও একজন নায়কের মতো চরিত্র। কালক্রমে এই দুজনই এ দেশের পূজনীয় দেবতায় পরিণত হয়েছেন। এর পিছনে আছে অবতার বাদ। রাম বিষ্ণুর অবতার, কৃষ্ণের জন্মও হয়েছে

বিষ্ণুর অংশে। আমরা তাই এই দুই নায়ককে দেবতার আসনে বসিয়েছি। তাঁদের জন্মস্থান ও লীলাস্থানগুলি পবিত্র তীর্থে পরিণত হয়েছে। সাধুজী আজ রামের অযোধ্যার কথা বলছেন। এর পরে কৃষ্ণের মথুরা বৃন্দাবন ও দ্বারকার কথাও বলবেন।

সাধুজী কিন্তু থামলেন না, বললেন ঃ অযোধ্যার কথায় রাজা বিক্রমাদিত্যের কথা স্মরণ না করে উপায় নেই। বৌদ্ধ অধিকার বিলুপ্ত হবার পর প্রাচীন অযোধ্যার বিস্তৃত স্থানগুলি তিনিই উদ্ধার করেন, ধ্বংসস্তূপ খুঁড়ে বার করেন রামের জন্মস্থান। দশরথের দুর্গ প্রাসাদের নাম দেন রামকোট। মণি পর্বত গন্ধমাদনের অংশ। হনুমান যখন হিমালয় থেকে গন্ধমাদন পর্বত নিয়ে লঙ্কায় যাচ্ছিলেন, ভরত তখন শরাঘাত করে তার একাংশ নামিয়েছিলেন অযোধ্যায়। তিনশো ষাটটি দেবালয় নির্মাণ করেছিলেন বিক্রমাদিত্য। এখন সেখানে কটা দেবালয় আছে তা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না।

বলে তিনি গুরুজীর দিকে তাকালেন। কথা বলতে যে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল, গুরুজী তা লক্ষ্য করেছিলেন। নিঃশব্দে তিনি সভা ভঙ্গের অনুমতি দিলেন।



দুপুর বেলায় চার পায়ের উপরে চিৎ হয়ে শুয়ে আমি শকুন্তলাদির কথা ভাবছিলাম। তিনি ঠিকই বলেছেন, মনে যদি ভক্তি না থাকে তো মিথ্যা হয়ে যাবে তীর্থের কথা। আমাদের দেবতা তো আমাদের সামনে এসে বলেন না, এই দেখ আমাকে! দেবতাকে আমাদের অন্তরের মধ্যেই দেখতে হয়। দীর্ঘ দিনের একাগ্র তপস্যায় মন যখন দর্শনের আশায় উন্মুখ হয়ে ওঠে, তখনই এক দিন মনে হয় যে বুঝি দেখেছি তাঁকে। ক্রমে ক্রমে সেই মনে হওয়া বিশ্বাসে পরিণত হয়। যে রূপে দেখতে চেয়েছি, সেই রূপেই দেখি তাঁকে। নিজের মনের মাধুরী মিশিয়েই আমরা আমাদের ধ্যানের দেবতাকে দেখি।

দরজার বাহিরে হঠাৎ একটা হাসির শব্দ শুনে আমি চমকে উঠলাম। এ

হাসি আমি চিনি। তাউজীর অনূঢ়া কন্যা সুপ্তি এসেছে পরিহাস করতে। আমি মুখ তুলে দেখলাম যে চেনুলুও এখন চোখ বুজে আছে। দুপুরে আমরা ঘুমোই না। ঘুমোবার সময় নেই। সকাল বেলায় বাগানে কাজ করতে হয়েছে। নূতন আশ্রম, তার চারি দিকে ফল ফুল ফোটাবার ভার আমাদের উপরে। সন্ধ্যা বেলায় আমরা উপাসনার মন্দিরে সমবেত হই নূতন কথা শোনবার জন্য। সে সমস্ত কথা লিখে রাখবার সময় এই দুপুর বেলাটি। এক দিন ঘুমোলে আর এক দিন তা লেখা যায় না, ভুল হয়ে যায় অনেক কিছু। আবার সময়ও পাওয়া যায় না। আহারের পর একটু খানি বিশ্রাম করেই কাজের জন্য আবার উঠে বসি। যতক্ষণ কাজ শেষ না হয়, ততক্ষণ আমাদের ছুটি নেই। এরই মধ্যে সংস্কৃত শেখা আছে। তার জন্যে পাধ্যের কাছে গিয়েও এক এক দিন উপস্থিত হই। নানা বিষয়ে বই পড়াও আছে। এ এক বিচিত্র জীবন। এখানে আসবার আগে এ রকম জীবনের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। আবার এখান থেকে চলে যাবার পরেও এ রকম জীবন হয়তো স্বপ্নের মতো মনে হবে।

সুপ্তির হাসি শুনে আমি নির্লিপ্ত ভাবে শুয়ে রইলাম। কিন্তু চেনুলুর দেহে যেন বিদ্যুতের ছোঁয়া লেগেছে এমনি ভাবে সে উঠে বসল। সুপ্তি আর একবার হেসে উঠল খিলখিল করে।

এ রকম ঘটনা নূতন নয়, তাই আমি কোন কৌতূহল প্রকাশ করলাম না। কিন্তু চেনুলু চুপ করে থাকতে পারল না, চেঁচিয়ে উঠল ঃ হাসছ যে ?

আমি জানি যে আমি এই প্রশ্ন করলে সে চেনুলুকে দেখিয়ে দিত। কিন্তু এবারে সে আমাকেই দেখিয়ে দিল আঙুল দিয়ে, আর অস্পষ্ট ভাবে বলল ঃ তার কথা ভাবছে।

চেনুলু কতকটা আশ্বস্ত হয়ে বলল ঃ কার কথা ?

সুপ্তি বলল ঃ মিসেস খুরানা চলে যাবার পর থেকে বিনায়কের আর মন ভাল লাগছে না।

নিজের সম্বন্ধে এ রকমের একটা মন্তব্য শুনলে চেনুলু খুব চটে উঠত। কিন্তু আমার সম্বন্ধে বলেই সে নির্বিকার ভাবে শুয়ে রইল। আমি চটবার কোন কারণ দেখি না। মিসেস খুরানার স্বামী বিদেশে আছেন বলে তিনি এই আশ্রমে এসে ঢুকেছিলেন। কিন্তু এই আশ্রমের ব্যবস্থা তাঁর ভাল লাগে নি, আলোচনার বিষয়বস্তুও বোধহয় তাঁর পছন্দ হয় নি। তবু তিনি দেবাসুরের কথা শুনেছেন অন্য সব আশ্রমবাসীর মতো। আর সময় কাটাবার জন্যে একজন সঙ্গী খুঁজেছিলেন। তাই তিনি বিকেলে বেড়াবার জন্যে আমাকে কয়েক দিন ডেকেছিলেন, আমি তাঁর সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলাম। এই পর্যন্তই বন্ধুতা। তার চেয়ে সুপ্তি অনেক বেশি ফষ্টিনষ্টি করছে

চেনুলুর সঙ্গে, নানা ভাবে তাকে উৎপাত করছে। এও এক ধরণের উৎপাত। কাজেই আমি যে তার লক্ষ্য নই, এই ভেবে তার কথার কোন জবাব দিলাম না। কিন্তু পুরাতন ভাবনার সূত্রটি আর খুঁজে পেলাম না। মনে পড়ল যে আজ থেকে সাধুজী হরিদ্বার ও হিমালয়ের তীর্থগুলির কথা শুরু করবেন। আমার মনে হল যে ভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থগুলি সব হিমালয়ের উপরেই অবস্থিত এবং এর পরে আর কোন তীর্থের কথা থাকতে পারে না। কিন্তু সাধুজী তার পরেও অনেক তীর্থের কথা বলবেন। সমগ্র পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের কথা এখনও বাকি আছে। হিমালয়ের তীর্থ প্রসঙ্গ শোনবার পরে কি আর কিছু আমাদের ভাল লাগবে! বোধহয় লাগবে না। তাউজীকে আমি কি এই কথা বলব! না তিনি আমার কথা শুনে হেসে উড়িয়ে দেবেন! তার চেয়ে শকুন্তলাদিকে একবার এই কথা বললে মন্দ হয় না। তাঁর মতামতের দাম আমার চেয়ে বেশি। আর তিনি বোধহয় গুরুজীকেই এই কথা বলবার সাহস পাবেন।

আমি খাটিয়া থেকে উঠে পড়লাম। সোজা চলে গেলাম শকুন্তলাদির কাছে। আমাকে দেখে শকুন্তলাদি আশ্চর্য হলেন না, শুধু হাসলেন একটুখানি, আর এই হাসি দেখে আমি লজ্জা পেয়ে গেলাম। শকুন্তলাদি বসে বসে কিছু লিখছিলেন, খাতাখানা মুড়ে বললেন ঃ কী বলবে বসে বল।

নিজের বক্তব্য আমি তাঁকে বুঝিয়ে বললাম। সব শুনে শকুন্তলাদি বললেন ঃ এর চেয়েও একটা বড় কথা ভেবে দেখেছ কি? কাল আমরা রামের জন্মস্থানের কথা শুনলাম। মানুষ রাম হিন্দুর দেবতায় পরিণত হয়েছেন। ঋষি বাল্মীকি যা করেন নি বা পারেন নি, কবি তুলসীদাস তা করেছেন—বাল্মীকির মানুষ নায়ক রামের উপরে দেবত্ব আরোপ করেছেন। মানুষ আজ রাম নাম করে মুক্তির পথ খোঁজে। সাধু সন্তরা বলেন, মুক্তির জন্যে রাম নাম জপ কর। দেবর্ষি নারদের কথায় দস্যু রত্নাকর এই রাম নাম জপ করে ঋষি বাল্মীকি হয়েছিলেন, তবু তিনি রামকে দেবতা বলেন নি। ত্রেতা যুগে মানুষের উপাসনা প্রচলিত হয় নি বলেই বোধহয় তিনি এ কাজ করেন নি! পরবর্তী কালে রামকে আমরা বিষ্ণুর অবতার বলে মেনে নিয়ে তাঁর মন্দির নির্মাণ করলাম। তাঁর জন্মস্থান অযোধ্যা একটি তীর্থে পরিণত হল। কিন্তু—

বলে শকুন্তলাদি থামলেন।

আমি কোন প্রশ্ন করে তাঁর ভাবনাকে বাধা দিলাম না। খানিকক্ষণ ভেবে তিনি বললেন ঃ আমি কী ভাবছি জান? কৃষ্ণ দ্বাপরের মানুষ। রামের মতো তিনি বিষ্ণুর অবতার নন, বিষ্ণুর অবতার হলেন বলরাম। সেই কৃষ্ণ এখন বিষ্ণুর সঙ্গে অভিন্ন বলে সারা ভারতেই স্বীকৃত হয়ে গেছেন।

তাঁর লীলাভূমি মথুরা বৃন্দাবন ও দ্বারকায় নয়, সমগ্র দক্ষিণ ভারতে কৃষ্ণ ও বিষ্ণু নানা রূপে পূজা পাচ্ছেন।

শকুন্তলাদির কথা খণ্ডন করতে পারি এমন যুক্তি আমার জানা ছিল না।

শকুন্তলাদি বললেন: কৃষ্ণকে আমরা গোপাল মূর্তিতে পূজা করি, দক্ষিণ ভারতে বলে বালগোপাল, কৃষ্ণের সে শিশু বা বালক রূপ। তারপর বংশীধারী কৃষ্ণ বা বেনুগোপাল তাঁর যৌবনের রূপ। দ্বারকায় আমরা রণছোড়জী কৃষ্ণকে দেখি, কিন্তু তাঁর মূর্তি সেখানে শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী বিষ্ণুর মূর্তি। বিষ্ণু কোন দিন রণে ভঙ্গ দেন নি যুদ্ধ ত্যাগ করবার জন্য কৃষ্ণেরই নাম হয়েছে রণছোড়জী। বৈষ্ণবেরা কেউ বিষ্ণুর উপাসনা করেন, কেউ করেন কৃষ্ণের উপাসনা। তাঁদের কাছে কৃষ্ণ ও বিষ্ণুতে কোনও প্রভেদ নেই।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস কি কৃষ্ণকে বিষ্ণু রূপে কল্পনা করেছিলেন?

শকুন্তলাদি বললেন: না। মহাভারতের কৃষ্ণকে মানুষ বলেই মনে হয়। কৃষ্ণের উপর দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে শ্রীমদ্ভগবতে, সেখানে তিনি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে জন্মেছেন।

আমি মহাভারতের কথা মনে করবার চেষ্টা করলাম। কৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত সেখানে নেই, কৃষ্ণের কোন অলৌকিক ক্ষমতার কথাও নেই মহাভারতে। তিনি কংসকে বধ করেছেন, কিন্তু জরাসন্ধের ভয়ে মথুরা থেকে পালিয়ে গেছেন। পাণ্ডবদের যজ্ঞ সভায় তিনি শিশুপালকে বধ করেছেন। আবার কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ এড়াবার জন্য যথসাধ্য চেষ্টা করেছেন, যুদ্ধের সময় সারথি হয়েছেন অর্জুনের। গীতা তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি, নিজের সারা জীবনের সাধনাকে তিনি বিশ্বের মানুষের জন্যে রেখে গেছেন। মহাভারতে কৃষ্ণ যেন একান্ত ভাবেই মানুষ। মানুষের মতো তিনি শোক দুঃখ পেয়েছেন, মরেছেনও মানুষের মতো।

শকুন্তলাদি বললেন: মহাভারতের লেখক বলেছেন নর ও নারায়ণ ঋষি অর্জুন ও কৃষ্ণ হয়ে জন্মেছেন। এই নারায়ণ একজন ঋষি ছিলেন, বিষ্ণু নন। কিন্তু কালক্রমে তিনি বৈকুণ্ঠবাসী বিষ্ণুতেই পরিণত হয়েছেন, আর এই কথা বৈষ্ণবরা নিয়েছেন মেনে।

আমি আমার নিজের কথা শকুন্তলাদিকে স্মরণ করিয়ে দিলাম। বললাম: তাহলে আমরা রামের কথার পরে কৃষ্ণের কথা শুনি না কেন?

শকুন্তলাদি বললেন: তাহলে তাউজীকে এই কথা বলে এস।

ভয় পেয়ে আমি বললাম: না না, তিনি আমার কথা শুনবেন না।

শুনবেন না কেন!

তারপরেই আমার মুখের দিকে চেয়ে সহাস্যে বললেন : আচ্ছা, আমিই বলব।

খুশি হয়ে আমি তাঁর ঘর থেকে ফিরে এলাম।



সাধুজীকে আমরা দিনের বেলায় দেখতে পাই নে। তিনি গুরুজীর কাছে যান, না অন্য কোথাও চলে যান তাও জানতে পারি নি। সন্ধ্যার সময় তিনি গুরুজীর সঙ্গে উপাসনার মন্দিরে এসে উপস্থিত হলেন। তাউজী আগেই আসেন, আর বসেন সকলের সামনে। রূপোর ফ্রেমের চশমাটা খুলে রাখেন তাঁর খাতার উপরে। দরকার হলেই সেটা পরেন। আজও তিনি সকলের সামনে এসে বসেছিলেন এবং তাঁর দিকে চেয়েই সাধুজী বললেন : অযোধ্যার পরে হরিদ্বারের কথা বলা চলবে না। হরিদ্বার ও হিমালয়ের তীর্থ কথা এখন তোলা রইল। রামের পরে কৃষ্ণের কথা বলার হুকুম হয়েছে। কাজেই আমাদের অযোধ্যা থেকে মথুরা যেতে হবে। এর জন্য সুবিধা হল এলাহাবাদে ফিরে এসে তুফান এক্সপ্রেসে চাপা, শেষরাতে ট্রেন ধরলে দুপুর বেলায় মথুরায় নামা যাবে। কিংবা লক্ষ্ণৌ কানপুর ও টুণ্ডলায় ট্রেন বদল করেও যাওয়া যায়। ছোট লাইনের গাড়িও আছে, তাতে সময় বেশি লাগে।

মথুরাপুর বা মধুপুর প্রতিষ্ঠা করে মধু দৈত্য। কিন্তু তাঁর পুত্র লবণ ছিল অত্যাচারী। তাই তাকে হত্যা করে আপন আধিপত্য বিস্তার করেন রামানুজ শত্রুঘ্ন। এ কালের প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বলেন যে শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে যে মাহোলি গ্রাম সেখানেই ছিল মধু দৈত্যের মধুপুর, শত্রুঘ্ন তাঁর পুরী নির্মাণ করেন বর্তমান কাটরা গ্রামের নিকট যেখানে ভূতেশ্বর মন্দির অবস্থিত। এখানে বসতি স্থাপন করেন সূর্যসেন। এর জন্ম কংসের বংশে।

মথুরা থেকে বৃন্দাবনের ট্রেন আছে। কিন্তু যাত্রীরা সড়ক পথেই যাতায়াত করে বেশি, দূরত্ব মাইল সাতেক। পথে যেতে যেতে মনে হবে যে তীর্থস্থান দুটি ভিন্ন নয়, যেন জোড়া তীর্থ, একই তীর্থের দুটি পাড়া মথুরা আর বৃন্দাবন।

তাউজী বললেন : বৃন্দাবন নামের কি কোন মানে নেই ?

সাধুজী বললেনঃ বৃন্দার বন। কিন্তু বৃন্দার অনেক মানে। তার ভেতর সব চেয়ে প্রচলিত হল রাধা, যার অনেক বৃন্দ বা সখী ছিল। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে শুনেছি বৃন্দাবনের এই মানে, কিন্তু অনেকে বলেন যে কেদার রাজের কন্যা বৃন্দা এইখানে তপস্যা করে কৃষ্ণকে পেয়েছিলেন। আবার অনেকে রাজা কুশধ্বজের কন্যা তুলসী ওরফে বৃন্দাব নামও করেন। তুলসীও তপস্যা করে হরিকে পেয়েছিলেন এই ক্ষেত্রে। কিন্তু এ সব গল্প আমাদের খুব পরিচিত নয় বলেই প্রথম মানেটাই আমরা মেনে নিয়েছি।

নানা বিঘ্নের জন্যে ব্রজধাম মথুরা ত্যাগ করে নন্দ এসেছিলেন বৃন্দাবনে। কৃষ্ণের পরামর্শেই এসেছিলেন। গোপ-গোপীদের নিয়ে তাঁরা প্রথমে গাছের নিচে রাত্রিবাস করেন। তারপর কৃষ্ণের ইচ্ছায় বিশ্বকর্মা এক রাতে এই নগর নির্মাণ করেন।

মুসলমান আমলে বৃন্দাবনের সব কিছুই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। বাঙলার চৈতন্য যখন কৃষ্ণের লীলাস্থল দেখতে বৃন্দাবনে এসেছিলেন, তখন কিছু দেখতে না পেয়ে তিনি কেঁদে আকুল হয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করেছিলেন রূপ ও সনাতন গোস্বামী। দীর্ঘ দিন ব্রজমণ্ডলে বাস করে তাঁরা সমস্ত তীর্থ উদ্ধার করেছিলেন।

মথুরা থেকে মাইল দশেক দূরে মধুবন। এই রকম দ্বাদশ বন ও উপবন আছে। বহুলা গাভীর নামেও বন আছে। এই গাভী ছিল ধার্মিক মানুষের মতো। প্রবাদ আছে যে বহুলাকে একবার বাঘে ধরে। তার বাছুর ছিল ঘরে, তাকে তখন দুধ দেবার সময়। বহুলা বাঘের কাছে মিনতি করে কিছুক্ষণের জন্য প্রাণ ভিক্ষা নেয়। তারপরে বাছুরকে দুধ দিয়ে বাঘের কাছে ফিরে আসে। এই বাঘ আর কেউ নয়, স্বয়ং বিষ্ণু বহুলার পরীক্ষা নিতে এসেছিলেন। পর্বতের গুহায় গো মন্দির আর পাথরের গায়ে ক্ষোদা বহুলা গাই, তার বাছুর আর মধুসূদনের মূর্তি। গোবর্ধন পাহাড়ের কাছে আছে রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড। শ্যামকুণ্ডের জল কালো, আর তপ্ত কাঞ্চনের রঙ রাধা কুণ্ডের জলের। অথচ এই দুই কুণ্ডের জলের নাকি যোগাযোগ আছে।

একে একে অনেক গল্প বলেন সাধুজী। লুকলুক গুহায় কৃষ্ণ লুকোচুরি খেলতেন, দুধের জন্যে লুকিয়ে থাকতেন সাঁকারি ঘোরে। ফুলের মালা গেঁথে গোপীদের সঙ্গে খেলা করতেন খেলবনে. রাধার জন্যে বাঁশী বাজাতেন সংকেত স্থানে। গাঁঠোলি গ্রামে তাঁদের প্রেমের গ্রন্থি-বন্ধন, ডাঙ্গোলিতে মান সরোবর, রাধার মান ভঞ্জন করেন তারই তীরে।

বুড়িকা খেরার গল্প বলবার সময় সাধুজী হেসে বললেনঃ রাধার সহচরী ছিল মানবতী। তার স্বামীর রূপ ধারণ করে একদিন কৃষ্ণ

এলেন মানবতীর ঘরে। মানবতী শাশুড়িকে পাহারা রাখল। বলল, অন্য কেউ এলে যেন তার মাথা ভেঙে দেওয়া হয়। বুড়ি মাথা ভাঙল তার নিজের ছেলের।

এরপরে সাধুজী বললেন : বৃন্দাবনে গোবিন্দজী মন্দিরের কথা সকলের আগে বলতে হয়। মন্দিরে বিরাট দালান ও প্রশস্ত চত্তর। রূপ সনাতন এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা বটে, কিন্তু অর্থ ছিল আকবর বাদশাহর সেনাপতি মানসিংহের। সে যুগে এই মন্দিরের মাথা এমন ছোটখাট ছিল না, পাঁচটা উঁচু চূড়া ছিল। সন্ধ্যা বেলায় যখন ঘি-এর প্রদীপ জ্বালা হত তখন দিল্লী থেকেও ঔরঙ্গজেব বাদশাহ একটা চূড়া দেখতে পেতেন। একদিন তাঁর উজিরের কাছে জানতে চাইলেন, এই আলো কোথা থেকে আসছে। উজীর বললেন, মথুরার আলো, কাফেররা বাতি জ্বেলেছে তাদের বড় মন্দিরে। বাদশাহ তখনি লোক পাঠালেন সেই মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ তৈরির জন্য। কিন্তু তারা বিগ্রহের কোন ক্ষতি করতে পারে নি, আগে ভাগে খবর পেয়ে মন্দিরের পুরোহিতেরা গোবিন্দজীর বিগ্রহ অম্বরে সরিয়ে ফেলেছিলেন।

তারপরে মদনমোহনের মন্দির। প্রবাদ আছে যে মুলতানের বণিক কৃষ্ণদাস যখন পণ্য বোঝাই নৌকো নিয়ে আগ্রার দিকে যাচ্ছিলেন, তখন কালিদহ ঘাটের কাছে বালির চরে তাঁর নৌকো আটকায়। তিন দিনের অক্লান্ত চেষ্টাতেও যখন নৌকো এগোল না, তখন কৃষ্ণদাস এসে সনাতন গোস্বামীর শরণ নিলেন। সনাতনের সমস্ত ভরসাই তো মদনমোহন। প্রাণ ভরে সেই মদনমোহনকেই তিনি ডাকলেন। তাতেই নৌকো চলল। কৃষ্ণদাস অকৃতজ্ঞের মতো ভেসে চলে যেতে পারলেন না, ফেরার পথে তাঁর সমস্ত অর্থ দিলেন মদনমোহনের মন্দির নির্মাণের জন্য।

এই মন্দিরের সঙ্গে আর একজনের নাম জড়িয়ে আছে। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি সুরদাস আমিন ছিলেন আকবর বাদশাহর অধীনে, আর নিজের রোজগারের শেষ কড়িটি পর্যন্ত ব্যয় করতেন মদনমোহনের সেবায়। দিল্লীতে একবার টাকা পাঠাতে পারলেন না, পাথর পাঠালেন সিন্দুক ভরে। ধরা পড়ে বন্দী হলেন, কিন্তু বাদশাহ তাঁকে মুক্তি দিলেন। শুনে সবাই আশ্চর্য হল যে আকবর বাদশাহ মদনমোহনের স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন।

বৃন্দাবনে মন্দিরের শেষ নেই। আকবরের সভাসদ রায় সিংহ তৈরি করেছিলেন গোপীনাথের মন্দির। এখন তার জীর্ণ অবস্থা। পাশেই নতুন মন্দির তুলেছেন নন্দকুমার বসু। রায় সিংহের বড় ভাই লোমকরণ নির্মাণ করেছিলেন যুগলকিশোরের মন্দির, রাধা বল্লভজীর মন্দির সুন্দর দাসের তৈরি। শ্রীরঙ্গজীর মন্দির তুলেছেন শেঠ লক্ষ্মীবাঈ, আর কৃষ্ণচন্দ্রমার মন্দির বাঙলার লালা বাবুর কীর্তি। এ ছাড়াও আছে কাচের মন্দির,

সাহজীর মন্দির, আর মথুরা থেকে বৃন্দাবন যাবার পথে বিড়লার তৈরি মন্দির।

সাধুজী বললেনঃ মন্দিরের পর ঘাটের কথা। কংসকে বধ করে কৃষ্ণ যেখানে বিশ্রাম করেছিলেন তার নাম বিশ্রান্তি ঘাট। নন্দের কন্যা যোগনিদ্রাকে কংস যে ঘাটে আছড়ে ছিলেন, তার নাম যোগ ঘাট। কাল নাগকে ধ্বংস করতে কৃষ্ণ যেখানে জলে নেমেছিলেন, তার নাম কালিয় দমন ঘাট। এই রকম ছাব্বিশটি ঘাটের মধ্যে চীর ঘাট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই ঘাটে কৃষ্ণ গোপীদের বস্ত্র হরণ করেন। আজও তার নিশানা আছে গাছের ডালে ডালে, নানান রঙের কাপড়ের টুকরো বাঁধা। যাত্রীরা পয়সা দিয়ে কাপড় কিনে গাছে বেঁধে যাচ্ছে।

ঘাটের মতো বট আছে। অক্ষয় বটের জন্মের হিসেব নেই, আর বংশী বটের নিচে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণ বাঁশী বাজাতেন। তারপরে কুণ্ড আর বন। নিকুঞ্জ বনে বাঁদরের অত্যাচার, দু পয়সার ছোলা না নিয়ে গেলে নিস্তার নেই। কুঞ্জ বন রাধা কৃষ্ণের লীলক্ষেত্র। সেখানকার গাছপালা যেন মাটির উপরে লুটিয়ে আছে। ছোট একটি মন্দিরও আছে, তার ভিতরে ললিতা ও বিশাখা সখীর সঙ্গে রাধা কৃষ্ণ। সবাই বলেন, এ বড় জাগ্রত মন্দির। আজও প্রতি রাত্রে কৃষ্ণ এখানে রাধারাণীর সেবা নিতে আসেন। সন্ধ্যাবেলায় আরতির পর এক ঘটি জল আর দাঁতন সাজিয়ে রেখে পাণ্ডারা চলে যান। রাতে মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ। সকালে এলে দেখা যায় যে শুধু শয্যারই ব্যবহার হয় নি, দাঁতনে দাঁত মেজে ঘটির জলে মুখও কেউ ধুয়ে গেছে। পাণ্ডার কাছে দর্শনী দিয়ে যাত্রীরা এর প্রমাণ দেখে যান।

সাধুজী বললেনঃ শুনেছি, এ কথা বিশ্বাস হয় নি আকবর বাদশাহের। তাই তিনি নিজের চোখে দেখতে এসেছিলেন। কী দেখেছিলেন তিনিই জানেন, কিন্তু তাঁরই আমলে এই বৃন্দাবন গড়ে উঠেছিল। তানসেনের গুরু হরিদাস স্বামীও ছিলেন এইখানে। সর্বত্যাগী পুরুষ, যমুনার জলে ফেলে দিয়েছিলেন স্পর্শমনি। তানসেনের সঙ্গে আকবর বাদশাহ যখন তাঁর কাছে এসেছিলেন, তিনি বাদশাহকে আদর না করে শিষ্যকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। আকবর অসামান্য পুরুষ ছিলেন, তাই একটুও ক্ষুণ্ণ না হয়ে প্রচুর ভূসম্পত্তি দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁকে।

সাধুজী থামলেন এই পর্যন্ত বলে। আমরা ভাবলাম যে মথুরা বৃন্দাবনের কথা বুঝি শেষ হয়ে গেল। কিন্তু তাউজী এই কথা শেষ করতে দিলেন না, বললেনঃ মথুরার পৌরাণিক কথা ভাল করে বলেন নি।

সাধুজী বোধ হয় অন্য কথা ভাবছিলেন, তাই তাউজীর মুখের দিকে তাকালেন নিঃশব্দে। তাউজী বললেনঃ মথুরার পৌরাণিক ইতিহাস

আমাদের ভাল মনে নেই। কৃষ্ণ কেন মথুরা পরিত্যাগ করে দ্বারকায় চলে গেলেন, সে কথাও মনে পড়ছে না।

সাধুজী এক মুহূর্ত ভেবে বললেন ঃ রামের রাজত্বকালে মধু দৈত্য ছিল মথুরার অধিপতি। তপস্যা করে শিবের কাছে এক শূল পেয়ে দুর্ধর্ষ হয়ে উঠেছিল। সেই শূল সে তার পুত্র লবণকে দিয়েছিল। লবণের অত্যাচারের কথা পৌঁছল রামের কানে। রাম শত্রুঘ্নকে পাঠিয়ে দিলেন লবণ দমনে। লবণকে হত্যা করে শত্রুঘ্ন মথুরা অধিকার করেছিলেন।

দ্বাপরে মথুরা ছিল উগ্রসেনের অধিকারে। কংস তাঁর ক্ষেত্রজ পুত্র। কন্যা রোহিণী ও দেবকীর বিবাহ হয়েছিল বসুদেবের সঙ্গে। দুর্বৃত্ত কংস তার শ্বশুর জরাসন্ধের সহায়তায় উগ্রসেনকে কারাগারে নিক্ষেপ করে মথুরার সিংহাসনে বসেছিল। দেবকীর বিবাহের সময় দৈববাণী হয় যে তাঁর অষ্টম সন্তান কংসের মৃত্যুর কারণ হবে। কংস এ কথা শুনে আর অপেক্ষা করে নি। দেবকী ও বসুদেবকে তখনি কারাগারে রুদ্ধ করে এবং তাঁদের ছয়টি সন্তানকে জন্মের পরেই হত্যা করে। অলৌকিক ভাবে সপ্তম সন্তান বলরাম রোহিণীর কোলে পৌঁছান। কৃষ্ণ তাঁদের অষ্টম সন্তান। গভীর দুর্যোগময় রাত্রিতে বসুদেব এই শিশুটিকে নিয়ে গোকুলে গোপরাজ নন্দের গৃহে পৌঁছে তাঁদের সদ্যোজাত কন্যাকে নিয়ে এলেন কারাগারে। কংস এই কন্যাকেও হত্যা করতে চেয়েছিল, কিন্তু পারে নি। তাকে পাথরে আছাড় মারবার কথা ছিল। কিন্তু সেই কন্যা যোগনিদ্রা অলৌকিক ভাবে আকাশে মিলিয়ে যায় ভবিষ্যদ্বাণী করে। কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ বলরাম রোহিণীর পুত্র বলে পরিচিত। কংসের ভয়ে রোহিণী এঁকেও নন্দালয়ে পৌঁছে দিয়েছিলেন। এই দুটি শিশু বড় হয়ে মাতুলের অত্যাচারের কথা সবই জানলেন। কংসও শুনল এঁদের কথা। তারপর শক্তির পরীক্ষা। কৃষ্ণ-বলরামকে হত্যার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর কংস তাঁদের ধনুর্যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করল। কৃষ্ণকে হত্যা করতে গিয়ে নিজেই নিহত হল কৃষ্ণের হাতে।

জরাসন্ধের নিকটে এই সংবাদ পৌঁছলে কৃষ্ণের মথুরাবাস এক রকম অসম্ভব হয়ে উঠল। জামাতাবধের প্রতিহিংসা নেবার জন্য জরাসন্ধ বারবার এসে মথুরার দরজায় হানা দিতে লাগল। আঠারোবার ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবার পর জরাসন্ধ কালযবন নামে এক পরাক্রান্ত নরপতির সঙ্গে এক যোগে মথুরা আক্রমণে অগ্রসর হল। কালযবনের জন্ম গার্গ্যের অংশে। মহাদেবের নিকট গার্গ্য বর চেয়েছিলেন যে তাঁর পুত্র মহাদেবের অজেয় হবে। কৃষ্ণ এই কথা জানতেন। কাজেই মথুরা থেকে পলায়ন করা ছাড়া আর কোন উপায় খুঁজে পেলেন না। জরাসন্ধের অত্যাচারে তিনি রাজা উগ্রসেনের জন্য নূতন রাজধানী পত্তনের চেষ্টায় ছিলেন, এইবারে স্বজনের সহিত দ্বারাবতীতে

গিয়ে উপস্থিত হলেন। রণে ভঙ্গ দিয়ে কৃষ্ণ পলায়ন করেন বটে, কিন্তু ফিরে এসে কৌশলে কালযবনকে হত্যা করেন। মান্ধাতার পুত্র মুচকুন্দ একটি গুহার ভিতর ঘুমোচ্ছিলেন। দেবাসুরের যুদ্ধে জয়লাভের পর তিনি বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তিনি বর পেয়েছিলেন যে কেউ তাঁর নিদ্রাভঙ্গ করলে তাঁর চোখের আগুনে সে ধ্বংস হবে। কালযবনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে কৃষ্ণ এই গুহায় প্রবেশ করে মুচকুন্দের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। কালযবন চিৎকার করে সেই গুহায় গিয়ে ঢুকতেই মুচকুন্দের নিদ্রাভঙ্গ হল এবং তাঁর চোখের আগুনে কালযবন পুড়ে মরল।

সাধুজী বললেন ঃ এটি হরিবংশের গল্প, আর জরাসন্ধ বধের গল্প আছে মহাভারতে। শুধু নিজের প্রতিহিংসা চরিতার্থের জন্য নয়, জরাসন্ধ বধের প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। নরমেধ যজ্ঞের জন্য জরাসন্ধ অনেক ক্ষত্রিয় রাজাকে বন্দী করে রেখেছিলেন। ভীম অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণ মগধের রাজধানীতে গিয়ে তাকে ভীমের হাতে বধ করিয়েছিলেন।

ঐতিহাসিক যুগে মথুরার উপরে বৌদ্ধ ও জৈন প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছিল। তারপরে আবার হিন্দুর প্রাধান্য ফিরে এসেছিল। একাদশ শতাব্দীতে মথুরার মন্দিরে সমৃদ্ধির অন্ত ছিল না। সুলতান মামুদ এই সংবাদ পেয়ে মথুরা আক্রমণ করেছিল। মথুরায় তখন নাকি পাঁচটি সোনার ও অসংখ্য রূপার বিগ্রহ মূর্তি ছিল। মামুদ সে সব ধাতুর মূর্তি গলিয়ে দিয়েছিল, আর ভেঙ্গে ফেলেছিল পাথরের মূর্তি। এই সমস্ত মূর্তি গলানো সোনা রূপা আর মনিমাণিক্য নিয়ে মামুদ দেশে ফিরেছিল। তারপর ঔরঙ্গজেব এই মথুরার উপরে শেষ আঘাত হেনেছিল। ব্রাহ্মণেরা দেবতাকে রক্ষার জন্য বিগ্রহ নিয়ে রাজস্থানের হিন্দু রাজাদের আশ্রয় নিয়েছিল। মথুরায় এখন সব চেয়ে বড় মন্দির দ্বারকাধীশের।



সাধুজী বললেন ঃ রাজস্থানে কৃষ্ণপ্রেম প্রচার করেছিলেন মীরাবাঈ। চিতোরে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মন্দির ছিল, কিন্তু বিগ্রহ নেই। সে বিগ্রহ উদয়পুরের রাজবাড়িতে আছে বলে অনেকে বলেন। নাথের দ্বার প্রভৃতি স্থানও

বৈষ্ণব তীর্থে পরিণত হয়েছে। একলিঙ্গজী শিবের স্থান। কিন্তু এই সমস্ত তীর্থের কথা বলতে গেলে এই বিরাট দেশের তীর্থের কথা কোন দিন ফুরোবে না। রাজস্থানের শ্রেষ্ঠ তীর্থ পুষ্করের কথা সকলের আগে বলেছি। এই পথেই এগিয়ে গেলে মেহসানা নামে একটা জংসনে পৌঁছানো যায়, সেখান থেকে দ্বারকার গাড়ি। আমরা দিল্লী থেকে ছোট লাইনের গাড়িতে গিয়েছিলাম দ্বারকায়। ভারি মজার ট্রেন, নাম কীর্তি এক্সপ্রেস। তার প্রথম ভাগ ভাবনগরে যাবে, আর দ্বিতীয় ভাগ রাজকোট থেকে দ্বারকায়। তৃতীয় ভাগ পোরবন্দরে যাবে, আর বাকিটা ভেরাবলে। সেখান থেকে টাঙ্গায় চেপে যেতে হয় প্রভাসের সোমনাথ দর্শনে। একেবারে পশ্চিম আরব সাগরের তীরে দ্বারকা পোরবন্দর আর প্রভাস। পোরবন্দরই দ্বাপরের সুদামাপুরী।

কৃষ্ণের প্রথম জীবন যেমন মথুরায় কেটেছে, তেমনি শেষ জীবন কেটেছে দ্বারকায়, প্রভাসে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। প্রভাস শৈব তীর্থও বটে। দুটি বড় জৈন তীর্থ আছে নিকটে—একটি জুনাগড়ের গির্ণার পর্বতে, অন্যটি পলিতানার শত্রুঞ্জয় পাহাড়ে। সৌরাষ্ট্রে তাই তীর্থের অভাব নেই।

সাধুজী একটু ভেবে বললেনঃ যত দূর মনে পড়ে, দ্বারকায় আমি দুপুরে পৌঁছেছিলাম, আর শহর দেখতে বেরিয়েছিলাম বিকেলে। ছোট শহর, তাই টাঙ্গায় না চেপে হেঁটেই বেরিয়েছিলাম। সন্ধ্যাবেলায় দেবতার দর্শন করব বলে শহরের অন্যান্য দর্শনীয় স্থানগুলি আগেই দেখে নিয়েছিলাম। যে বাঁধানো পথ দ্বারকা থেকে উত্তরে গেছে, রুক্মিণী দেবীর মন্দির সেই পথে। মাইল খানেক দূরে। পাশাপাশি দুটি জীর্ণ মন্দির। কাছে কোথাও লোকালয়ের চিহ্ন নেই।

দ্বারকায় সিদ্ধেশ্বর শিব আছেন, কিন্তু যেখানে আছেন তাকে মন্দির বলা চলে না। ভদ্রকালী দেবী ও সত্যনারায়ণও আছেন দ্বারকায়। কিন্তু গোমতী গঙ্গা ও সমুদ্রের মতো পবিত্র স্থান আর নেই। গোমতী গঙ্গা এখানে সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। সেই সঙ্গমের দৃশ্য বড় মনোরম।

গোমতীর তীরেই দ্বারকার প্রাচীন শহর। রণছোড়জীর মন্দির চূড়া দেখা যায় নদীর তীর থেকে। উপরে নিশান ওড়ে পতপত করে। ছাপ্পান্নটা সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠলে মন্দিরের স্বর্গদ্বার। শহরের দিকে সিংহদ্বারের নাম মোক্ষ দ্বার। মন্দিরের প্রাঙ্গণে আরও অনেক দেবদেবী আছেন—তার মধ্যে প্রদ্যুম্নের মন্দিরই সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণের সমস্ত আত্মীয় পরিজনই আছেন—বলরাম অনিরুদ্ধ সত্যভামা জাম্ববতী রাধিকা ও দেবকী মাতা। আছেন রাধাকৃষ্ণ গোপালকৃষ্ণ লক্ষ্মীনারায়ণ কেশব কুলেশ্বর ও পুরুষোত্তম। মহাদেব বেণীমাধব কাশীর বিশ্বনাথ অম্বিকা দেবীও আছেন। আরও আছেন

নবগ্রহ দুর্বাশা ও দত্তাত্রেয়। শঙ্করাচার্যের সারদা মঠও আছে মন্দিরের সংলগ্ন।

মূল মন্দিরের সূক্ষ্মাগ্র চূড়া দূর থেকে দেখা যায়। পাঁচতলার সমান উঁচু মন্দির, ওপরে উঠবার সিঁড়ি আছে। তার জন্য সারদা মঠের অনুমতি দরকার। মন্দিরটি পাথরের তৈরি। এক সময় হয়তো মন্দির গায়ে কারুকার্য ছিল, কিন্তু সে সব মূর্তি আজ অস্পষ্ট। অনেকগুলি স্তম্ভের উপরে প্রশস্ত ভোগমণ্ডপ।

সাধুজী থামলেন এই পর্যন্ত বলে। থেমে রইলেন অনেকক্ষণ। তার'র বললেন: রণছোড়জীর মূর্তি দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। কষ্টিপাথরের চতুর্ভুজ মূর্তি অপরূপ ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান। রণছোড়জী বুঝি আমাদের পরিচিত কৃষ্ণ নন। বৃন্দাবনে আমরা যুগল মূর্তি দেখি কৃষ্ণের দ্বিভুজ মানুষ মূর্তি। এখানে দেবতার মূর্তি। মর্তের মানুষ নন, বৈকুণ্ঠের নারায়ণ। এই দেবতার দেহেই মেবারের রাণী মীরা বাঈ লীন হয়ে গিয়েছিলেন।

তাউজী সাধুজীর মুখের দিকে চেয়ে বললেন: কী রকম?

সাধুজী বললেন: মীরা বাঈয়ের শেষ জীবন কেটেছিল দ্বারকায় এই রণছোড়জীর মন্দিরে। ভাবাবেশে মীরা তখন পাগল হয়ে থাকতেন, আর গান গেয়ে চোখের জলে স্নান করিয়ে দিতেন তাঁর দেবতাকে। ও দিকে মেবারের আকাশে দুর্যোগ এসেছিল ঘনিয়ে। মনে প্রাণে সবাই ভাবছেন মীরার কথা, মেবারের সৌভাগ্য বুঝি তাঁরই সঙ্গে অন্তর্হিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মীরাকে ফিরিয়ে আনাই স্থির হল, রাণা বৈষ্ণব ব্রাহ্মণদের পাঠালেন দ্বারকায়। কিন্তু মীরা তখন আর রাণার রাণী নন, পৃথিবীর সমস্ত মানুষ তখন তাঁকেই দেবতা ভাবছে। ব্রাহ্মণদের অনুরোধ ঠেলতে না পেরে মীরা রণছোড়জীর অনুমতির জন্য মন্দিরে ঢুকলেন, কিন্তু আর ফিরলেন না। সবিস্ময়ে সবাই দেখল যে মীরা নেই, কিন্তু তাঁর পরিধেয় বস্ত্র আছে রণছোড়জীর দেহে। অলৌকিক অনুগ্রহে দেবতা গ্রহণ করেছেন তাঁর পরম ভক্তকে।

সাধুজী বললেন: একজন স্থানীয় লোক আমাকে বলেছিলেন যে দ্বারকার রণছোড়জী হলেন নকল, আসল রণছোড়জী আছেন ডাকোরে।

তাউজী জিজ্ঞাসা করলেন: ডাকোর কোথায়?

সাধুজী বললেন: ডাকোর কোন বড় জায়গা নয়, বড় লাইনের উপরে নয় ডাকোর স্টেশন। আমেদাবাদ থেকে যে লাইন বম্বে গেছে, তার উপরে আনন্দ নামে একটি স্টেশন আছে। এইখানে নেমে ছোট লাইনের গাড়িতে যেতে হয় ডাকোরে। ঘণ্টা দুয়েকের পথ, আমেদাবাদ থেকে তিন চার ঘণ্টায়

পৌঁছানো যায়। প্রতি দিন যত যাত্রী এই তীর্থে যায় তা দেখে আশ্চর্য হতে হয়। নবরাত্রির সময় সেখানে সমারোহের অন্ত থাকে না।

তাউজী জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এই মন্দির আপনি দেখেছেন ?

সাধুজী বললেন ঃ দেখি নি। তবে শুনেছি সেই মন্দিরের কথা। প্রশস্ত অঙ্গনের মধ্যে বেশ বড় মন্দির। ভাল কারুকার্যও আছে। অঙ্গনে প্রবেশের জন্য দুটি দ্বার উত্তরে ও পশ্চিমে। নিকটে গোমতী সরোবর, তার অনেকগুলো বাঁধানো ঘাট। ত্রিকমজী বিষ্ণুর মন্দির আছে, আর আছে ডঙ্কনাথ মহাদেবের মন্দির। ভক্ত বোদানোরও একটি ছোট মন্দির আছে। এই ভক্তই রণছোড়জীকে দ্বারকা থেকে ডাকোরে নিয়ে গিয়েছিল।

এর পর সাধুজী একটি অলৌকিক গল্প আমাদের শোনালেন, বললেন ঃ সে অনেক দিনের পুরনো কথা। বোদানো ছিল ডাকোরের এক বিষ্ণু ভক্ত। প্রতি বছর দ্বারকায় যেত রণছোড়জীর দর্শনের জন্য। কিন্তু সাধারণ যাত্রীর মতো খালি হাতে যেত না। তার হাতের তেলোয় তুলসীর গাছ গজাত, সেই তুলসীর পাতা সে রণছোড়জীকে নিবেদন করত। বছরের পর বছর সে পায়ে হেঁটে দ্বারকায় যেত, আর দেবতাকে দেখে বুক ভরা সুখ নিয়ে ফিরে আসত। একদিন সে বুড়ো হল পা আর চলে না। তবু কোন রকমে দ্বারকায় এসে রণছোড়জীকে বলল, এ কী হল আমার ! আর কি তোমার দর্শন পাব না ? গভীর রাতে স্বপ্ন দেখল বোদানো। রণছোড়জী তাকে বলছেন, ভয় কী ! এবারে আমি তোমার সঙ্গে যাব, আর এখন থেকে ডাকোরেই থাকব। বোদানোর আনন্দ আর ধরে না। ঘুম থেকে উঠে সে ডাকোর যাত্রা করল, আর রণছোড়জী চললেন তার সঙ্গে।

সকালবেলায় রণছোড়জীর পূজারীরা আশ্চর্য হয়ে দেখল যে মন্দিরে বিগ্রহ নেই। কোথায় গেল বিগ্রহ ! বোদানো চুরি করেছে ভেবে তারা তার পিছু নিল। সঙ্গে এক দল ব্যাধ, খুব সাংঘাতিক তাদের লক্ষ্য, একবার দেখলে আর রক্ষা নেই। দেবতা তাই স্বপ্নে বোদানোকে বললেন, গোমতী সরোবরে আমাকে লুকিয়ে রাখ। কিন্তু সরোবরের জলে বর্শার খোঁচা দিয়ে পূজারীরা বিগ্রহ পেয়ে গেল। দেবতা আবার তাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, ব্রাহ্মণদের বল যে তারা বিগ্রহের ওজনের সমান সোনা নিয়ে ফিরে যাবে। রাজী হয়েছিল ব্রাহ্মণেরা, কিন্তু বোদানোর অত সোনা কোথায় ! থাকবার মধ্যে ছিল শুধু স্ত্রীর কানে এক জোড়া সোনার দুল। দেবতাকে স্মরণ করে সে তাই দিল ব্রাহ্মণদের হাতে। কষ্টি পাথরের বিরাট বিগ্রহ রণছোড়জীর, সোনার দিকে চেয়ে পূজারীরা হাসল। কিন্তু দাঁড়ি পাল্লায় ওজন করতে গিয়ে হতবুদ্ধি হল তারা। বিগ্রহের ওজন হল একটি দুলের সমান। ব্রাহ্মণদের কথা রাখতে হল। একটি দুল নিয়ে তারা ফিরে গেল,

আর ডাকোরে প্রতিষ্ঠা হল রণছোড়জীর।

এই রণছোড়জী নাকি পরে দ্বারকার পূজারীদেরও স্বপ্ন দিয়েছিলেন। দ্বারকার সাবিত্রী কূপে আর একটি বিগ্রহ মূর্তি পাওয়া যাবে। সেই মূর্তির প্রতিষ্ঠা হবে মন্দিরে। সত্যিই একটি বিগ্রহ পাওয়া গিয়েছিল কূপের মধ্যে, আর তারই প্রতিষ্ঠা হয়েছে দ্বারকায়।

গল্প শেষ করে সাধুজী কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। আমি ভেবেছিলাম যে এবারে তিনি বোধহয় সোমনাথের কথা বলবেন, কিন্তু তা বললেন না। বললেন ঃ বেট দ্বারকার কথা না বললে দ্বারকার কথা শেষ হয় না। দ্বারকা থেকে ট্রেনে চেপে ওখা বন্দরে যেতে হয়। মোটর বাসেও যাওয়া যায়। সকালের ট্রেনে গিয়ে সন্ধ্যেবেলায় আবার ফিরে আসা যায়। আবার দ্বারকায় না নেমে সোমনাথের দিকেও চলে যাওয়া যায়। ভোরবেলায় রাজকোটে গাড়ি বদল করে ভেরাবল পৌঁছোনো যায় বিকেল বেলায়।

ওখা স্টেশনের খুব কাছে সমুদ্র। জলের ধার বাঁধানো, তারই নিচে ছোট বড় নৌকোর সারি। মোটর লঞ্চও আছে। তাতে চেপে সমুদ্রের মাঝে একটা দ্বীপে যেতে হয়। সেখানেই ছিল কৃষ্ণের দ্বারকাপুরী। তিন মাইল সমুদ্র দাঁড় টেনে পার হবার উপায় নেই, নৌকো চলে হাওয়ার জোরে। অল্প সময়েই ওপারে পৌঁছনো যায়। কিন্তু সমুদ্র থেকে মন্দিরের চূড়া দেখতে পাওয়া যায় না।

সমুদ্রের ধার থেকে মন্দিরের পথ বাজারের মধ্য দিয়ে গেছে। কিন্তু দ্বারকানাথের মন্দিরের সামনে পৌঁছেও বিশ্বাস হয় না যে কোন মন্দিরে এসেছি। মনে হয় একটা বসত বাড়ি, কিংবা একটা ধর্মশালা। গোল খিলানের খোলা দরজা দিয়ে যাত্রীরা যাতায়াত করে।

কিন্তু ভিতরে গিয়ে দেখা যায় অন্য জগৎ। চারি দিকে ঐশ্বর্যের অপচয়। পায়ের তলায় শ্বেত পাথরের মেঝে ঝকঝক করছে, বড় বড় দরজার সবটাই রূপোয় মোড়া। দ্বারকানাথকে ঘিরে আছেন তাঁর পাটরাণীরা—রাধিকা রুক্মিণী সত্যভামা ও জাম্ববতী। প্রত্যেকের আলাদা মন্দির। জাঁকজমকে কেউ কারও ছোট নন। এমন ভারি ভারি রূপোর দরজা দ্বারকায় শুধু রণছোড়জীর সামনেই আছে।

একটু থেমে সাধুজী বললেন ঃ ফেরার পথে আমার একটি প্রশ্ন জেগেছিল মনে। এ মন্দিরকে মন্দিরের মতো করে কেন তৈরি করা হয় নি! কেন কোন চূড়া নেই, আর নেই কোন সিংহদ্বার! এ প্রশ্নের শুধু একটি উত্তরই আমার মনে এসেছিল—বোধহয় মুসলমান নির্যাতনের ভয়ে। সোমনাথের দুরবস্থা কারও অবিদিত ছিল না।



সাধুজী বললেন : ওখা থেকে আমি সোজা চলে এসেছিলাম ভেরাবল। পোরবন্দরে প্রাচীন সুদামা পুরীও দেখতে যাই নি। শুনেছিলাম যে সেখানে সুদামার মন্দির ছাড়াও আরও অনেক মন্দির আছে—শ্রীনাথ গোপীনাথ সোমনাথ কেদারনাথ দ্বারকানাথ ও মদনমোহনের মন্দির। স্বামী বিবেকানন্দ যে এখানে ন মাস বেদাধ্যয়ন করেছিলেন সে কথাও শুনেছিলাম। মহাত্মা গান্ধীর জন্মস্থান বলে পোরবন্দর এখন নূতন তীর্থে পরিণত হয়েছে।

একবার ইচ্ছা হয়েছিল জুনাগড়ে নামবার। নানা ধর্মের তীর্থ এই জুনাগড়। হিন্দুদের আছে বাগেশ্বরী মন্দির দামোদর কুণ্ড রেবতী কুণ্ড মুচকুন্দ মহাদেব ভবনাথ মহাদেব ও আদ্যাশক্তি অম্বাজী। গির্ণার পাহাড়ে দশ হাজার সিঁড়ি ভেঙে জৈন তীর্থে পৌঁছতে হয়। আবার দাতার পাহাড়ে মুসলমান তীর্থ। গির্নার পাহাড়ের কথা মহাভারতে আছে। অর্জুন কৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রাকে বিয়ে করবেন, কিন্তু বড় ভাই বলরামের মত নেই। কৃষ্ণের পরামর্শে অর্জুন তাই সুভদ্রাকে হরণ করে এই তীর্থে বিবাহ করেন। তখন গির্নারের নাম ছিল উজ্জয়ন্ত পাহাড়। কাছেই রৈবতক ও বস্ত্রাপথ। এই নিয়ে হরপার্বতীর গল্প আছে পুরাণে। বিষ্ণু রৈবতকে আছেন, আর পার্বতী অম্বা নামে আছেন উজ্জয়ন্ত পাহাড়ে। গির্নার পাহাড়ে দশ হাজার সিঁড়ি ভাঙলে অম্বা দেবীর সাক্ষাৎ মেলে।

দামোদর কুণ্ডের মাহাত্ম্যের কথাও শুনেছিলাম। গঙ্গার জলে যে গুণ নেই, এই কুণ্ডের জলে তা আছে। মানুষের অস্থি ফেলে দিলে সে অস্থি এখানে গলে মিলিয়ে যায়। তবু আমি জুনাগড়ে না নেমে সোজা এসে ভেরাবলে নামলাম। তার পর দিন সকালে বেরোলাম প্রভাসের পথে।

প্রভাস শুধু শিবেরই স্থান নয়, এ স্থান বৈষ্ণবদেরও পরম তীর্থ। দ্বারকার যাদবেরা খুনোখুনি করে মরবার পরে দেহ ত্যাগের জন্য কৃষ্ণ ও বলরাম বেছে নিলেন এই প্রভাস তীর্থ। জীবনের শেষ কয়েক দিন কৃষ্ণ এই স্থানে অতিবাহিত করেছেন। প্রভাস তাই মথুরা ও দ্বারকার মতো বৈষ্ণবেরও তীর্থ।

ভাল্কা তীর্থ ভেরাবল থেকে প্রভাসে যাবার পথে। সেখানে একটি ছোট মন্দিরের ভিতরে কৃষ্ণের অদ্ভুত মূর্তি আছে। মাটির কৃষ্ণ একটি অশ্বত্থ গাছে হেলান দিয়ে আছেন। তাঁর একটি পায়ের নিচে রক্তের দাগ। হরিণ ভেবে জরা ব্যাধ একটি বাণ মেরেছিল তাঁর পায়ে। সাধারণ মানুষের মতো তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। এই মরণই তিনি চেয়েছিলেন। শৈশবে ননী চুরি করেছেন, যৌবনে করেছেন রাসলীলা, তারপর রাজনীতি ও যুদ্ধ। শেষ জীবনে দর্শন ও ধর্মের চর্চা। প্রভাসে দেহোৎসর্গ নামে যে জায়গা আছে, তা তাঁর দেহোৎসর্গের স্থান বলে নির্দেশ করা হয়। ত্রিবেণীর ধারে তাঁর সৎকার হয়েছিল। সেখানে বলদেবজীর গুহাও আছে, যোগাবলম্বন করে তিনি সেখানে দেহত্যাগ করেন।

সাধুজী বললেন: এ সব হল দ্বাপরের কথা। প্রভাস তার অনেক আগেই পবিত্র তীর্থে পরিণত হয়েছিল। ঋগ্বেদেও আমরা সোমনাথের উল্লেখ দেখি। সিন্ধু উপত্যকায় পাঁচ হাজার বছর আগেও যে শিবের পূজা হত এ তারই প্রমাণ। শাপগ্রস্ত সোম এই তীর্থে তপস্যা করে শাপমুক্ত হয়েছিলেন।

বাধা দিয়ে তাউজী বললেন: এই শাপের গল্প বলবেন না?

সাধুজী বললেন: স্কন্দ পুরাণের অন্তর্গত প্রভাস খণ্ডের গল্প। দক্ষ প্রজাপতি তাঁর সাতাশটি কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন সোম বা চন্দ্রের সঙ্গে। এই মেয়েদেরই একজনের নাম রোহিণী, সোম তাঁকেই বেশি ভালবাসতেন। অন্য বোনেরা পিতার কাছে নালিশ করলে দক্ষ বললেন, এ-সব চলবে না, সকলের সঙ্গে সমান ভাবে বাস করতে হবে। প্রথমটায় সোম রাজী হয়েছিলেন। পরে দেখলেন যে তা অসম্ভব। দক্ষ ভয় দেখালেন শাপের, কিন্তু সোম দক্ষের শাপ মাথা পেতে নিয়ে দিনে দিনে ক্ষয় হতে লাগলেন। তাঁর ক্ষয় দেখে দেবতারাও ভয় পেলেন। তাঁরা গিয়ে দক্ষকে ধরলেন শাপ ফিরিয়ে নেবার জন্য। দক্ষ বললেন, তা নিতে পারি একটি শর্তে—সব স্ত্রীকে সোম সমান চোখে দেখবে। তা যদি পারে, তবে সরস্বতী যেখানে সমুদ্রে মিলেছে সেই প্রভাস তীর্থে স্নান করে মহাদেবের পূজা করুক। ক্ষয় তাকে হতেই হবে, তবে সে মাসের পনর দিন, বাকি পনর দিন সে দিনে দিনে বেড়ে সম্পূর্ণ হবে। কিন্তু সাবধান সে যেন আর কখনও নারী ও ব্রাহ্মণকে হেয় জ্ঞান না করে।

সোম আর দেরি না করে রোহিণীকে নিয়ে প্রভাসে এসে তপস্যা করলেন বার হাজার বছর। শিব সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বাড়বার ক্ষমতা দিলেন, আর দিলেন প্রভা। সেই থেকেই এই স্থানের নাম হল প্রভাস। আর ব্রহ্মা বললেন, তোমরা শিবের মন্দির কর। বলে মাটি ফাঁক করে দেখলেন

শিবের স্বয়ম্ভু স্পর্শ লিঙ্গ। অণ্ডের মতো ছোট, কিন্তু সূর্যের মতো জ্যোতিষ্মান। নাগবলয় বেষ্টনে মধু ও দর্ভে আবৃত ছিল। তারই উপরে সোমনাথের বিরাট লিঙ্গ স্থাপন করলেন ব্রহ্মা নিজে। বৈদিক মন্ত্রে তাঁর প্রাণ পূজা হল। সোম তাঁর দুর্বলতার প্রায়শ্চিত্ত করলেন, আর পৃথিবীর মানুষ পেল এক মহাতীর্থ।

সাধুজী একটু থেমে বললেন ঃ রামায়ণে উল্লেখ আছে কিনা জানি না, কিন্তু মহাভারতের নানা স্থানে প্রভাসের উল্লেখ আছে। পাণ্ডবেরা তীর্থ করতে এসেছিলেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর এসেছিলেন পরীক্ষিৎ ও জন্মেজয়। আর সব চেয়ে বড় কথা এই যে কৃষ্ণ বলরাম এখানে দেহত্যাগ করেন। যত দূর জানি, সোমনাথের প্রথম মন্দির তৈরি হয়েছিল প্রায় দু হাজার বছর আগে যীশু খ্রীষ্টের আমলে। তার পরে গোটা সাতেক মন্দির একে একে ধ্বংস হয়েছে। প্রায় দুশো বছর আগে রাণী অহল্যা বাঈ যে মন্দিরটি তৈরি করে গিয়েছিলেন, সেই মন্দিরে সোমনাথের আজও নিত্যপূজা হচ্ছে। এ মন্দিরটি সমুদ্রের ধারে নয়, সমুদ্র তীর থেকে খানিকটা দূরে নির্জন স্থানে। পুরাতন ভাঙ্গা মন্দিরের ভিতের উপরে নূতন মন্দির তৈরি হয়েছে। অপরূপ সুন্দর মন্দির।

প্রভাসেও অনেকগুলি দর্শনীয় স্থান আছে। শশিভূষণ মহাদেবের মন্দিরে সোম যজ্ঞ করেছিলেন, আর জরা ব্যাধ সেইখান থেকেই কৃষ্ণকে বাণ মেরেছিল। শিবের মন্দির আরও আছে—রুদ্রেশ্বর ও বাণেশ্বর মহাদেব। বিষ্ণু আছেন দৈত্যসূদন, কালীও আছেন। অহল্যা বাঈ-এর মন্দিরের কাছে মহাকালী মন্দির, আর ত্রিবেণী সঙ্গমের শ্মশান ঘাটের নিকট মহাকালিকা মন্দির। আর একটি পরিত্যক্ত জীর্ণ মন্দির আছে সূর্যের। প্রাগৈতিহাসিক যুগের সূর্য পূজার কথা এই মন্দিরটিই মনে করিয়ে দেয়।

প্রভাস থেকে তের মাইল দূরে প্রাচী। সেখানে আছে মোক্ষপিপল্লা, মঙ্গল অশ্বত্থ গাছ। কৃষ্ণ নাকি তাঁর পিতৃপুরুষের উদ্ধারের জন্য এই অশ্বত্থ গাছের গোড়ায় জল দিয়েছিলেন। কাজেই ত্রিবেণীতে স্নান করে যাত্রীরা প্রাচীতে ছুটে যান।

তাউজী উদ্বিগ্ন হয়ে আমার মনের কথাটি বলে ফেললেন ঃ সোমনাথ তো চোখের সামনে ফুটে উঠলেন না!

সাধুজী সহাস্যে বললেন ঃ নূতন মন্দির তৈরি হয়েছে সমুদ্রের ধারে। মনে হয় যেন সমুদ্র থেকে এই মন্দির উঠেছে। মন্দিরের পিছনে ও দুধারে অনন্ত নীল জল। একটার পর একটা ঢেউ এসে মন্দিরের উপরে আছড়ে পড়ছে কিনা, তা দেখা যায় না। খানিকটা এগিয়ে গেলে হয়তো দেখা যাবে যে সমুদ্র অত কাছে নয়, বেলাভূমি পেরিয়ে জল এসে মন্দির ছুঁতে পারে না।

কিন্তু মন্দিরের বাম দিকের দরজা দিয়ে বাহিরে বেরোলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। অকূল সমুদ্র চোখের সামনে উথলে ওঠে। কী বিশাল জলরাশি! কী গভীর জলোচ্ছ্বাস। চাঁদের আলোয় ঐ জলের ধারে গিয়ে বসলে কন্যাকুমারীর সমুদ্র বলে মনে হবে।

সাধুজীর দু চোখ আমি স্বপ্নাচ্ছন্ন দেখলাম। কল্পনায় তিনি যেন সৌন্দর্যের সাগরে ডুবে গেছেন। অনেকক্ষণ তিনি কোন কথা বলতে পারলেন না।



সাধুজী বোধহয় ভেবেছিলেন যে এবারে দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ শুরু করতে পারবেন। এই ভেবে বলেছিলেন: হিমালয়ের তীর্থগুলির কথা যদি পরে বলতে হয় তো উত্তর ভারতের তীর্থের কথার এইখানেই শেষ।

তাউজী তখনি বাধা দিয়ে বললেন: নাসিক বা উজ্জয়িনীর কথা বলবেন না?

সাধুজী একটু থমকে গেলেন, তারপরে বললেন: কুম্ভযোগ হয়, কাজেই কিছু বলা তো উচিত।

কুম্ভযোগের কথায় সমুদ্র মন্থনের কথা উঠে পড়ল। অমৃতের জন্য দেবাসুর সমুদ্র মন্থন করেছিলেন সত্য যুগে। অমৃতের কুম্ভ হাতে সমুদ্র থেকে উঠেছিলেন ধন্বন্তরি। তারপরেই সেই কুম্ভের অধিকার নিয়ে দেবাসুরের বিবাদ শুরু হয়েছিল। বিষ্ণু মোহিনী মূর্তিতে সেই অমৃত কুম্ভ হরণ করে দেবতাদের অমৃত খাইয়েছিলেন। এই গল্প আমরা দেবতার কথায় শুনেছি। কিন্তু সাধুজী আমাদের অন্য কথা বললেন: অমৃতের অধিকার নিয়ে দেবাসুরের যুদ্ধ হয়েছিল বারো দিন। আর ঐ বারো দিনে কুম্ভটি চারবার মাটিতে রাখা হয়েছিল—হরিদ্বার প্রয়াগ নাসিক ও উজ্জয়িনীতে। দেবতার বারো দিন মানুষের বারো বৎসর। তাই বারো বৎসর পরে পরে সেই সব জায়গায় কুম্ভযোগ হয়। হরিদ্বার ও প্রয়াগে ছ বছর পর পর যে কুম্ভযোগ হয়, তাকে বলে অর্ধকুম্ভ।

তাউজী জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কুম্ভযোগের তিথি নক্ষত্র কি এক নয় ?

সাধুজী হেসে বললেন ঃ অমৃত কুম্ভ যে জায়গায় যখন নামানো হয়েছিল, কুম্ভ স্নানের যোগ সে জায়গায় সেই সময়েই চলে আসছে। যেমন, হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ডে মহাবিষুব সংক্রান্তিতে, আর মকর সংক্রান্তিতে প্রয়াগের ত্রিবেণী সঙ্গমে। তার মানে গ্রীষ্মকালে হরিদ্বারে, আর প্রয়াগে শীতের সময়। নাসিকের কুশাবর্ত ঘাটে কুম্ভযোগ হয় চাতুর্মাস্যে, মানে বর্ষার সময়। আর বৈশাখের পূর্ণিমায় উজ্জয়িনীর শিপ্রা নদীতে হয় কুম্ভের স্নান। প্রয়াগের প্রসঙ্গে বোধহয় বলেছি যে রাজা হর্ষবর্ধন পাঁচ বছর পর পর সাধুদের এক সম্মেলন আহ্বান করতেন। প্রয়াগে এই সম্মেলন হত। অনেকে মনে করেন যে এই সময় থেকেই কুম্ভ মেলার প্রবর্তন হয়। এই ঘটনা সপ্তম শতাব্দীর! এর আগে এই ধরণের সম্মেলনের কোন নজির ইতিহাসে নেই। সাধুদের এই সম্মেলনের ধারা এখনও পুরোপুরি বজায় আছে। কুম্ভযোগে দেশের সমস্ত সম্প্রদায়ের সাধু সন্ন্যাসী এসে একত্র হন। দশনামী বৈরাগী উদাসী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরাই শোভাযাত্রার সম্মুখে থাকেন।

তারপরে সাধুজী বললেন ঃ কুম্ভস্নানের একটা বিশেষ যোগ আছে। চৈত্র মাসের সংক্রান্তি হল মহাবিষুব সংক্রান্তি। সেদিন যে সময়ে কুম্ভ রাশির সঙ্গে বৃহস্পতি ও মেষ রাশির সঙ্গে রবির মিলন হয়, সেই সন্ধিক্ষণে হয় পূর্ণ কুম্ভযোগ। এই ঘটনা শুধু হরিদ্বারেই হয় বারো বছর পর পর, তাই হরিদ্বারের কুম্ভই শ্রেষ্ঠ। কুম্ভ স্নান করতে হয় ব্রহ্ম কুণ্ডে। এ জায়গাটি লক্ষ লক্ষ লোকের একই যোগে স্নানের উপযোগী নয়। তাই একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করতে হয়। শহর থেকে শোভাযাত্রা বেরিয়ে নির্দিষ্ট পথে গঙ্গার ধারে এসে ব্রহ্ম কুণ্ডে স্নান করে নির্দিষ্ট পথে বেরিয়ে যাবে। সরকারী ব্যবস্থা এমন যে কোন নিয়ম ভঙ্গ দাঙ্গা মারামারি হবে না। শোভাযাত্রায় ঢুকে পড়তে পারলেই চলন্ত কিউএ চলে স্নান করে বেরিয়ে যাওয়া যায়।

এই শোভাযাত্রার পুরোভাগেই থাকবেন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়। তাঁদের ভেক দেখে সম্প্রদায় চিনতে হয়। ভেক মানে সাজ সজ্জা ও ফোঁটা তিলক। ভস্মমাখা জটাধারী দিগম্বর দেখলে আমরা নাগা সন্ন্যাসী বলি, তেমনি গেরুয়াধারী মুণ্ডিত কেশ সাধুকে ভাবি পরমহংস। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে জটা বাঁধবারও কায়দা আছে—কেউ মাঝখানে বাঁধেন, কেউ ডানে, কেউ বাঁয়ে। যাঁরা উত্তরীয় পরেন তাঁরা গিঁট বাঁধেন কেউ উপরে, কেউ নিচে। তেমনি কপালের তিলকেরও নানা আকার আকৃতি আছে। এই সব দেখেই লোকে সম্প্রদায় চেনে। দশনামী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হলেন শঙ্করাচার্য। তিনিই সাধুদের সম্প্রদায় স্থাপন করে

তাঁর চারটি মঠে অধিষ্ঠিত করে যান। মধ্যযুগে এই সাধু সম্প্রদায় রাজা মহারাজাদের কাছে জায়গা জমি ও জায়গীর পেয়ে আখড়া স্থাপন করেন। এই সব আখড়ার সন্ন্যাসীরা শুধু ধর্ম চর্চাই করতেন না, ধর্ম রক্ষার জন্য যুদ্ধ বিগ্রহও করেছেন, আর শান্তির সময় করেছেন ধর্ম প্রচার। ভালা তাঁদের দেবতা। ভালা মানে বল্লম। কুম্ভস্নানের সময় শোভাযাত্রায় সাধুরা বেরোবেন ভালা দেবতাকে সামনে নিয়ে। প্রথমেই দশনামী সম্প্রদায়—নির্বাণী আখড়ার সঙ্গে অটল আখড়া, নিরঞ্জনী আখড়ার সঙ্গে আনন্দ আখড়া, তার পর জুনা আখড়ার সঙ্গে আবাহন ও অগ্নি আখড়া, দশনামীর এই সাতটি আখড়া সকলের আগে। তারপরে বৈরাগী উদাসী ও নির্মলা সম্প্রদায়। নানকপন্থীরা নির্মলা সম্প্রদায় নামে পরিচিত, আর নানকের পুত্র শ্রীচাঁদ প্রতিষ্ঠা করেছেন উদাসী সম্প্রদায়। হরিদ্বারে একবার কুম্ভমেলা না দেখলে ভারতের সাধু মহাত্মাদের সম্বন্ধে ধারণা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

তাউজী বললেন: শোভাযাত্রার আর একটু বর্ণনা দিন।

সাধুজী বললেন: একজন নাগা সন্ন্যাসী ঘোড়ার পিঠে চড়ে দুটি জয় ঢাক বাজিয়ে চলেন। এর নাম দিগ্বিজয় ডঙ্কা। তার পিছনেই দিগ্বিজয় ঝাণ্ডা। এক নাগা সন্ন্যাসী ঘোড়ায় চড়ে গেরুয়া রঙের এক পতাকা বহন করে চলেন। এই দুটিই হল শঙ্করাচার্যের জয়ধ্বনি ও জয় পতাকা। তারপরে কসরৎ দেখাতে দেখাতে চলবেন নাগা সন্ন্যাসীরা, কেউ ঘোড়ার পিঠে কেউ পায়ে হেঁটে। যুদ্ধের বাজনা বাজবে। পুরাকালে এই সন্ন্যাসীরা যে ধর্ম রক্ষার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন, তারই অভিনয় হবে শোভাযাত্রায়। দণ্ডধারী ধুনাধারীরা যাবেন, হাতীর পিঠে যাবে নীল রঙের বিজয়ী ঝাণ্ডা, আর গেরুয়া পতাকা। ব্রাহ্মণরা বেদ পাঠ করতে করতে যাবেন, হাতে চামর। প্রত্যেক আখড়ার আলাদা নিদর্শন, নাম লেখা নিশান। তাঁদের ইষ্ট দেবতা থাকবেন সোনা-রূপো আর ফুলের মালায় সাজানো পাল্কিতে। আখড়ার মণ্ডলীশ্বররা কেউ যাবেন পাল্কিতে, কেউ হাতির পিঠে চড়ে। মাথার উপরে জরির ছাতা, দুধার থেকে চামর দোলাবেন দুজনে। যেন কোন রাজা বা বাদশাহ চলেছেন। সাধু মহাত্মাদের শোভাযাত্রা শেষ হলে সাধারণ যাত্রী যাবে কাতারে কাতারে।



সাধুজী এবার নাসিকের কথায় ফিরে এলেন, বললেন ঃ নাসিকে কুম্ভস্নান হয় চাতুর্মাস্যের সময়। সাধারণ ভাবে বর্ষাকালকে বলে চাতুর্মাস্য কিন্তু তিথি নিয়মে আষাঢ়ের শুক্লা একাদশী থেকে কার্তিকের শুক্লা একাদশী পর্যন্ত চার মাস হল চাতুর্মাস্য। বোধ হয় মনে পড়বে যে কিষ্কিন্ধ্যায় রাম এই চাতুর্মাস্য উদ্‌যাপন করেছিলেন, তারপর বেরিয়েছিলেন লঙ্কা জয়ে।

তাউজী বললেন ঃ নাসিকে কি চার মাস ধরে কুম্ভস্নান হয়?

সহাস্যে সাধুজী বললেন ঃ না। হরিদ্বারের মতো সেখানেও তিন দিন স্নান। হরিদ্বারে শিবরাত্রিতে প্রথম স্নান, দ্বিতীয় স্নান অমাবস্যায়, আর প্রধান স্নান হল মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন। নাসিকে প্রথমেই প্রধান স্নান। শ্রাবণ মাসে বৃহস্পতির সঙ্গে মঙ্গলের ও শুক্রের সঙ্গে সিংহ রাশির মিলনে পূর্ণ কুম্ভের স্নান। ভাদ্রের অমাবস্যায় দ্বিতীয় স্নান ও কার্তিকের শুক্লা একদশীতে শেষ স্নান।

বোম্বে থেকে কলকাতার পথে নাসিক রোড স্টেশন। শহর মাইল ছয়েক দূরে গোদাবরীর তীরে। পাকা পুলের এ পারে নাসিক ও পারে পঞ্চবটী, রামের পাদস্পর্শে এই স্থান তীর্থে পরিণত হয়েছে।

সাধুজী একটু থেমে বললেন ঃ পুরাকালে বিন্ধ্য পর্বত সংলগ্ন এই সমগ্র এলাকা বোধহয় দণ্ডকারণ্য নামে পরিচিত ছিল। বিধবা ভগিনী শূর্পনখাকে রাবণ এই অঞ্চলের অধিকার দিয়েছিলেন। খর দূষণ নামে দুই আত্মীয় রাক্ষস শূর্পনখার সেনাপতি ছিল। লক্ষ্মণ যেখানে শূর্পনখার নাক কেটেছিলেন, সেই স্থানেরই নাম হয়েছে নাসিক। কিন্তু নাসিকে এখন আর অরণ্য নেই, সঙ্কুচিত হয়ে গেছে সেকালের বিশাল দণ্ডকারণ্য। নাসিক ও পঞ্চবটী এখন শহরে পরিণত হয়েছে। যাত্রীরা রামকুণ্ডে স্নান করে কালেশ্বর শিব দর্শন করে। গঙ্গার মতো পবিত্র হল গোদাবরী, গোদাবরীতে অস্থি বিসর্জন ও পিণ্ড দানের বিধি আছে।

পঞ্চবটীতে রামের মন্দির আছে। কালো পাথরের তৈরি বেশ বড়

মন্দির, নাটমন্দির তার সংলগ্ন। ধনুর্বাণধারী রামের দণ্ডায়মান মূর্তি নানা অলঙ্কারে শোভিত। কষ্টিপাথরের বিগ্রহ। সীতাগুহা সেখান থেকে অল্প কিছু দূরে। একটি পাকা বাড়ির ভিতর ঢুকে সরু সিঁড়ি দিয়ে ধাপে ধাপে নিচে নেমে যেতে হয়। ঘুরে ঘুরে এই ধাপগুলি পৌঁছেছে একটি গুহার মতো ঘরের সামনে, হামাগুড়ি দিয়ে তার ভিতরে ঢুকতে হয়। সীতা এখানে নেই, আছে একটি শিবলিঙ্গ। আলো বাতাসহীন ঘর, তেলের প্রদীপে দেখা যায় শিবলিঙ্গ। পূজারীরা পয়সা নিয়ে প্রবাদ শোনায় সীতা-গুহার। খর দূষণের সঙ্গে রাম লক্ষ্মণের ভীষণ যুদ্ধের সময় সীতাকে এই গুহার মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল।

এর পরে যেতে হয় তপোবনে। দু আড়াই মাইল দূরে একটি সংকীর্ণ জলের ধারা এসে মিলেছে গোদাবরীর সঙ্গে। সেই সঙ্গমে একটি ঘর আছে। লোকে বলে, রামের কুটীর ছিল এইখানে। আর এক জায়গায় আছে ছোট মন্দির। তার মধ্যে রাম দাঁড়িয়ে আছেন ধনুর্বাণ হাতে, সামনে সোনার হরিণ মারীচ, তার দেহে একটি তীর আছে বিদ্ধ হয়ে। লোকে বলে রাম মারীচ বধ করেছিলেন এইখানে।

গোদাবরীর অপর পারে আছে কয়েকটি গুহা, তার নাম পাণ্ডব গুহা। পাণ্ডবরা নাকি এই গুহায় তপস্যা করেছিলেন। কিন্তু এ সবের চেয়েও প্রিয় আর একটি তীর্থ স্থান আছে নাসিক থেকে মাইল কুড়ি দূরে গোদাবরীর উৎপত্তি স্থলে। যাত্রীরা নাসিক থেকে বাসে যাতায়াত করে। যে পাহাড়ে গোদাবরীর জন্ম, তার নাম ব্রহ্ম পাহাড়। শ পাঁচেক সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠলে দেখা যায় যে একটি গোমুখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। এই জলই গুপ্ত ধারায় নিচের একটি কুণ্ডে পড়ছে। সেখানে গোদাবরীর মন্দির আছে। কুম্ভের সময় সেখানেও যাত্রীরা স্নান করে। পাহাড়ের নিচে ত্র্যম্বকেশ্বরের মস্ত বড় মন্দির। প্রাচীর বেষ্টিত প্রাঙ্গণ ও নাটমন্দির। কষ্টি পাথরের শিব লিঙ্গ শিবের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম।

তাউজী বললেন ঃ এইবারে উজ্জয়িনীর কুম্ভ স্নানের কথা বলুন।

সাধুজী একটু ভেবে বললেন ঃ মোক্ষদায়িকা সপ্তপুরীর অন্যতম হল অবন্তিকা। কিন্তু আমি যত দূর জানি, অবন্তি হল রাজ্যের নাম, আর উজ্জয়িনী তার রাজধানী। এই উজ্জয়িনীকে অযোধ্যা মথুরা প্রভৃতি তীর্থের সঙ্গে এক পর্যায়ে কেন ফেলা হয়েছে তা আমি বলতে পারি না। কিন্তু বারো বছর পর পর এখানেও কুম্ভ যোগ হয়। বৈশাখী পূর্ণিমায় এখানে একটি মস্ত স্নান হয় শিপ্রা নদীতে আখড়ার ঘাটে। এখানেও মন্দির আছে—মহাকাল ও গোপাল মন্দির। মহাকাল হলেন দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। সুন্দর তাঁর মন্দির। পুরাতন মন্দিরটি ধ্বংস হয়ে যাবার পরে দুশো বছর আগে নূতন

মন্দির নির্মিত হয়েছে। গোপাল মন্দির বাজারের মাঝখানে, রূপায় তৈরি কৃষ্ণের সুন্দর মূর্তি। বড় বড় দরজাগুলিও ঝকঝকে রূপার। কিন্তু মন্দিরটি মহাকালের মন্দিরের মতো প্রাচীন নয়।

উজ্জয়িনী ছিল বিক্রমাদিত্যের রাজধানী। কত কথা ও কিংবদন্তী এই রাজার সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার শেষ নেই। ভর্তৃহরির কথা, তালবেতালের কথা, নবরত্নের কথা, আরও কত কথা। কিন্তু সাধুজী সে সব কথা বললেন না। কিছুক্ষণ ভেবে বললেন: দক্ষিণ ভারতের তীর্থ প্রসঙ্গ শুরু করবার আগে পান্ধারপুরের বিট্ঠল দেবের সম্বন্ধেও কিছু বলা দরকার।

সাধুজী বললেন: এটি মহারাষ্ট্রের তীর্থ, বম্বে থেকে মাদ্রাজ যাবার পথে বড় লাইনের গাড়ি বদল করে ছোট লাইনে যেতে হয় পান্ধারপুর। চন্দ্রভাগা নদীর তীরে মন্দির। স্থানীয় লোকেরা এই নদীকেও গঙ্গার মতো পবিত্র মনে করে। মৃতের অস্থি বিসর্জন দেয় জলে, আর তীরে বসে পিণ্ডদান করে। নদীর মাঝখানেও দুটি মন্দির আছে। যাত্রীরা নৌকোয় যাতায়াত করে, আর নৌকো থেকে শোভা দেখে শহরের।

বিট্ঠল দেব বিষ্ণুর নাম। কষ্টিপাথরের মন্দিরের মধ্যে কষ্টি পাথরেরই বিগ্রহ। নাটমন্দির ও স্তম্ভগুলি সবই কষ্টি পাথরের। যদিও বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত ও ভৌগোলিক সংজ্ঞায় দক্ষিণ ভারতেই অবস্থিত, তবু এই মন্দিরটি উত্তর ভারতীয় স্থাপত্য রীতিতেই নির্মিত, মন্দিরে পূজার প্রথাও উত্তর ভারতীয়। যাত্রীরা এখানে গর্ভগৃহে প্রবেশ করে দেবতাকে স্পর্শ করে প্রণাম করতে পারে।

বিট্ঠল দেবের ভক্তদের সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। সে সমস্ত বলতে গেলে তীর্থের কথাই চাপা পড়ে যাবে। তবে একটা কথা বলা দরকার। সে কথা হল যে কোন উৎসবের সময় এই তীর্থে গেলে ভক্তদের অনেক কথাই জানবার সুযোগ পাওয়া যায়। চারি দিক থেকে শোভা যাত্রা করে এই সব ভক্তদের পাল্কি আসে বিট্ঠল দেবের মন্দিরে, উৎসবে সরগরম হয়ে ওঠে এই ছোট শহরটি। আর বছরে একবার নয়, চারবার হয় এই মেলা। পান্ধারপুরে যেতে হলে এই রকমের একটা মেলার সময়েই যেতে হয়। আষাঢ়ের শুক্লা একাদশীতে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার উৎসব। সেই সময়ই এই তীর্থ দর্শনের প্রশস্ত সময়।

সাধুজী এক মুহূর্ত ভেবে বললেন: মহারাষ্ট্রে আর একটি তীর্থস্থান আছে; তার নাম ভীমশঙ্কর। সেখানে শিবের জ্যোতির্লিঙ্গ। পাহাড়ের উপরে এই তীর্থে যেতে হয় বাসে। কিন্তু আমি যেতে পারিনি।

উত্তর ভারতের তীর্থ প্রসঙ্গ শেষ করে সাধুজী তাউজীর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর মুখে কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। তিনি

আরও শোনবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু গুরুজী বাধা দিয়ে বললেন ঃ এক দিনে অনেক কথা বললে সবাই মনে রাখতে পারবে না। আজ থাক। দক্ষিণ ভারতের কথা কাল শোনা যাবে।

বলে সাধুজীকে নিয়ে তিনি উঠে পড়লেন। তাউজী বোধহয় বিষণ্ন হলেন। কিন্তু কোন প্রতিবাদ করলেন না। আমরাও নিঃশব্দে উঠে পড়লাম।

পর দিন সকালে বাগানের কাজ করতে করতে পাধ্যে দুঃখ প্রকাশ করলেন। বললেন ঃ মহারাষ্ট্রের তীর্থের কথা সাধুজী তেমন যত্ন নিয়ে বললেন না।

কাজ করতে করতেই আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কোনও তীর্থের কথা বাদ দিয়েছেন নাকি।

পাধ্যে বললেন ঃ পাণ্ঢারপুরের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কোন ধারণাই হল না। যে তীর্থের টানে অগণিত যাত্রী নিয়ত যাতায়াত করে, তার পরিচয় আরও বিশদ হওয়া উচিত ছিল।

আমি তাঁকে আশ্বাস দেবার জন্য বললাম ঃ সাধুজী বলেছেন তো, সব তীর্থ সম্বন্ধে সব কথা বলতে গেলে তীর্থের কথা কোন দিন শেষ হবে না। এ দেশে তো তীর্থের শেষ নেই!

পাধ্যে ক্ষুব্ধ ভাবে বললেন ঃ ওঙ্কারজী সম্বন্ধে তিনি কোন কথাই বললেন না!

ওঙ্কারজীর নাম আমি শুনি নি। তাই আশ্চর্য হয়ে বললাম ঃ সে তীর্থ কোথায়?

পাধ্যে বললেন ঃ ইন্দোর-খাণ্ডোয়া লাইনে ওঙ্কারেশ্বর রোড স্টেশন, সেখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে একটি অদ্ভুত সুন্দর তীর্থস্থান। লোকে এই তীর্থকে মান্ধাতাও বলে।

আমি নীরব রইলাম। আর খুরপি দিয়ে বাগানের ঘাস তুলতে তুলতে পাধ্যে বলতে লাগলেন ঃ ভারতে শিবের জ্যোতির্লিঙ্গ বারোটি, তার মধ্যে একটি এই মান্ধাতায়। নর্মদার মাঝখানে মাইল দেড়েক লম্বা একটি দ্বীপ। খরস্রোতা নদী এখানে উত্তর দক্ষিণে বইছে। দ্বীপের পূর্ব ও দক্ষিণ প্রান্তে উঁচু পাহাড় আছে, তার রঙ শ্যামল। নদী পাহাড় গাছপালা ও সারি সারি মন্দিরে মান্ধাতা একটি সৌন্দর্যের আকর।

পাধ্যে একটু থামতেই আমি বললাম ঃ সাধুজী বোধহয় এই তীর্থটি দেখেন নি। দেখে থাকলে নিশ্চয়ই কিছু বলতেন।

পাধ্যে বোধহয় তাঁর কল্পনার চোখে মান্ধাতার সৌন্দর্য দেখতে পাচ্ছিলেন, বললেন ঃ তীর্থ দেশের সুন্দরতম স্থানেই হয়, সে সবই দুর্গম পাহাড়ে

কিংবা সমুদ্র তীরে। দেশের মাঝখানে এমন সুন্দর স্থান সত্যিই কম আছে। একবার দেখলে আর ভোলা যায় না।

আমি কোন কথা বললাম না। পাধ্যে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন ঃ ওঙ্কারজীর নাম মান্ধাতা কেন হল, তার একটা কাহিনী শুনেছি। সূর্য বংশের রাজা মান্ধাতা এই দ্বীপে শিবের যজ্ঞ করেছিলেন। দেবতার মন্দিরও তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু একটি মন্দির। পরবর্তী কালে দুটি মন্দির কী ভাবে হল, তারও একটা কিংবদন্তী আছে।

আমি বললাম ঃ কোন অলৌকিক ঘটনা বোধহয়!

পাধ্যে বললেন ঃ না। মান্ধাতা যে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, তা ছিল দ্বীপের দক্ষিণে। গভীর অরণ্যে সে জায়গা ছেয়ে গিয়েছিল, মন্দির আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। পুনার পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও এসেছিলেন এই মন্দিরটি খুঁজে বার করতে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু ফিরে যাবার আগে তিনি একটি মন্দির নির্মাণ করে মমলেশ্বর শিবকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করে যান। এই ঘটনার অনেক পরে সেই প্রাচীন পবিত্র স্থানটিও খুঁজে পাওয়া যায়। তখন আর একটি মন্দির তৈরি হয় সেখানে।

আমি বললাম ঃ এ কতকটা সোমনাথের মতো হল। একই জায়গায় একই দেবতার দুটি মন্দির।

পাধ্যে বললেন ঃ দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তেও পাহাড়ের উপরে আছে গৌরী সোমনাথ মন্দির। তারই সামনে সবুজ পাথরের তৈরি বিরাট নন্দী যাত্রীর নয়নরঞ্জন করে।

একটু থেমে পাধ্যে বললেন ঃ শুধু ওঙ্কারজী নয়, অল্প দূরে নর্মদার উত্তর তীরেও অনেক কিছু দেখবার আছে—বৈষ্ণব ও জৈনদের কয়েকটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। নর্মদা যেখানে দুটি ধারায় বিভক্ত হয়েছেন, সেখানেও একটি বিষ্ণুর মন্দির আছে, বরাহ অবতারের মূর্তি, আর সবুজ পাথরে তৈরি বিষ্ণুর চব্বিশটি মূর্তি। খানিকটা দূরে চামুণ্ডার বিরাট দশভুজা মূর্তি। বিরাট বললে ঠিক বলা হয় না, সাড়ে তিনটে মানুষের সমান উঁচু এই মূর্তি দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়।

এত বড় মূর্তির কথা আমি শুনি নি। কোন তীর্থস্থানে এত বড় মূর্তি আছে বলে আমি জানতাম না।

পাধ্যের কাছে আমি একটি কুসংস্কারের কথাও শুনলাম। কিছু দিন আগে লোকে ওঙ্কারেশ্বরে মৃত্যুকে মুক্তির উপায় বলে মনে করত। তাই তারা মুক্তির জন্য সেখানে গিয়ে নদীতে লাফিয়ে পড়ে প্রাণ বিসর্জন করত। আত্মহত্যার মতো মৃত্যু, কিন্তু লোকে তা মনে করত না। লোকে ভাবত,

ধর্মের জন্যই এ কাজ করছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এখনও কি লোকে এই কাজ করছে!

পাধ্যে বললেন ঃ না। আমরা কেউ দেখি নি। শুনতে পাই যে প্রায় দেড়শো বছর আগেই এই কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। আইন করে বন্ধ হয়েছে, না এমনিতেই তা জানি না।

ওঙ্কারেশ্বরের কথা শেষ হয়ে গেলে পাধ্যে নিঃশব্দে কাজ করতে লাগলেন। আমিও চুপ করে রইলাম। যেদিন আমি এই আশ্রমে এসে উপস্থিত হয়েছিলাম, সেদিন এই বাগান ছিল না। আমরা দুজনে মিলেই কাজ শুরু করেছি, আর ফলের প্রত্যাশায় আছি। চেনুস্বুরা সামনে ফুলের বাগান করছে।

এই আশ্রমে আসবার কথা আমার মনে পড়ল। আমরা দুই বন্ধুতে এসেছিলাম কেদার বদরী দর্শনে। সে আশা পূর্ণ হল না। গুরুজীকে দেখে আমার কী মনে হল জানি নে, এই আশ্রমে এসে জুটে গেলাম। একাই এলাম, বন্ধু আমার এল না। পাধ্যে আমার আশ্রমের বন্ধু, এঁরই কাছে আমরা সংস্কৃত পড়ি। সংস্কৃত না জানার জন্য মাঝে মাঝে দুঃখ হয়, তাইতেই সংস্কৃত পড়ি। সংস্কৃত না জানলে ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির কথা সম্পূর্ণ জানা যায় না।

এক সময় পাধ্যে বললেন ঃ এক এক সময় ইচ্ছা করে, একটা ঝোলা কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

তারপরেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন ঃ যেদিন লোকে তা পারত, সে দিন এ দেশ থেকে গত হয়েছে।

আমি তাঁর কথার মর্ম ঠিক বুঝতে পারলাম না। বললাম ঃ কী রকম ?

পাধ্যে বললেন ঃ ছেলে বেলায় আমরা দেখেছি যে বাড়িতে কোন সাধু সন্ন্যাসী এলে তাঁদের আদর আপ্যায়ন করা হত। শুনেছি যে আগে তীর্থযাত্রীদেরও এই রকমের সমাদর ছিল। পায়ে হেঁটে তাঁরা তীর্থ যাত্রায় বেরোতেন। গ্রামে যে গৃহে তাঁরা অতিথি হতেন, সে গৃহস্থ নিজেকে ভাগ্যবান মনে করত। গ্রামবাসী একত্র হত তীর্থের কথা শুনতে, তীর্থ যাত্রীর পায়ের ধুলো নিত পরম ভক্তি ভরে। তাঁর পায়ে যেন তীর্থ রেণু লেগে আছে।

এ কথা যে মিথ্যা নয়, আমি তা বিশ্বাস করি। বাঙলার চৈতন্য তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে সমস্ত ভারত ভ্রমণ করেছেন। সেকালের মানুষ অতিথি সৎকারকে পুণ্য কাজ না ভাবলে তাঁর প্রব্রজ্যা অসম্পূর্ণ থাকত। কিন্তু আমি কোন কথা বললাম না। পাধ্যে আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন ঃ এ কালের সভ্যতায় সে কালটা আমরা হারিয়ে ফেলেছি।

তাতে লাভ হয়েছে, না লোকসান, তা কে বলতে পারে!



সন্ধ্যাবেলায় উপাসনার মন্দিরে এসে সাধুজী বললেনঃ আজ আমাদের দক্ষিণ ভারতের কথা বলতে হবে। রাজ্যের বিচারে সীমাচলম দক্ষিণ ভারতে হলেও উড়িষ্যার মন্দিরের সঙ্গে বেশি তফাৎ নেই। সেখানে দক্ষিণ ভারতীয় রীতির কোন গোপুরম নেই। উড়িষ্যারই কোন রাজা এই মন্দিরটিও নির্মাণ করেছেন বলে শুনেছি।

কলকাতা থেকে মাদ্রাজের পথে প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় ওয়ালটেয়ার একটি বড় স্টেশন। সীমাচলম নামেও একটি ছোট স্টেশন আছে, কিন্তু যাত্রীরা ওয়ালটেয়ার থেকেই বাসে যাতায়াত করেন। সীমাচলমের মন্দিরটি পাহাড়ের উপরে, আর সেই পাহাড় স্টেশন থেকে মাইল আড়াই দূরে। ওয়ালটেয়ার থেকে এর দূরত্ব হবে মাইল দশেক। কিন্তু শহর থেকেই বাস পাওয়া যায়। সে বাস পাহাড়ের নিচে অবধি যায়। তারপরে দেবস্থানমের বাসে চেপে পাহাড়ে উঠতে হয়। পায়ে হেঁটেও ওঠা যায়। তার জন্য বাঁধানো সিঁড়ি আছে।

সীমাচলম নামটা ঠিক নয়, পাহাড়ের নাম সিংহাচলম বা সিংহ গিরি। নৃসিংহদেবের মন্দিরের নামেই সিংহগিরি নাম হয়েছে। পাহাড়ের নিচে একটি গ্রামের মতো শহর। দোকানপাট পোস্ট অফিস সবই আছে। ফলমূল মিষ্টান্ন ও পূজার উপকরণ নিচে সংগ্রহ করে উপরে উঠতে হয়। উপরেও অবশ্য দোকানপাট আছে। সেখানেও নানা রকমের জিনিষ পাওয়া যায়।

বাস এসে মন্দিরের কাছে দাঁড়ায়। কিন্তু যাত্রীরা প্রথমে গঙ্গাধারা নামের একটি বাঁধানো ঝর্নায় যায়। সে জায়গাও দূরে নয়। পুরুষদের অনেকে এখানে মাথা মুড়িয়ে নেয়। তারপর স্নান করে আসে মন্দিরে।

দক্ষিণ ভারতের গোপুরম বলতে চোখের সামনে যে দৃশ্য ভেসে ওঠে, এখানে সে রকমের গোপুরম নয়। সিংহহীন সিংহ দ্বার অপ্রশস্ত তারই নিচে দিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে হয়। একটি চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণের মধ্যে নৃসিংহ দেবের মন্দির। সামনে সোনার তাল গাছ, পিছনে নাটমন্দির।

চারিদিকের প্রাচীরের গায়ে সুদৃশ্য বারান্দা। সর্বত্র গ্রানাইট পাথর। মন্দিরের চত্বরও এই পাথরে বাঁধানো।

তিন দিকে উঁচু পাহাড়, তারই কোলে মন্দির। অপরূপ শিল্প মণ্ডিত শিখর, সারা গায়ে কারুকার্য—সমস্তই পৌরাণিক চিত্র। ব্রাহ্মণেরা দেবতার সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন। কাছে যাবার উপায় নেই, দূর থেকেই দর্শনের রীতি। যাত্রীদের পূজা ব্রাহ্মণেরাই উৎসর্গ করে ফিরিয়ে দেন। দেবতার মূর্তি কী রকম তা বোঝা যায় না। অক্ষয় তৃতীয়া দেবতার প্রতিষ্ঠার দিন। সেদিন তাঁর নিজস্ব রূপ দেখতে পাওয়া যায়। লক্ষ লক্ষ যাত্রী সেদিন দেবতাকে দেখতে আসে।

তাউজী জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আপনি কি কিছুই দেখতে পান নি ?

সাধুজী বললেন ঃ দেখেছি একখানা ছবিতে। দেবতার নাম শ্রীবরাহ লক্ষ্মী নরসিংহ স্বামী। অক্ষয় তৃতীয়ায় দেবতার গায়ের ঢাকা খুলে চন্দনের প্রলেপ মুছে ফেলা হয়। সিংহাসনের উপরে সেদিন তাঁর নিরাবরণ রূপ—বক্রভাবে বিষ্ণু দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর বরাহ অবতার, চতুর্ভুজ নন। মানুষের মতো দুটি হাত, কিন্তু মুখ বরাহের। লক্ষ্মী নেই তাঁর পাশে, বিষ্ণুর নৃসিংহ অবতারও নয়। ছবিতে আমি দেবতার বরাহ মূর্তি দেখেছিলাম। লোকে বলে যে প্রহ্লাদ এখানে তাঁর রক্ষাকর্তার এই রূপই দেখেছিলেন, তাই এখানে বরাহ রূপের পূজা।

সাধুজী সংক্ষেপে সেই গল্প বললেন ঃ বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠপুরীর দ্বারী জয় বিজয়ের পৃথিবীতে জন্ম হয়েছিল সনকাদি ঋষির শাপে। মিত্র ভাবে শত জন্ম ও শত্রুভাবে তিন জন্ম হবে জেনে তারা শত্রু ভাবেই জন্মাতে চেয়েছিল। প্রথম জন্মে তারা কশ্যপ ও দিতির পুত্র রূপে দৈত্য হয়ে জন্মাল হিরণাক্ষ্য ও হিরণ্যকশিপু নামে। বিষ্ণু হিরণাক্ষ্যকে বধ করলেন বরাহ রূপে, আর নৃসিংহ রূপে বধ করলেন হিরণ্যকশিপুকে। প্রহ্লাদ ছিলেন দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর কনিষ্ঠ পুত্র। বিষ্ণুভক্ত। রাজা তাই নানা ভাবে প্রহ্লাদকে বিনষ্ট করবার চেষ্টা করেছিলেন, আর হরিকে স্মরণ করে বারেবারেই তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন। নৃসিংহ অবতারের পূর্বেই প্রহ্লাদ বিষ্ণুর যে রূপ দেখেছিলেন, সীমাচলমে তিনি সেই মূর্তিরই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্ফাটিক স্তম্ভ থেকে নির্গত হয়ে যে মূর্তিতে বিষ্ণু হিরণ্যকশিপুকে বধ করেছিলেন প্রহ্লাদের সামনে, সেই ভয়ঙ্কর নৃসিংহ মূর্তির পূজা হয় আরও দক্ষিণে অহোবলমে।

তাউজী বললেন ঃ প্রহ্লাদের গল্প কি বলবেন না ?

সাধুজী বললেন ঃ ভক্ত প্রহ্লাদের গল্প তো সবার জানা !

হোক জানা, আর একবার শুনব আপনার মুখে।

সাধুজী সহাস্যে বললেন ঃ এ যুগেই আমরা দেবতা অসুর ও মানুষে

প্রভেদ করেছি। তা না হলে সত্য যুগে এদের মধ্যে কোন প্রভেদ নিশ্চয়ই ছিল না। এ'রা সবাই ছিলেন ব্রহ্মার পৌত্র কশ্যপ মুনির সন্তান। এক মায়ের ছেলে ইন্দ্রাদি দেবতা, অন্য মায়ের ছেলে হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি দৈত্যরা। এ'রা যেমন বলবান ছিলেন, ধার্মিকও ছিলেন তেমনি। কিন্তু হিরণ্যকশিপু দেবদ্বেষী হয়েছিলেন হিরণ্যাক্ষের মৃত্যুর পর। হিরণ্যাক্ষর এক দিন যুদ্ধ করবার শখ হয়েছিল, ভাবল যে দেবতাদের সঙ্গেই যুদ্ধ করে আসবে। কিন্তু স্বর্গে গিয়ে দেখল যে দেবতারা কেউ কোথাও নেই, ভয় পেয়ে সবাই পালিয়ে গেছেন। তাঁরা পাতালে গেছেন ভেবে হিরণ্যাক্ষ পাতালে গিয়ে উপস্থিত। সভয়ে বরুণ বললেন, আমার সঙ্গে যুদ্ধ কেন, বিষ্ণু পাতালে এসেছেন বরাহের রূপ ধরে পৃথিবীকে উদ্ধার করতে, তুমি তাঁর সঙ্গেই যুদ্ধ কর। বিষ্ণুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে হিরণ্যাক্ষ প্রাণ হারাল, আর হিরণ্যকশিপু এই সংবাদ পেয়ে দেবতাদের উপরেই চটে গেলেন।

এ দিকে প্রহ্লাদ যে লুকিয়ে লুকিয়ে বিষ্ণুর আরাধনা করত, সে খবর পেয়ে হিরণ্যকশিপু বললেন, খবরদার, আমার ছেলে হয়ে তুমি আমার শত্রুর পূজো করবে না। কিন্তু প্রহ্লাদ সে কথা শুনলেন না, যেমন আগে তেমনি পরেও বিষ্ণুর পূজো করতে লাগলেন। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু বললেন, এই ধৃষ্টতা আমি সইব না, প্রহ্লাদকে সমুদ্রের জলে ফেলে দাও আর একটা পাহাড় দিয়ে চাপা দাও তাকে। যেমন হুকুম, তেমনি কাজ। প্রহ্লাদকে সমুদ্রে ফেলে এই সীমাচলম পাহাড়টা তাঁর উপরে চাপা দেওয়া হল। কিন্তু বিষ্ণু হলেন ভক্ত বৎসল, তিনি তখনই সেই পাহাড়ের একটা ধার তুলে ধরলেন। প্রহ্লাদ রক্ষা পেয়ে গেলেন।

কিন্তু গুরুজীর কাছে আমরা পুরাণের গল্প শুনেছি। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে বধ করবার জন্য সব রকম চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বিষ্ণু তাঁকে প্রতিবারেই রক্ষা করেছিলেন। শেষে ব্যর্থ হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, কে তোমাকে বার বার রক্ষা করে? প্রহ্লাদ বলেছিলেন, হরি। হিরণ্যকশিপু প্রশ্ন করেছিলেন, কোথায় তোমার হরি? প্রহ্লাদ বলেছিলেন, তিনি সর্বত্র আছেন। এই স্ফটিক স্তম্ভের মধ্যে আছে? প্রহ্লাদ কোন চিন্তা না করেই বললেন, আছেন। তবে দেখি তোমার হরিকে। বলে হিরণ্যকশিপু সেই স্ফটিক স্তম্ভ পদাঘাতে ভেঙে ফেললেন। দু চোখ বন্ধ করে প্রহ্লাদ তখন বিষ্ণুকে স্মরণ করেছিলেন, হে নারায়ণ, তুমি আমায় রক্ষা কর। ভক্তের মুখ রক্ষা করলেন নারায়ণ, তিনি সেই স্ফটিক স্তম্ভ থেকে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু তাঁর শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী প্রসন্ন মূর্তিতে নয়, অর্ধেক নর ও অর্ধেক সিংহের মতো ভয়ংকর মূর্তিতে। নৃসিংহ অবতার। ব্রহ্মার কাছে

হিরণ্যকশিপু বর পেয়েছিলেন যে কোন দেবতা মানুষ বা পশুর হাতে তাঁর মৃত্যু হবে না, দিনে বা রাত্রিতে নয়, জলে স্থলে আকাশে নয়। বিষ্ণু তাই সায়াহ্নের অন্ধকারে নৃসিংহ রূপে অবতীর্ণ হয়ে হিরণ্যকশিপুকে নিজের কোলের উপরে রেখে নখ দিয়ে তাঁকে বধ করলেন।

সাধুজী বললেন ঃ অক্ষয় তৃতীয়ায় কেন দেবতার নিজস্ব রূপের দর্শন পাওয়া যায় সে কথাও শুনেছিলাম। কলির আগমনে অধর্মে দেশ ভরে গিয়েছিল। তখন প্রহ্লাদ নেই। রোগে শোকে শূন্য হয়ে গিয়েছিল প্রহ্লাদের সিংহগিরির পুরী, অরণ্যে আবৃত হয়ে গিয়েছিল সব কিছু এবং বল্মীক স্তূপে ঢেকে গিয়েছিল দেবতার মন্দির। নূতন সত্য যুগে চন্দ্রবংশের রাজা পুরূরবা আকাশ পথে বেড়াতে এলেন এইখানে তাঁর সঙ্গে স্বর্গের অপ্সরা উর্বশী। এই স্থান তাঁদের ভাল লাগল। তাঁরাই আবার দেবতাকে নূতন করে আবিষ্কার করলেন। উর্বশীই পুরূরবাকে বলেছিলেন যে পুরাকালে এখানে দেবতার মন্দির ছিল, তিনি নাচতে আসতেন। এ কথা জানবার পরেই পুরূরবা ধ্যানে বসে মন্দিরের কথা জানলেন, নূতন করে প্রতিষ্ঠা করলেন দেবতাকে। পঞ্চতীর্থের জলে তাঁর অভিষেক হল, চন্দনে অনুলেপিত হল তাঁর দেহ। সেই দিনের স্মরণে আজও দেবতার চন্দন যাত্রা হয় প্রতি বছর অক্ষয় তৃতীয়ায়। ভক্তরা সেদিন দলে দলে আসেন এই তীর্থে। নৃসিংহ দেবের নিজস্ব রূপ দেখলে মোক্ষ লাভ নাকি অনিবার্য।

সাধুজী কিছুক্ষণ নীরব রইলেন, তারপরে বললেন ঃ উত্তর ভারতের মন্দিরের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, তাঁরা উড়িষ্যায় এসে বিস্মিত হন। মন্দিরের দেবতার চেয়ে মন্দিরের শিল্পকর্মই বোধ হয় তাঁদের বেশি অভিভূত করে। সীমাচলমের মন্দিরের সম্বন্ধেও এই কথা বলা চলে। দেবদর্শনের পর সরাসরি ফিরে আসা যায় না। চারি দিকে ঘুরে মন্দিরের সৌন্দর্য সবাইকে দেখতেই হয়।

তাউজী বললেন ঃ কিছু বলুন না আমাদের।

সাধুজী বললেন ঃ প্রাঙ্গণের এক কোনে একটি পাথরের রথ আছে, তার দুটি ঘোড়া। রথে চাপতে হলে সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠতে হয়। মন্দির স্থাপত্যেরও বৈশিষ্ট্য আছে। মূল মন্দিরকে এরা মুখ্য মণ্ডপ বলে, তার সামনে ষোল স্তম্ভের নাট মণ্ডপ। মন্দির গাত্রে নানা রকমের কারুকার্য আছে, ফুল লতাপাতা মূর্তি ও বিষ্ণু পুরাণের নানা দৃশ্য। মুসলমান আক্রমণে নাকি অনেক কিছু ধ্বংস হয়েছে, আছেও অনেক কিছু। প্রবাদ আছে যে দেবতা এক ঝাঁক মৌমাছি সৃষ্টি করেছিলেন মন্দির রক্ষার জন্য। সেই মৌমাছির দল মুসলমানদের তাড়া করে অনেক দূরে তাড়িয়ে

দিয়ে এসেছিল।

এই প্রাঙ্গণের ঠিক বাহিরেই উত্তর দিকে অবস্থিত কল্যাণ মণ্ডপ। এক এক দিকে তিনটি করে ছ সারির স্তম্ভের উপরে এই মণ্ডপ, প্রতিটি স্তম্ভই কারুকার্য মণ্ডিত। চৈত্র মাসের শুক্ল একাদশীতে এখানে দেবতার বিবাহ উৎসব করা হয়। বিষ্ণুর মৎস্য অবতার বরুণ ধন্বন্তরি ও বিষ্ণুর নৃসিংহ অবতারের অনেক মূর্তি আছে।

তাউজী বললেন ঃ এই মন্দিরটি কত কালের পুরনো তা বলেন নি।

সাধুজী বললেন ঃ শুনেছিলাম যে এই মন্দির ও প্রাকার নির্মাণ করেছিলেন কলিঙ্গাধিপতি গঙ্গাবংশের রাজা প্রথম নরসিংহ প্রায় সাত শো বছর আগে। আর এই পাহাড়ে উঠবার সিঁড়ি তৈরি করে দিয়েছিলেন। ইন্দোরের রাণী অহল্যা বাঈ। সেও প্রায় দুশো বছর হতে চলল।

সাধুজী একটু থেমে বললেন ঃ ভারতের সকল তীর্থে এই রাণীর কীর্তি দেখে আশ্চর্য হতে হয়। নিজের রাজ্যে যেমন তিনি অগণিত মন্দির ধর্মশালা ও রাজপথ নির্মাণ করেছিলেন, তেমনি ভারতের সর্বত্র তাঁর সমান দান। তীর্থের উন্নতির জন্যে ও যাত্রীদের সুবিধার জন্যে তিনি অনেক কিছু করে দিয়েছেন। সীমাচলমেও এতদিন এই পাহাড়ে উঠবার জন্য একমাত্র পথ ছিল তাঁর তৈরি হাজার সিঁড়ি। বাসের পথ সম্প্রতি নির্মিত হয়েছে।

বাঙলার রাণী ভবানীর কথা আমার মনে পড়ল। কাশীতে তাঁর কীর্তি আমরা দেখেছি। কিন্তু সাধুজী বললেন ঃ অহল্যাবাঈএর মতো আর কয়েকজন মানুষ এ দেশে জন্মালে ভারতের তীর্থস্থানগুলির অবস্থা অন্য রকম হত। শৌখিন মানুষ সিমলায় না গিয়ে যেত কেদারনাথে।

সাধুজীর বুক থেকে যে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠল, আমার দৃষ্টি তা এড়াল না। আমি নিঃশব্দে তাঁর কথা মেনে নিলাম।



সাধুজী বললেন ঃ ভারতের আর কোথায় আছে জানি নে, অন্ধ্রে বিষ্ণুর কূর্ম অবতারের মন্দির আছে শ্রীকূর্মমে। ওয়ালটেয়ারে পৌঁছবার কিছু

আগেই শ্রীকাকুলম রোড স্টেশন। সেখানে নামলে দুটো মন্দির দেখা যায়—একটা শ্রীকূর্মমের কূর্ম অবতারের মন্দির, আর একটা আরসাভল্লীর সূর্য মন্দির।

সূর্যের মন্দির শুনে আমি আশ্চর্য হলাম। এ দেশে নাকি সূর্যের মন্দির ছিল তিনটি—একটি কাশ্মীরে, একটি আমেদাবাদের নিকট মধেরায় ও তৃতীয়টি উড়িষ্যার কোনারকে। কিন্তু এ সবই এখন ভগ্ন, পূজা আর হয় না। সূর্যের পূজা এ দেশ থেকে এক রকম উঠেই গেছে। অথচ ব্রাহ্মণের গায়ত্রী মন্ত্রে আছে সূর্যের স্তুতি, আর নবগ্রহের পূজায় আমরা সূর্যেরও বন্দনা করি। বিহার ও উত্তর প্রদেশবাসী যে ছট পূজা করেন তা সূর্যেরই আরাধনা।

সাধুজী বললেন ঃ শ্রীকাকুলম রোড স্টেশন থেকে বাসে শ্রীকাকুলম যেতে হয়, আরসাভল্লী প্রায় একই জায়গা। শ্রীকূর্মম সেখান থেকে বারো মাইল দূরে। বাসেই যাতায়াত করতে হয়। আরসাভল্লীর মন্দিরে সূর্যের মূর্তিটি সুন্দর। কালো কষ্টি পাথরের দণ্ডায়মান মূর্তি, তাঁর দু হাতে দুটি পদ্ম, মাথার উপরে আদিশেষের ফণা ছত্রের মতো বিস্তৃত। অন্য দিকে তাঁর তিন পত্নী—ঊষা পদ্মিনী ও ছায়া।

আমরা সূর্যের পত্নীদের নাম শুনেছি সংজ্ঞা ও ছায়া। তাউজী সে কথা বলতেই সাধুজী বললেন ঃ সেখানে তো এই তিনটি নাম শোনা যায়। সূর্য ঊষাকে অনুসরণ করেন, আর পদ্মিনী প্রস্ফুটিত হন সূর্যালোকে, আর ছায়া তো সূর্যেরই সঙ্গী। এই সব কারণেই বোধহয় এই তিনজনকে সূর্যের স্ত্রী বলে কল্পনা করা হয়।

এই ব্যাখ্যা আমার ভাল লাগল। মনে হল যে সংজ্ঞাকেও এই ভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। সূর্যই মানুষের জ্ঞান বা চেতনার উৎস। সংজ্ঞাকে তাই সূর্যের স্ত্রী রূপে কল্পনা করা হয়েছে।

সাধুজী বললেন ঃ সূর্যের দুই দ্বারপাল হলেন দণ্ড ও পিঙ্গল। আর চামর হাতে দাঁড়িয়ে আছেন সনক ও সনন্দ ঋষি।

তাউজী বললেন ঃ দণ্ড ও পিঙ্গলের নাম তো শুনি নি!

সাধুজী বললেন ঃ ভবিষ্য পুরাণে নাকি তাঁদের গল্প আছে। মন্দিরের ব্রাহ্মণদের কাছে এই গল্প শোনা যায়। অসুররা যখন প্রবল হয়ে ওঠে, তখন সূর্য তাঁর প্রচণ্ড তেজে তাদের দগ্ধ করতে আরম্ভ করেন। অসুররা তখন সূর্যকে আক্রমণ করে, আর নিগৃহীত দেবতারা এগিয়ে আসেন সূর্যের সাহায্যে। অগ্নি দাঁড়ালেন সূর্যের ডান দিকে, আর বামে দাঁড়ালেন দেব সেনাপতি স্কন্দ। স্কন্দ হলেন দণ্ডনায়ক, দুষ্টকে দমন করেন তিনি। আর পিঙ্গলবর্ণ অগ্নিই পিঙ্গল নামে পরিচিত। আজও তাঁরা সূর্যের দু ধারে দণ্ড

ও পিঙ্গল নামে প্রতিষ্ঠিত। এই পুরাণের মতে আরও দুজন দেবতাকে সূর্যের দু ধারে থাকা উচিত। তাঁরা হলেন অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সূর্যের পুত্র তাঁরা, স্বর্গের বৈদ্য। সূর্যের মন্দিরে চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহের প্রতিষ্ঠারও নিয়ম আছে।

অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের কল্পনাও আমার কাছে যুক্তি সঙ্গত বলে মনে হল। সূর্যের আলোয় আছে রোগ মুক্তির আশ্বাস। এই জন্যেই বোধহয় স্বর্গের দুই বৈদ্য সূর্যের পুত্র বলে স্বীকৃত।

তাউজী বললেন: মন্দিরের কথা কিছু বলবেন না?

সাধুজী বললেন: দক্ষিণ ভারতে মন্দিরের চেয়ে গোপুরমই যাত্রীর দৃষ্টি বেশি আকর্ষণ করে। কিন্তু আরসাভল্লীর মন্দিরের গোপুর একটি দোতলা বাড়ির মতন। মাঝখান দিয়ে ভিতরে যাবার পথ, আর ছাদের উপরে সামান্য কিছু কারুকার্য। কতকটা আধুনিক আকার এই গোপুরের, কিন্তু তাই বলে মন্দিরটি আধুনিক নয়। স্থানীয় লোকেরা বলে যে দেবরাজ ইন্দ্র এই মন্দির নির্মাণ করে সূর্যের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্থলপুরাণে এই সম্বন্ধে একটি সুন্দর কাহিনী আছে।—

দেবরাজ অসময়ে এসেছিলেন কোটীশ্বরের মন্দিরে। জোর করে মন্দিরে প্রবেশের চেষ্টা করতেই দ্বাররক্ষী নন্দী তাঁকে এক লাথি মারেন। অজ্ঞান হয়ে দেবরাজ ছিটকে পড়েন মাইল দুয়েক দূরে। অজ্ঞান অবস্থাতেই তিনি সূর্যকে দেখতে পান নিজের অন্তরাত্মায়। সূর্য তাঁকে বলেন যে এক মন্দির নির্মাণ করে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করলেই সব যন্ত্রণার অবসান হবে। জ্ঞান হবার পর ইন্দ্র তাই করলেন। এই আরসাভল্লীতেই ইন্দ্র ছিটকে পড়েছিলেন এবং এখানেই তিনি সূর্যের প্রতিষ্ঠা করে নিজের যন্ত্রণা মুক্ত হন।

বর্তমান মন্দিরের বয়স দুশো বছরের কম। কিন্তু দেবতা বড় জাগ্রত। দেশ বিদেশ থেকে বহু যাত্রী আসে নানা রকমের প্রার্থনা নিয়ে। কুষ্ঠ রোগী আসে, আর আসে বন্ধ্যা নারী। একটা গল্প শুনেছিলাম সেখানে গোদাবরী জেলার একটি ছেলে, বছর কুড়ি তার বয়েস। সারা গায়ে কুষ্ঠ হয়েছিল বলে কাশীতে মরতে গিয়েছিল। সেখানে এক সাধু তাকে আরসাভল্লীতে চল্লিশ দিন ধর্মাচরণ করতে বলেন। সেই ছেলেটি এখানে এসে পুকুরে স্নান করে রোজ একশো আটবার মন্দির প্রদক্ষিণ করত। ত্রিশ দিন পরে সে ভাল হতে আরম্ভ করে, আর চল্লিশ দিনে সম্পূর্ণ সেরে যায়। ছেলেটি নাকি এখন বিয়ে করে সংসারী হয়েছে। আর প্রতি বছর বৈশাখ মাসে সপরিবারে এসে সূর্যের পূজা করে যায়।

কৃষ্ণের পুত্র শাম্বের কথা আমার মনে পড়ল। পিতার শাপে তাঁর কুষ্ঠ হয়েছিল। দীর্ঘ দিন সূর্যের পূজা করে তিনিও নিরাময় হয়েছিলেন।

কিন্তু সাধুজীর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। সহসা তাঁকে বড় অন্যমনস্ক দেখাল। গভীর চিন্তায় তিনি যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন। আস্তে আস্তে বললেন: সূর্যকে আমরা সূর্য নারায়ণ বলি। কিন্তু কেন বলি? নারায়ণ তো বিষ্ণু! দুজনের মূর্তিতেও আশ্চর্য মিল আছে। প্রথমে আমরা এক হাতের পদ্ম কেড়ে নিয়ে দিয়েছি পদ্মকলির মতো শঙ্খ, তারপরে দু হাতে দিয়েছি গদা ও চক্র। সূর্যকেই যেন নারায়ণে রূপান্তরিত করেছি। সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্তী বিষ্ণু। আমাদের ত্রিমূর্তিও তো সূর্য। ঋগ্বেদের মতে সকালের সূর্য হলেন ব্রহ্মা, মধ্যাহ্নের সূর্য শিব, আর বিষ্ণু হলেন সায়াহ্নের সূর্য।

আমার মনে হল যে এর চেয়ে বড় উপলব্ধির কথা আর হতে পারে না। সকালের সূর্যের রূপ সৃষ্টি কর্তার, মধ্যাহ্নের রুদ্র রূপ ধ্বংসের, আর সায়াহ্নে তাঁর জগৎপালনের শান্ত রূপ। সূর্যই কি আমাদের ঈশ্বর!



সাধুজী থামতেই তাউজী বললেন: আপনি কূর্ম অবতারের মন্দিরের কথা বলবেন বলেছিলেন।

সাধুজী বললেন: হ্যাঁ, সে মন্দির আরসাভল্লী থেকে বারো মাইল দূরে শ্রীকূর্মমে।

দেবতার কথায় আমরা কূর্ম অবতারের কথা শুনেছি। সমুদ্র মন্থনের সময় বিষ্ণু কূর্ম রূপ ধারণ করেছিলেন। সমুদ্রমন্থনের প্রয়োজন কেন হয়েছিল, সে কথাও আমার মনে পড়ল। দুর্বাসা মুনি শাপ দিয়েছিলেন দেবরাজ ইন্দ্রকে। সন্তানক বনে বেড়াবার সময় বিদ্যাধর বধূরা তাঁকে একখানি পারিজাতের মালা দিয়েছিলেন। ইন্দ্রকে দেখতে পেয়ে তিনি সেই মালা তাঁকেই উপহার দেন। কিন্তু ইন্দ্র মালাটি নিজের গলায় না পরে তা রাখলেন ঐরাবতের কুম্ভের উপরে। ঐরাবত সেই সুগন্ধি মালা শুঁড় দিয়ে মাটিতে নামাল। মালার দুর্দশা দেখেই দুর্বাসা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তোমার কিসের অহংকার বাসব! আজ থেকে তুমি শ্রীভ্রষ্ট হবে, শ্রীহীন হবে তোমার স্বর্গ। দুর্বাসার এই শাপে লক্ষ্মী স্বর্গ পরিত্যাগ করে পাতালে

নেমে গেলেন। দেবতারা শ্রীহীন হলেন, যাগযজ্ঞ লোপ পেল, তাঁরা পরাজিত হলেন পরাক্রান্ত অসুরদের কাছে। এই বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য বিষ্ণু সমুদ্র মন্থন করে লক্ষ্মীকে উদ্ধারের পরামর্শ দিলেন। তাতে অমৃত উঠবে, অমৃত পান করে অমর হবেন দেবতারা। কিন্তু এ তো দেবতাদের একার কাজ নয়, অসুরদেরও সাহায্যের দরকার। দেবরাজ ইন্দ্র গেলেন দৈত্যরাজ বলির কাছে, সমুদ্র মন্থনের প্রয়োজনীয়তা তাঁকে ভাল করে বোঝালেন। দু দলে সন্ধি হল, দেবাসুর মিলিত হয়ে সমুদ্র মন্থন করবেন। মন্দার পর্বতকে এনে মন্থন দণ্ড করা হল সমুদ্র মন্থনের জন্য। আর বাসুকি হলেন রজ্জু। দেবতা ও অসুর দু দিকে ধরে মন্থন শুরু করলেন। কিন্তু মন্দার পর্বত যখন নিজের ভারে সমুদ্রের গর্ভে ডুবে যেতে লাগল, বিষ্ণু তখন কূর্ম রূপ ধরে মন্দারকে ধারণ করলেন। নির্বিঘ্নে হল সমুদ্র মন্থন।

সাধুজী বললেনঃ বিষ্ণু এখানে শ্রীকূর্মনাথ নামে পূজিত হচ্ছেন। কূর্ম অবতারের এই মন্দির প্রতিষ্ঠারও একটা কাহিনী আছে।—

রাজা সুত ছিলেন শ্বেতবর্ণের রাজা। তাঁর রাণী ছিলেন ধর্মপ্রাণ, ব্রত পূজা নিয়েই তিনি দিন কাটাতেন। এক শুক্ল একাদশীর দিনে রাজা এসেছিলেন রাণীর কাছে। রাণীর সেদিন ব্রত পালনের দিন। তাই রাজাকে দেখে তিনি চোখ বুজলেন, মনে মনে হরির কাছে প্রার্থনা করলেন যেন তাঁর ব্রত ভঙ্গ না হয়। অন্তর্যামী হরি তাঁর কথা শুনলেন। দুজনের মাঝখানে বয়ে গেল গঙ্গাতীর্থ। রাণী এপারে রইলেন, আর রাজা রইলেন ওপারে।

এক দিন দেবর্ষি নারদ এলেন রাজার কাছে, দেখলেন যে রাজা বংশধরা নদীর ধারেই কালাতিপাত করছেন। তিনি রাজাকে বললেন যে ঠিক মতো তপস্যা করলেই হরির দেখা পাওয়া যাবে। এই কথা শুনে রাজা নারদের সঙ্গে চললেন সমুদ্র সঙ্গমে। সেইখানে দেবর্ষির কাছে সূর্য মন্ত্র পেয়ে কঠিন তপস্যায় রত হলেন। যথা সময়ে হরি দেখা দিলেন কূর্ম অবতারের রূপে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হাতে। তারপরে রাজার দেশের দিকে অগ্রসর হলেন। এক জায়গায় একটি পবিত্র স্থান দেখে বিষ্ণু তাঁর চক্র দিয়ে ক্ষীর সমুদ্র নামে একটি সরোবর খনন করে নিজে অধিষ্ঠান করলেন সেইখানে। এই স্থানই শ্রীকূর্মম নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে।

এখানকার স্থল পুরাণেও অনেক অলৌকিক কাহিনী আছে।

তারপর সাধুজী বললেনঃ স্বর্গের অপ্সরা তিলোত্তমা আসতেন শ্রীকূর্ম-নাথের সামনে নাচতে। এক দিন আনন্দপুরীর রাজকুমার এক অপূর্ব দৃশ্য দেখতে পেলেন। তিনি মৃগয়ায় এসে স্বর্ণমুখ হরিণের পিছনে ছুটতে ছুটতে

এই অঞ্চলে এসে পড়েছিলেন। তিলোত্তমাকে দেখে তিনি মৃগের কথা ভুলে গিয়ে মুগ্ধ হলেন অপ্সরার রূপে। কিন্তু নিজের মনের কথা বলতে গিয়ে বিপদ হল। তিলোত্তমা সাপ দিলেন রাজকুমারকে। দেবতার দাসী তিনি, তাঁর উপরে মানুষের লোভ কেন হবে! শাপগ্রস্ত রাজকুমার আর নিজের রাজ্যে ফিরলেন না, রয়ে গেলেন সেই খানেই। দেবতার মন্দিরে দীর্ঘ দিন তপস্যা করে শাপমুক্ত হলেন।

সাধুজী বললেন: যাঁরা ওয়ালটেয়ারে কয়েক দিন থাকেন তাঁদের এই দুটি তীর্থ দেখা খুবই উচিত—আরসাভল্লী আর শ্রীকূর্মম। এক দিনেই দুটি তীর্থ দেখা সম্ভব। ওয়ালটেয়ারে যাবার পথে এক ট্রেন থেকে নেমে এই তীর্থ দুটি দেখে আর এক ট্রেন ধরে এগিয়ে যাওয়া যায়।



সাধুজী এর পরে অন্ধ্রের আরও অনেক তীর্থের কথা আমাদের শোনালেন। সে সব তীর্থের নামও আমরা জানতাম না। কিন্তু সাধুজীর কাছে গল্প শুনে মনে হল যে সে সবের কিছুই উপেক্ষা করবার মতো নয়।

সাধুজী বললেন: মন্দির নেই এমন স্থান দক্ষিণ ভারতে কম আছে। ওয়ালটেয়ার থেকে মাদ্রাজের পথে প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় গোদাবরী নদীর তীরে রাজমন্দ্রী। সেখানে আছে মার্কণ্ডেয় ও কোটিলিঙ্গেশ্বর মন্দির। কিন্তু তার চেয়ে বিখ্যাত মন্দির আছে কোটিপল্লী, দ্রাক্ষারাম ও ভদ্রাচলম। গোদাবরী যেখানে সমুদ্রে মিলেছে সেইখানে কোটিপল্লী। কেউ রাজমন্দ্রী থেকে যায়, কেউ যায় কাকিনাড়া থেকে। শিবরাত্রির দিনই সবচেয়ে বেশি যাত্রী সেখানে যায়।

তাউজী বললেন: নিশ্চয়ই শিবের মন্দির!

সাধুজী বললেন: সোমেশ্বরস্বামী শিব, পার্বতীর নাম রাজ রাজেশ্বরী অম্বাভরু। অতি প্রাচীন কালেও কোটিতীর্থ নামে এই স্থানের প্রসিদ্ধি ছিল। গোদাবরী ও কোটিতীর্থের মাহাত্ম্য নিয়ে অনেক অলৌকিক কাহিনী আজও প্রচলিত আছে। দেবরাজ ইন্দ্র এই তীর্থে শাপমুক্ত হয়েছেন এবং কুষ্ঠরোগাক্রান্ত অনেক মানুষও নিরাময় হয়েছে। কোটিপল্লী নাম হয়েছে ফল

বা ফলি শব্দ থেকে। একটি পুণ্যের এখানে এক কোটি ফল পাওয়া যায়। তাই তীর্থের নাম কোটিফলি বা কোটিপল্লী।

দ্রাক্ষারাম শব্দেরও এমনি একটি মানে আছে। দ্রাক্ষা মানে আঙুর নয়, দক্ষ আরাম, আরাম মানে বাগান। পুরাকালে এইখানে দক্ষপ্রজাপতির বাগান ছিল বলে এই স্থানকে দক্ষ তপোবন বা দক্ষবাটিকা বলা হত। কিন্তু উত্তর ভারতের লোক এ কথা মানেন না। তারা হরিদ্বারের কনখলেই দক্ষালয় ছিল বলেন। দক্ষিণ ভারতীয়রা বিশ্বাস করেন যে দ্রাক্ষারামেই দক্ষ যজ্ঞ করেছিলেন। তাই তাঁরা এখানে কোন যজ্ঞ করেন না যজ্ঞ পণ্ড হবার ভয়ে। দ্রাক্ষারামকে অনেকে দক্ষিণ কাশীও বলেন। ভীমেশ্বরস্বামীর যে মন্দিরের জন্য দ্রাক্ষারাম এখন বিখ্যাত, অনেকের ধারণা যে বেদব্যাস স্বয়ং এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে সূর্য নিজে শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ সম্বন্ধেও একটি সুন্দর কাহিনী প্রচলিত আছে।

সাধুজী বললেন: শিব এখানে স্বয়ম্ভূ লিঙ্গ মূর্তিতে ভীমেশ্বর নামে প্রকাশিত হন। সপ্ত শাখায় বিভক্ত হয়ে গোদাবরী সমুদ্রে পড়েছে, সপ্ত গোদাবরীতে সপ্ত ঋষির বাস—কশ্যপ অত্রি গৌতম ভরদ্বাজ বিশ্বামিত্র জমদগ্নি ও বশিষ্ঠ। সপ্ত গোদাবরীর জলে শিবের অভিষেক করবেন বলে এই ঋষিরা জল আনতে গেলেন। ফেরার পথে তাঁরা তুল্য মহর্ষির দেখা পেলেন। সপ্ত গোদাবরীর জলে তাঁর আশ্রম ভেসে যাবে বলে তিনি সপ্ত ঋষিকে বাধা দিলেন। এই সময় বেদব্যাস এসে উপস্থিত। তিনি বললেন যে কোন ভয় নেই, দ্রাক্ষারামে সপ্ত গোদাবরী অন্তর্বাহিনী হয়ে আসবে, মাটির নিচে দিয়ে হবে প্রবাহিত। এই কথায় বিবাদ মিটল, সপ্ত গোদাবরী হল একটি পুষ্করিণী। কিন্তু ঋষিরা সূর্যোদয়ের পূর্বে পৌঁছতে পারলেন না বলে সূর্য নিজেই প্রথম অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করলেন।

এই লিঙ্গ মূর্তি সম্বন্ধে আরও একটি গল্প প্রচলিত আছে। সূর্য যে লিঙ্গটি প্রতিষ্ঠা করেন, তা অতি বিরাট ছিল। সপ্ত ঋষি তার পূজা করতেন। একদা এই লিঙ্গটি ভেঙে পাঁচটি টুকরো হয়ে পাঁচ জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। এখন এই পাঁচটি জায়গাতেই শিবের পূজা হচ্ছে—ভীমাভরন, পালকল্লু অমরাবতী, কোটিপল্লী ও দ্রাক্ষারামে। দ্রাক্ষারামে আরও অনেক মন্দির আছে—শঙ্কর নারায়ণের মন্দির লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির নবগ্রহ ও অষ্টদিকপালের মন্দির।

এর পরে সাধুজী ভদ্রাচলমের কথা শোনালেন, বললেন: ভদ্রাচলমে যাতায়াতের তেমন সুবিধে নেই। রাজমন্দ্রী থেকে প্রায় একশো মাইল পথ,

স্টিমারে গেলে মাইল চল্লিশেক। ট্রেনে গেলে উত্তর দিক থেকে খরস্রোতা গোদাবরী নৌকোয় পেরিয়ে আসা যায়। সীতাহরণের পর কিষ্কিন্ধ্যা যাবার পথে রামচন্দ্র এখানেই গোদাবরী অতিক্রম করেছিলেন। কেউ বলেন, রামচন্দ্র এখানে এসেছিলেন সীতাহরণের আগেই। ভদ্র নামে এক ঋষি পাহাড়ে বাস করতেন, তাঁর আশ্রমে কিছুদিন কাটিয়েছিলেন। ভদ্র ঋষির নামেই ভদ্রাচলম নাম।

যাত্রীরা ভদ্রাচলম যাত্রা করে বৈশাখ মাসে। অসংখ্য যাত্রী পায়ে হেঁটে দণ্ডকারণ্যের ভিতর দিয়ে ভদ্রাচলমে যায়। বুরগম পাহাড় নামে এক জায়গায় গোদাবরী নদী নৌকোয় পার হয়ে ভদ্রাচলম। একটা বিশাল গোপুরম দেখা যায় দূর থেকে। নদীর ধারেই মন্দির। গোটা চল্লিশেক ধাপ উঠে মন্দিরের প্রাঙ্গণ। মূল মন্দিরের চারি দিকে আরও গোটা চব্বিশেক মন্দির আছে। কিন্তু মন্দিরের স্থাপত্য দেখতে এখানে কেউ আসে না। কেন না মন্দির যত মজবুত তত সুন্দর নয়। সুন্দর হল বিগ্রহ। রাম সীতা ও লক্ষ্মণ। ধনুর্বাণ হাতে চতুর্ভুজ রাম ত্রিভঙ্গ মূর্তিতে, পদ্ম হাতে সীতারও ত্রিভঙ্গ মূর্তি। এমন সুন্দর মূর্তি সচরাচর চোখে পড়ে না বলে যাত্রীরা মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে।

সাধুজী তারপরে এই মন্দির প্রতিষ্ঠার গল্প শোনালেন ঃ এই অঞ্চলের একজন স্ত্রীলোক স্বপ্ন দেখেছিল যে দেবতার বিগ্রহ পাহাড়ের উপরে অযত্নে পড়ে আছে। পরদিন সে তার মেয়েকে নিয়ে পাহাড়ে উঠে মূর্তি দেখতে পায়। সে-ই প্রতিষ্ঠা করে মূর্তি। তারপরে যাত্রীরা আসতে থাকে। একবার কবীর নামে একজন মুসলমানও আসে যাত্রীদের সঙ্গে, কিন্তু পুরোহিতরা তাকে বিগ্রহের কাছে যেতে দেয় না। কিন্তু অন্যান্য যাত্রীরা কাছে গিয়ে দেখে যে দেবতার মূর্তি নেই। এই দৃশ্য যাঁরা দেখলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন গোলকুণ্ডার নবাবের একজন কর্মচারী। নাম তাঁর রামদাস। তিনি পুরোহিতদের বললেন, জাত ধর্মের বিচার এখানে আর কোরো না। তাঁর কথা মতো কবীরকে নিকটে আসতে দিতেই বিগ্রহ আবার দেখা গেল। রামদাস এই অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করে এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলেন। নবাবের টাকা গোলকুণ্ডায় না পাঠিয়ে সেই টাকায় এখানে মন্দির তৈরি করে দিলেন। তারপর ধরা পড়ে তাঁর জেল হয়ে গেল। কিন্তু কী আশ্চর্য! রামদাসকে জেল খাটতে হল না। রামদাসের মূর্তি ধরে একজন নবাবের কাছে এসে ফিরিয়ে দিলেন তাঁর টাকা। রামদাস মুক্তি পেয়ে গেলেন। ভক্তের ভগবান নিজেই এসেছিলেন টাকা ফেরৎ দিতে।

এ গল্প আজ হয় তো সকলের বিশ্বাস হবে না। কিন্তু শুনে আশ্চর্য হতে হয় যে সেই থেকে এই মন্দিরের জন্য হায়দ্রাবাদের রাজকোষ থেকে প্রতি বছর

কড়ি হাজার টাকা আসত। মুসলমান নিজাম হিন্দু মন্দিরের খরচ বহন করতেন। এ রকম মন্দির আর কোথাও আছে কিনা জানি না।



সাধুজী বললেন: বিজয়ওয়াডাকে তীর্থস্থান বলা যায় না, কিন্তু কিছু না বললেও চলে না। কলকাতা থেকে যাঁরা মাদ্রাজ মেলে চেপে মাদ্রাজে যান, তাঁরা দুপুরে পৌঁছন ওয়ালটেয়ারে, বিকেলে রাজমন্দ্রীতে, আর সন্ধ্যায় বিজয়ওয়াডায়। এখানে না নেমে কৃষ্ণার পুলের উপরে উঠলে আলোর মালায় সাজানো কনক দুর্গার মন্দির দেখে আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। যাঁরা তীর্থযাত্রী তাঁদের বিজয়ওয়াডায় নামতে হবে, মঙ্গলগিরি দেখে যেতে হবে তিরুপতি। সময় থাকলে আরও কয়েকটি তীর্থস্থান দেখতে হবে এই অঞ্চলের।

কৃষ্ণা নদীর তীরে বিজয়ওয়াডা শহর, আর শহরের উপকণ্ঠে ইন্দ্রকিল পাহাড়ে কনকদুর্গার মন্দির। উপরে উঠবার জন্য সিঁড়ি আছে পাহাড়ের গায়ে, যানবাহনের জন্য পথও আছে। এ দিকের লোক বিশ্বাস করে যে শিবের কাছে পাশুপত অস্ত্র লাভের জন্য অর্জুন তপস্যা করেছিলেন এই পাহাড়ে। বনবাসী পঞ্চপাণ্ডব যখন এ অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তখন এক দিন বেদব্যাস এসে বললেন, তোমাদের একজন এই পাহাড়ে তপস্যা কর, তাহলে শিবের কাছে পাশুপত অস্ত্র পাবে। এই কথা শুনে অর্জুন এখানে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। চারি দিকে আগুন আর মাথার উপরে সূর্য, তারই মধ্যে দুই হাত তুলে এক পায়ে দাঁড়িয়ে অর্জুন তপস্যা করেছেন। শিব তো অল্পেই তুষ্ট হন। ভাবলেন যে অর্জুনকে এবারে বর দেবেন। তবে একটু ছলনা করবার জন্য পার্বতীর সঙ্গে এলেন কিরাতের বেশে। একটা বুনো শুয়োর তাড়িয়ে এনেছিলেন অর্জুনের সামনে। আর একই সঙ্গে তীর ছুঁড়ে শুয়োরটাকে মেরেছিলেন। তারপরেই বিবাদ শুরু হল দুজনের। কিরাত বললেন, শুয়োরটা আমি মেরেছি। আর অর্জুন বললেন, আমি। এই বিবাদ শেষ পর্যন্ত প্রবল যুদ্ধে পরিণত হল। হেরে গিয়ে অর্জুন তাড়াতাড়ি একটি মাটির শিব লিঙ্গ তৈরি করে পূজো করলেন।

কিন্তু কী আশ্চর্য ! যে ফুল বেলপাতা শিবলিঙ্গের মাথায় দিলেন, তা পড়ল কিরাতের মাথায়। অর্জুন মুখ তুলে সবিস্ময়ে এই দৃশ্য দেখেই বুঝতে পারলেন যে শিব নিজে এসেছেন তাঁকে ছলনা করতে। তারপরেই দেখলেন যে কিরাত আর নেই, তার বদলে স্বয়ং শিব সহাস্যে দাঁড়িয়ে আছেন। অর্জুন তাঁকে প্রণাম করে পাশুপতাস্ত্র পেলেন, তারপর সেই খানেই প্রতিষ্ঠা করলেন বিজয়েশ্বর শিবের। ইন্দ্রবিল পাহাড়ে যে সব প্রাচীন গুহা মন্দির আছে, তার একটি মন্দিরে নাকি এই কিরাতার্জুনের গল্প খোদাই করা আছে। অর্জুনের তপস্যা নামে একটি ছবি মহাবলীপুরমের পাহাড়ে খোদাই করা আছে। ভারতীয় স্থাপত্যের একটি আশ্চর্য সুন্দর চিত্র।

সাধুজী বললেন : তিনটি মন্দির নিয়ে বিজয়ওয়াড়া—কনকদুর্গা মল্লেশ্বর ও বিজয়েশ্বর। কনকদুর্গার প্রতিষ্ঠার কথা জানা যায় না বলে লোকে স্বয়ম্ভু বলে। বামেশ্বর শিবের প্রতিষ্ঠা করেন প্রথম পাণ্ডব যুধিষ্ঠির, এই মন্দিরও ইন্দ্রবিল পাহাড়ে কনকদুর্গার মন্দিরের পথে। এর আগের কথাও শোনা যায়। উত্তর ভারতের আর্য সভ্যতা দক্ষিণ ভারতে এনেছিলেন যে অগস্ত্য ঋষি, তিনি এইখানে জয়সেন নামে মহাদেবের প্রতিষ্ঠা করেছেন। অনেকে বলেন যে নিজেদের মল্লযুদ্ধের পরে অর্জুন এই শিবেরই নাম দিয়েছিলেন মল্লেশ্বর। আর একটি মন্দির আছে বাজারের মধ্যে, তার নাম শিবালয়।

এর পরে সাধুজী মঙ্গলগিরির কথা বললেন : কৃষ্ণার পরপারে গুন্টুর যাবার পথে ন্যাশনাল হাইওয়ের ধারে মঙ্গলগিরি। এই পাহাড়টিও পূর্বঘাট পর্বতেরই অংশ। তার আকার একটা হাতির মতো, মুখের কাছে মন্দির। এই পাহাড়ের আকার হাতির মতো কেন হল, তা নিয়ে একটি গল্প আ ছ। এক রাজার ছেলের জন্ম হয়েছিল বিকৃত দেহ নিয়ে। সে বড় হয়ে নারায়ণের দয়ার জন্য তপস্যা শুরু করে। রাজা ছেলেকে ফিরিয়ে নিতে এসেছিলেন, অথচ ছেলে দেবতাকে না পেয়ে ফিরে যেতে রাজী হল না। তাই সে একটা হাতির মতো পাহাড়ের আকার ধারণ করল, আর ভক্তের এই অনুরাগ দেখে নারায়ণ তার মুখে অধিষ্ঠান করলেন লক্ষ্মী নরসিংহ স্বামী মূর্তিতে।

মঙ্গলগিরি যাবার কোন অসুবিধে নেই। ট্রেন আছে, বাসও আছে। একটি মন্দির আর গোপুর আছে পাহাড়ের নিচে, আসল মন্দির পাহাড়ের উপরে। এখানকার গোপুর দেখে আশ্চর্য হতে হয়। মন্দিরে ঢোকবার গেট তো নয়, এইটিই যেন মন্দির। এগারতলা উঁচু; কিন্তু এমন ক্ষীণ দেহের গোপুর বোধহয় আর কোথাও নেই।

নিচের মন্দিরেও আছেন লক্ষ্মী নরসিংহ স্বামী, কিন্তু উপরের মন্দিরের

মতো তিনি জাগ্রত নন। উপরের দেবতা যাত্রীদের কাছে শুধু পানকা নামের সরবৎ খান। গুড়ের জল। আধখানা খেয়ে আধখানা দেন ফিরিয়ে।

সাধুজী হাসছিলেন এই কথা বলবার সময়ে। তাই দেখে তাউজী জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আপনি হাসছেন কেন?

সাধুজী বললেন ঃ এই শরবৎ খাবার গল্প আমি শুধু শিক্ষিত যাত্রীদের কাছেই শুনি নি, একখানা বইএও পড়েছিলাম। দেবতা মুখ হাঁ করেই আছেন। শরবৎ ঢেলে দিতে হয় তাঁর মুখে। দেবতা ঢক ঢক করে সেই শরবৎ খাবেন, তারপর সেই শব্দ বন্ধ হয়ে যাবে। আধখানা খাবেন তিনি, আর বাকি আধখানা ফিরিয়ে দেবেন। দেবতার এই মাহাত্ম্য না দেখলে নাকি জীবনই বৃথা। লোকে মানৎ করে পানকা খাওয়াতে আসে চারি দিক থেকে।

এই অলৌকিক ঘটনা দেখবার জন্য আমার কৌতূহলের কথা মনে হলে এখনও লজ্জা করে। নিচের একটা দোকানে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা দিয়ে প্রায় সাড়ে তিনশো সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠেছিলাম। পাহাড়ের গায়ে ছোট একটি প্রাঙ্গণে লক্ষ্মীনরসিংহস্বামীর মন্দির, আরও শ খানেক সিঁড়ি ভাঙলে মহালক্ষ্মীর মন্দির। আমার কুলি এক কলসী জল আর গুড় নিয়ে উপরে উঠল, মন্দিরের ভিতরেই একটা শিলপাটায় গুড়ের ডেলা ভেঙে শরবৎ তৈরি হল। তারপর টিকিট কিনে ঢুকলাম গর্ভমন্দিরে। দেবতা দরজার সামনে নন, ডান পাশের দেওয়ালে। তাঁর সোনার মুখ। নৃসিংহ অবতার। পূজারী ভোগ নিবেদন করেন। একটা উঁচু জায়গায় কলসি রেখে একটা শঙ্খে শরবৎ তুলে দেবতার মুখে কিছু ঢাললেন, আর কিছু ঢাললেন একটি পাত্রে। এমনি করে শঙ্খের পরে শঙ্খ ভরে শরবৎ খাওয়ালেন দেবতাকে। অর্ধেক শরবৎ দেবতাকে খাওয়াবার পর থামলেন। অনেক উৎকণ্ঠা নিয়ে নিঃশ্বাস রোধ করে আমি পরের ঘটনা প্রত্যক্ষ করবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। অন্য যাত্রীরা আসতে লাগলেন শরবতের কলসী নিয়ে। আর পূজারী আমাকে তাড়া দিয়ে বললেন, প্রণাম করে বেরিয়ে যান। নিঃশব্দে আমি বেরিয়ে এলাম।

তাউজী বললেন ঃ অর্ধেক শরবৎ ফেরৎ পেলেন না?

সাধুজী হেসে উত্তর দিলেন ঃ কলসীর অর্ধেক শরবৎ আমাকে ফেরৎ দিয়েছিল।

অনেকেই হেসে উঠেছিলেন, কিন্তু সাধুজী আর হাসলেন না। বললেন ঃ যুক্তি তর্কের মন নিয়ে তীর্থস্থানে যেতে নেই। তাহলে ঠকতে হয়। ঘরের সিন্দুকে সব হিসেব বন্ধ করে যে আসে শান্তির আশায়, তার মন অন্য রকম। দেবতার নামে বীণার তারের মতো সেই মন কাঁপে, একটা অশ্রুত

সুর তাকে অন্য জগতের সন্ধান দেয়। মিথ্যা বলব না, মঙ্গলগিরি পাহাড়ে আমি আনন্দও পেয়েছিলাম। ক্লান্ত মন নিয়ে পাহাড় থেকে নামবার সময় এক জায়গায় থমকে দাঁড়াতে হয়েছিল। বাঙলার চৈতন্য দেবের পদচিহ্ন আছে একটি ছোট মন্দিরে। সাড়ে চারশো বছর আগে তিনি এই তীর্থে এসেছিলেন। এইখানেই খানিকক্ষণ বসে আমার শরীর মন জুড়িয়ে গিয়েছিল।

সাধুজী এর পরে আরও কয়েকটি অজ্ঞাত তীর্থের কথা বললেন—অমরাবতী চেজেরলা মহানন্দী ও অহবোলম। বললেন: গুন্টুর থেকে এক বেলাতেই অমরাবতী দেখে ফিরে আসা যায়। কুড়ি একুশ মাইল দূরে এই তীর্থে সারাক্ষণ বাস যাতায়াত করে। প্রাকার দিয়ে ঘেরা মস্ত বড় প্রাঙ্গণের মধ্যে এই মন্দির। গোপুর আছে, মন্দিরের শিখরও আছে। খুব উঁচু ভিতের উপরে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত। মূল মন্দিরের সংলগ্ন নাটমণ্ডপ। এই মণ্ডপে দাঁড়িয়ে দেখা যায় কৃষ্ণা নদী, তার শীতল বাতাসে শ্রান্তি দূর হয়ে যায়।

স্থল পুরাণের মতে এই মন্দির খুব প্রাচীন। কলি যুগের প্রারম্ভে শৌনকাদি ঋষি দেবর্ষি নারদের কাছে মুক্তির উপায় জানতে চাইলে নারদ তাঁদের এইখানে বাস করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কৃষ্ণায় স্নান করে অমরাবতীর অমরেশ্বরের অর্চনাতেই তাঁদের মুক্তি হবে। শিব প্রতিষ্ঠার গল্পও আছে স্থলপুরাণে। শিবভক্ত তারকাসুর শিবের বরে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল জয় করেছে। দেবতারা কেঁদে বেড়াচ্ছেন। বিষ্ণু বললেন, কোন উপায় নেই, তারকাসুর অবধ্য। শিব বললেন, আমারও শক্তি নেই আমার ভক্তকে বধ করবার। শেষ পর্যন্ত কুমারস্বামীকে সেনাপতি করে দেবতারা অগ্রসর হলেন। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আবার তাঁরা ফিরে এলেন। শিব বললেন, তারকাসুরের গলায় আমি বাঁধা আছি, ঐ শিবলিঙ্গটি না সরালে তার মৃত্যু নেই। কিন্তু শিবলিঙ্গ ভাঙলেই তা বাড়তে আরম্ভ করবে, তখনই তাকে প্রতিষ্ঠা করা দরকার। দেবতারা আবার অগ্রসর হলেন। কুমার-স্বামী প্রথমেই বাণ মেরে শিবলিঙ্গটি টুকরো টুকরো করে দিলেন, তারপর বধ করলেন তারকাসুরকে। শিবলিঙ্গের মূল অংশ পড়েছিল এইখানে। গুরু বৃহস্পতিকে নিয়ে ইন্দ্র ছুটে এসে দেখলেন যে শিবলিঙ্গটি ক্রমেই বাড়ছে। তাড়াতাড়ি অভিষেক করে তার প্রতিষ্ঠা করতেই বৃদ্ধি বন্ধ হল।

তাউজী বললেন: সত্যিই কি শিবলিঙ্গটি খুব বড়?

সাধুজী বললেন: সত্যিই বড়। একটা স্তম্ভের মতো উঁচু। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে শিবের অভিষেক করতে হয়। সে দিকের লোক বলে যে কৃষ্ণা হল গঙ্গার মতো পবিত্র, আর অমরেশ্বর কাশীর বিশ্বনাথের মতো। গঙ্গায়

স্নান করে বিশ্বনাথ দর্শনের যে পুণ্য, কৃষ্ণায় স্নান করে অমরেশ্বর দর্শন করলে সেই একই পুণ্য হয়।

সাধুজী এবারে চেজেরলা নামে এক অখ্যাত তীর্থের কথা বললেন। গুণ্টুর থেকে মিটার গেজ ট্রেনে পশ্চিমে এগোলে এই পথের ধারেই নাকি এমন একটি মন্দির আছে যা ভারতের আর কোথাও নেই। চেজেরলায় কপোতেশ্বর শিবের মন্দির। মহাভারতের শিবি চক্রবর্তীর গল্প মনে আছে তো?

তাউজী বললেন: না।

সাধুজী সংক্ষেপে আমাদের শিবি রাজার গল্প শোনালেন। যযাতির পৌত্র ও মান্ধাতার পুত্র শিবি ছিলেন কাশ্মীরের রাজা। তাঁর দুই ভাই ছিল মেহডম্বর ও জীমূতবাহন। তীর্থ প্রব্রজ্যায় বেরিয়ে মেহডম্বর আর ফিরলেন না। তাঁর খোঁজ করতে বেরিয়ে জীমূতবাহনও রয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত শিবি রাজা নিজে বেরিয়ে খুঁজতে খুঁজতে এই অঞ্চলে এসে দেখলেন যে তাঁর ভাই তপস্যায় লিঙ্গ শরীর লাভ করেছে। তিনিও স্থির করলেন যে এই সুন্দর জায়গায় তিনি শত যজ্ঞ করবেন। শত যজ্ঞে ব্রহ্মলোক লাভ হয়। তাই দেবতারাও শিবির ধর্ম পরীক্ষার আয়োজন করলেন। নির্বিঘ্নে নিরানব্বুইটি যজ্ঞ হয়ে গেল। তারপরে শততম যজ্ঞটি আরম্ভ হতেই বিঘ্ন উপস্থিত। এক কপোত উড়ে এসে রাজার কোলে পড়ল। রাজা দেখলেন যে এক ব্যাধ এসেছে তীর ধনুক হাতে, ঐ কপোতটি সে বধ করে খাবে। বলল, পায়রাটি আপনি ছেড়ে দিন। রাজা বললেন, আশ্রিতকে তো পরিত্যাগ করতে পারি নে। ব্যাধ বলল, ও আমার খাদ্য, পশুপাখি শিকার করে আমি খাই। রাজা বললেন, আমি রাজা, রাজার ধর্ম শরণাগতকে রক্ষা করা। এ পায়রাকে আমার রক্ষা করতেই হবে। ব্যাধ বলল, আমার স্বধর্ম হল শিকার করে জীবিকার্জন। আপনার ধর্মে যদি বাধা থাকে তো উপযুক্ত ব্যবস্থা করুন।

ধার্মিক রাজা শিবি তখনই সম্মত হয়ে বললেন, বেশ, এই পায়রার সম পরিমাণ মাংস আমি নিজের শরীর থেকে কেটে দিচ্ছি। কিন্তু কী আশ্চর্য! নিজের শরীরের আধখানা কেটে দিয়েও যে একটা পায়রার সমান ওজন হচ্ছে না! তারপরেই দেবতারা তাঁর সামনে আবির্ভূত হলেন। কপোত হলেন বিষ্ণু, ব্যাধ শিব হলেন, আর তাঁর হাতের তীর হলেন ব্রহ্মা। শিবিকে এঁরা বর দিলেন। লিঙ্গাকার হল তাঁর শরীর। চেজেরলায় কপোতেশ্বর নামে তাঁরই পূজা হচ্ছে।

সাধুজী বললেন: গুণ্টুর থেকে খানিকটা এগোলে নরসারাওপেট নামে রেলের স্টেশন। সেখান থেকে পনর মাইল দূরে পাহাড়ে ঘেরা একটি

গ্রামের নাম চেজেরলা। কিছুদূর বাসে যাবার পর হাঁটতে হয়। মন্দির এত প্রাচীন যে একে মন্দির বলেই মনে হবে না। মনে হবে যে মাটির উপরেই একটা বেয়াড়া ধরণের গম্বুজ। স্তম্ভ নেই, মণ্ডপ নেই, কারুকার্যও কোন নেই। লোকে তাই সন্দেহ করে যে পুরাকালে এটি বৌদ্ধ চৈত্য ছিল। অমরাবতীতেও একটি বিরাট বৌদ্ধ স্তূপের একটি ছোট ধ্বংসাবশেষ আছে।

সাধুজী এর পর মহানন্দী ও অহোবলমের কথা শোনালেন। বললেনঃ একই ট্রেনে আরও খানিকটা এগিয়ে গেলে নাণ্ডিয়াল নামে একটা স্টেশন আছে। মহানন্দী যেখান থেকে দশ মাইল দূরে, আর তিরিশ মাইল দূরে অহোবলম। বাসে এই সব জায়গায় যাতায়াত করতে হয়।

দক্ষিণ ভারতে নাল্লামালাই নামে একটি পবিত্র পাহাড় উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত। এই পাহাড়ে আছে চারটি বিখ্যাত তীর্থ—উত্তরে শ্রীশৈলমে মল্লিকার্জুন, দক্ষিণে তিরুপতি, আর মাঝখানে মহানন্দী আর অহোবলম। শ্রীশৈলম ও মহানদী শৈব তীর্থ, বৈষ্ণব তীর্থ হল তিরুপতি ও অহোবলম। মহানন্দীতে পাহাড়ে উঠতে হয় না, গাড়ি এসে পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়ায়। সেইখানেই মন্দির। মূল মন্দিরে আছেন শিব, আর শিবলিঙ্গের নিচে থেকে পাঁচটি জলের ধারা প্রবাহিত হয়ে সামনের সরোবরে পড়েছে। আশ্চর্য সুন্দর এই সরোবরটি। স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ জল সারাক্ষণ টলটল করছে। কিন্তু শীতল জল নয়। কবোষ্ণ। পাঁচ ফুট মাত্র গভীর। বাঁধানো মুখ দিয়ে জল এসে সরোবরে পড়ছে দেখা যায়, কিন্তু এর উৎস কোথায় তা কেউ জানে না। আবার কোন্ পথে এই জল বেরিয়ে যাচ্ছে তাও দেখতে পাওয়া যায় না। জলে এমন গুণ আছে যে নানা রোগ সারে এই জলে স্নান করে। নানা স্থান থেকে তাই অনেক যাত্রী এখানে স্নান করতে আসে। আর ডুবে যাবার ভয় নেই বলে মনের আনন্দে স্নান করে। সরোবরের মাঝখানে একটি ছোট মণ্ডপ আছে। আর মূল মন্দিরটি ঘিরে আছে আরও অনেকগুলি মণ্ডপ। মন্দিরও আছে অনেকগুলি। দেবীর মন্দির মূল মন্দিরের পাশে, আর পিছনে আরও তিনটি শিবের মন্দির আছে।

এই মন্দিরের স্থাপত্য নাকি লক্ষ্য করবার মতো। মূল মন্দিরের বিমান ঠিক উড়িষ্যার মন্দিরের মতো। উত্তর ভারত ছাড়া দক্ষিণের কোন খানে এমন উঁচু বিমানযুক্ত মন্দির নেই। আর সব কিছু দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্যের নিদর্শন। এমন কি দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য মন্দিরের মতো একটি গোপুরমও আছে, কিন্তু সেটি মন্দিরের চেয়ে উঁচু নয়। এই সব

দেখে অনেকে মনে করেন যে হিমালয় থেকে এক সিদ্ধ পুরুষ এসে এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। তিনি নাকি মজুরদের কাজের মজুরি দিয়েছিলেন এক অদ্ভুত উপায়ে। মন্দির তৈরি হয়ে যাবার পরে তাদের বালির পাহাড় গড়তে বলেছিলেন, আর মন্ত্রের জোরে সেই বালিকে সম্পদে পরিণত করেছিলেন।

শিবের মন্দিরের সামনে একটি বিরাট নন্দী আছে। সেই নন্দীর নামেই তীর্থের মহানন্দী নাম হয়েছে বলে অনেকের ধারণা। এ ছাড়াও এই অঞ্চলে আরও নটি নন্দীর মন্দির আছে। তাদের আলাদা আলাদা নাম— পদ্মানন্দী নাগনন্দী বিনায়কনন্দী গরুড়নন্দী ব্রহ্মনন্দী সূর্যনন্দী বিষ্ণুনন্দী সোমনন্দী ও শিবনন্দী। ধার্মিক যাঁরা তাঁরা একদিন সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তের মধ্যে এই সব নন্দীর দর্শন করে পূজা করে আসেন।

সাধুজী বললেন: একাদশ শতাব্দীতে এই অঞ্চলে নাকি নন্দ রাজারা রাজত্ব করতেন। তাঁদের কুলদেবতা ছিলেন নন্দী। এক একটি রাজা তাই এক একটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। মূল মন্দিরের নাম মহানন্দী, আর নন্দীর আলয় থেকে স্টেশনের নাম হয়েছে নাণ্ডিয়াল।

মহানন্দীর শিব হলেন স্বয়ম্ভু। তাঁর আবিষ্কারের গল্প ঠিক অন্যান্য স্বয়ম্ভু লিঙ্গের আবিষ্কারের মতোই। একজন নন্দ রাজা দেবতার অভিষেক করবেন দুধে। তাই চারিধার থেকে অগণিত গাভী আনা হল। তারই মধ্যে একটি ছিল কালো গরু। রাজা নিজে সেই গরুর দুধ খেতেন। কিন্তু দেখা গেল যে দিন দিন সেই গরুর দুধ কমে যাচ্ছে। একদিন রাখাল সেই গরুকে অনুসরণ করে দেখে যে গরুটি একটি উইএর ঢিবির উপরে এসে দাঁড়িয়েছে, আর দুধের ধারা ঝরে পড়ছে সেই ঢিবির উপরে। তারপর আরও আশ্চর্যের ব্যাপার ঘটল। বালক মূর্তিতে প্রভু দেখা দিলেন গরুকে। কিন্তু রাখাল এই ঘটনা রাজার গোচরে আনল। আর একদিন রাজাও এই দৃশ্য দেখলেন। বিস্ময়ে ও পুলকে তাঁর পায়ের নিচে শুকনো পাতা মর্মরিয়ে উঠল, আর গরুটা চমকে তার একটা পা তুলে দিল উইএর ঢিবির উপরে। উইএর ঢিবি তো নয়, যেন এক তাল কাদা। গরুর পায়ের ছাপ পড়ে গেল সেই ঢিবিতে। মহানন্দীর শিবের মাথায় আজও সেই ছাপ দেখতে পাওয়া যায়।

সাধুজী এর পরে অহোবলমের গল্প বললেন আমাদের। মহানন্দীর নবনন্দীর মতো অহোবলমে নৃসিংহের নবরূপ আছে। আর তা দেখতে হলে পাহাড়ের উপরে নিচে ও চারি দিকে ঘুরে পাঁচ ক্রোশ পায়ে হেঁটে পরিভ্রমণ করতে হয়। একটা অনুষ্টুপ শ্লোক বলে ওরা। উগ্র-বীর-ভীষণ-ভদ্র-জ্বলন্ত এই

রকমের সব রূপ। এই জায়গার নাম অহোবলম কেন হল, সে সম্বন্ধেও একটা গল্প বলে। হিরণ্যকশিপু বধের সময় বিষ্ণুর সেই ভীষণ মূর্তি দেখে দেবতারা নাকি বলে উঠেছিলেন, নরসিংহ পরমং দেবং অহো বলং অহো বলং। এই কথার থেকেই জায়গার নাম হয়েছে অহোবলম। একটা বিরাট স্তম্ভ দেখিয়ে বলে যে সেই স্তম্ভটিই হিরণ্যকশিপু ভেঙেছিল পদাঘাতে। আর একটি কুণ্ডের লালচে জল দেখিয়ে বলে যে হিরণ্যকশিপুর রক্তে সেই জল লাল হয়েছে, অসুরকে বধ করবার পর নরসিংহ সেই কুণ্ডের জলে হাত ধুয়েছিলেন।

অহোবলমের একটা বড় উৎসবের নাম ব্রহ্মোৎসব। শিবরাত্রির এক পক্ষ পরে সেই উৎসব হয়। এই পাহাড়ে চেঙ্কু নামে এক আদিবাসী জাত আছে। তারা বলে যে লক্ষ্মী হলেন চেঙ্কেটা, মানে চেঙ্কুদের ঘরের কনে। বিষ্ণু নরসিংহ অবতার হচ্ছেন শুনে লক্ষ্মী এই আদিবাসীদের ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন। ব্রহ্মোৎসব হল এঁদের বিবাহের উৎসব। সেদিন তাঁদের উৎসব মূর্তি আনা হয় কল্যাণ মণ্ডপে। স্থানীয় পদ্মশালীরা বসবে লক্ষ্মীর পক্ষ নিয়ে, বিষ্ণুর সঙ্গে বিবাহের কথাবার্তা হবে। তারপর তাদেরই একজন বিবাহ দেবে। যে বারে যার নাম উঠবে, সে নিজেকে কৃতার্থ ভাববে।

তাউজী জিজ্ঞাসা করলেন: পাহাড়ের নিচে মন্দির, না উপরে?

সাধুজী বললেন: বন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ছ মাইল পথ পাহাড় ভেঙে উঠতে হয়। দু চারশো ফুট উঁচু নয়, দু হাজার আটশো ফুট। নিচে প্রহ্লাদবরদা নরসিংহ, আর উপরে অন্যান্য মন্দির। বড় মঠ আছে বৈষ্ণবদের, সেখানে এই তীর্থের মাহাত্ম্য শুনতে পাওয়া যায়। এখানকার মঙ্গলশ্লোক শুনে মনে হবে যে এর চেয়ে বড় তীর্থ আর নেই। বৈষ্ণব কবি তিরুমঙ্গাই আলোয়ার দশটি শ্লোকে এই দেবতার নাম গান করেছেন।

অহোবলমের মন্দিরে সোনার যে উৎসব মূর্তিটি আছে, তা দিয়েছিলেন কাকতীয় রাজা প্রতাপরুদ্র দেব। শ্রীশৈলম দর্শনের পর ফেরার পথে অহোবলম থেকে ষোল মাইল দূরে রুদ্রভরমে কিছুদিন তিনি বিশ্রাম করে-ছিলেন। তাঁর ইচ্ছা হয়েছিল যে একটি সোনার শিব লিঙ্গ গড়বেন। কিন্তু যত বার তা গড়বার চেষ্টা হয়, ততবারই দেখা যায় যে ছাঁচে নরসিংহের মূর্তি উঠেছে। রাজা আশ্চর্য হয়েছিলেন এই ব্যাপার দেখে। শেষে ধ্যানে দেখলেন যে প্রভু তাঁর সামনে এসে বলছেন যে বিষ্ণু আর শিবে কোন প্রভেদ নেই। দেবতা এক। প্রভুর কথায় রাজা সেই সোনার উৎসব মূর্তি অহোবলমে পাঠালেন। এর পরে এই মন্দিরে এসেছেন চালুক রাজা বিক্রমাদিত্য ও বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায়। কলিঙ্গ বিজয়ের

পরে তিনি দেবতাকে একটি হীরের মালা বালা আর একটি সোনার থালায় এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলেন।



সাধুজী বোধ হয় ক্লান্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তাউজী বললেন: এবারে বোধহয় শ্রীশৈলের কথা বলবেন।

সাধুজী এই ইঙ্গিত বুঝতে পেরে হেসে বললেন: ও দেশে একটা কথা আছে যে কাশীতে মৃত্যু হলে মুক্তি, অরুণাচলের নাম স্মরণেই মুক্তি। কিন্তু শ্রীশৈলমে মুক্তি হয় দেবতার দর্শনে, আর এ সব জায়গায় মুক্তি হলে পুনর্জন্ম হয় না।

তারপরেই বললেন: মহাভারতের বনপর্বে শ্রীশৈলের উল্লেখ আছে। এখানকার পবিত্র জলে স্নান করে শুচি মনে দেবদর্শন করলে অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল লাভ হয়। আমাদের পীঠস্থানের তালিকাতেও শ্রীশৈলম বা শ্রীপর্বতের নাম আছে। কিন্তু দেবতার নাম ভ্রমরম্বা ও মল্লিকার্জুন নয়। শ্রীশৈলম গ্রীবা পীঠ, দেবী মহালক্ষ্মী ও ভৈরব শম্বরানন্দ। মতান্তরে দেবীর নাম মাধবী।

শ্রীশৈলমের মল্লিকার্জুন হলেন শিবের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে প্রধান। রামেশ্বরের মতো তাঁর খ্যাতি। অন্ধ্রে বৈষ্ণবদের কাছে যেমন তিরুপতি, তেমনি শৈবদের কাছে শ্রীশৈলম। কৃষ্ণা নদীর তীরে শ্রীশৈলম পাহাড়ের উপরে মল্লিকার্জুনের মন্দির। প্রায় দেড় হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের উপরে এক খণ্ড নিচু জমিতে এই মন্দিরটি উঁচু প্রাকারে বেষ্টিত। মন্দির থেকে বাঁধানো ধাপ কৃষ্ণার তীর পর্যন্ত নেমে গেছে। কৃষ্ণার নাম এখানে পাতালগঙ্গা। এই পাতালগঙ্গার জলেই দেবতার অভিষেক হয়। কিছু দিন এই তীর্থ কেদারনাথ বা অমরনাথের মতোই দুর্গম ছিল। এখন বাসেই পৌঁছনো যায়। নান্দিয়াল বা মার্কাপুর স্টেশন থেকে তো যাওয়া যায়ই, গুন্টুর থেকেও শ্রীশৈলমে পৌঁছানো যায়। নাগার্জুনসাগর থেকেও বাস যাতায়াত করে।

সাধুজী এর পরে মন্দিরের কথা বললেন: মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশের জন্য

তিনটি গোপুর আছে তিন দিকে। আর প্রাঙ্গণের মধ্যে ছোট বড় মন্দির ও মণ্ডপ আছে অনেকগুলি। মাঝখানে মল্লিকার্জুনের মূল মন্দির, তার সামনে মুখ্যমণ্ডপ। পাঁচশো বছর আগে বিজয়নগরের রাজা দ্বিতীয় হরিহর এটি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। এই মণ্ডপের স্তম্ভগুলি দেখবার মতো সুন্দর, ততোধিক সুন্দর হল শিবের একটি নটরাজ মূর্তি। পাথরের নয়, ব্রোঞ্জের তৈরি এই মূর্তিটি একটি অপরূপ শিল্পকর্ম।

উত্তরদিকে একটি বটগাছের নিচে আছে ছোট একটি মন্দির। সেটিও মল্লিকার্জুনের। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস যে ঐটেই হল আসল মন্দির। ঐ মন্দিরে যে শিবলিঙ্গ আছে রাজকন্যা চন্দ্রাবতীর কালো গরু তারই উপরে দুধ দিত। সেই পুরনো গল্প। কৃষ্ণার উত্তরে ছিল চন্দ্রগুপ্তপত্তন রাজ্য, তারই রাজকন্যা চন্দ্রাবতী। ধর্মে তাঁর মতি ছিল অচঞ্চল, বড় হয়ে এই শ্রীশৈলে এসেছিলেন তপস্যার জন্য। সঙ্গে ছিল একপাল গরু আর রাখাল। কালো গরু দুধ দিচ্ছে না দেখে তাকে অনুসরণ করে স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গ দেখা গেল। স্বপ্নে রাজকন্যা মল্লিকার্জুনের আদেশ পেলেন। আর সেই শিবলিঙ্গের উপরে মন্দির নির্মাণ করলেন। বট গাছের নিচের মন্দিরটি সেই প্রাচীন মন্দির। মূল মন্দিরের বাহিরের প্রাকারে রামায়ণ ও মহাভারতের নানা কাহিনীর সঙ্গে এই কাহিনীও উৎকীর্ণ করা আছে।

ভ্রমরম্বার মন্দিরকে সবাই আম্মার মন্দির বলে। তাঁর পুরনো নাম নাকি মাধবী। এই মন্দির ছাড়াও আছে নন্দীর মণ্ডপ, বসন্ত মণ্ডপ, বীর ভদ্রের মন্দির ও সহস্রলিঙ্গ মন্দির।

এখানেও এই পাহাড়ের আদিবাসী চেঙ্কুদের নিয়ে গল্প আছে। এরা বলে যে শিব একবার এই পাহাড়ে এসেছিলেন মৃগয়ায়, আর এক চেঙ্কু নারীর প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করেছিলেন। মল্লিকার্জুনকে তাই তারা চেঙ্কু মল্লিকা বলে। মন্দিরে তাদের অবাধ গতি। রথের সময় তারা দড়ি টানে, আর শিবরাত্রিতে গর্ভগৃহের ভিতরে ঢুকে তারা শিবের অর্চনা করে। যে কোন হিন্দু মল্লিকার্জুনের মন্দিরে ঢুকে শিবের অভিষেক ও অর্চনা করতে পারে। এ রকম স্বাধীনতা দক্ষিণ-ভারতে আর কোন মন্দিরে নেই।

এর পরে সাধুজী আর একটি শিবের মন্দিরের নাম করলেন, তার নাম কালহস্তি। বললেন ঃ বিজয়ওয়াড়া থেকে বড় লাইনের গাড়িতে মাদ্রাজে যাবার পথে গুড়ুর নামে একটি জংসন স্টেশন আছে। সেখান থেকে তিরুপতির ট্রেন ও বাস পাওয়া যায়। বড় লাইনের গাড়িতে ছোট লাইনের পথে যাবার সময় কালহস্তী নামে একটা স্টেশনে নেমে পড়লে আর একটা তীর্থস্থান দেখা হয়ে যায়। যাত্রীরা শিবের দর্শন করে যায় তিরুপতি। এক

যাত্রায় দুটি তীর্থ দর্শন কম কথা নয়।

দক্ষিণ ভারতে শিবের পঞ্চলিঙ্গ আছে। পঞ্চভূত লিঙ্গ—ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম। কালহস্তীতে শিবের মরুৎ লিঙ্গ, মানে শিবের বায়ু মূর্তি এইখানে।

তাউজী জিজ্ঞাসা করলেন ঃ সে আবার কী মূর্তি ?

সাধুজী হেসে বললেন ঃ গর্ভ গৃহের মধ্যে একটি প্রদীপ জ্বেলে রাখা হয়। বাতাস আসবার কোন রন্ধ্র নেই, অথচ শিখাটি সারাক্ষণ থরথর করে কাঁপে।

কে একজন পিছন থেকে জিজ্ঞাসা করল ঃ আর চারটি শিবলিঙ্গ কোথায় ?

সাধুজী বললেন ঃ ক্ষিতিলিঙ্গ কাঞ্চীতে, অপ্‌লিঙ্গ ত্রিচির কাছে জম্বুকেশ্বরে, অরুণাচলে তেজলিঙ্গ, ও ব্যোমলিঙ্গ চিদম্বরমে। শৈবদের কাছে এই পঞ্চভূত ক্ষেত্র খুবই পবিত্র।

তারপরে বললেন ঃ কালহস্তীর প্রাকৃতির দৃশ্য বড় চমৎকার। সুবর্ণমুখী নদীর ধারে দুই পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত এই মন্দির। লোকে এই পাহাড়কে মেরু পর্বত বলে। পবনের সঙ্গে আদিশেষের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় মেরু পর্বতের তিনটি অংশ উড়ে গিয়েছিল। তার একটি পড়েছে কালহস্তীতে, দ্বিতীয়টি তিরুচির পল্লীতে, আর তৃতীয়টি সিংহলে।

তাউজী বললেন ঃ এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার গল্পটি বলবেন না ?

সাধুজী বললেন ঃ এ গল্প তিরুপতিতে শুনেছিলাম। তিরুপতির পাহাড়ের নাম তিরুমালাই, কিন্তু দক্ষিণ দেশের লোকেরা ভেঙ্কটাচল বা শেষাচল বলে। ভক্তরা বলে মেরু পর্বত। কেন বলে তার সম্বন্ধে একটা কিংবদন্তী আছে। মেরু পর্বতে শক্তির পরীক্ষা হয়েছিল পবনের সঙ্গে নাগরাজ আদিশেষের। পবন সমস্ত মেরু পর্বত হাওয়ায় উড়িয়ে দেবেন, আর আদিশেষ তাঁর সহস্র ফণায় রক্ষা করবেন পর্বতকে। দুজনের যুদ্ধ আরম্ভ হল। প্রবল বেগে বইতে লাগলেন পবন, আর আদিশেষ তাঁর সহস্র ফণা বিস্তার করে মেরু পর্বতকে রক্ষা করতে লাগলেন। পবন দেখলেন যে শক্তিতে হবে না, কৌশলে কৃতকার্য হতে হবে। তাই এক সময়ে এমন ভাব দেখালেন যে ক্লান্ত হয়ে তিনি হেরে গেছেন। আদিশেষ এই কথা বিশ্বাস করে যেই তাঁর ফণা নামালেন, ফণা তুলতে না তুলতেই মেরু পর্বতের একটা অংশ ভেঙে উড়ে এসে এই তিরুপতিতে পড়ল। সেই জন্যই বৈষ্ণব ভক্তরা তিরুপতির এই পাহাড়কে বলেন মেরু পর্বত, আর শৈবরা কালহস্তীর পাহাড়কেই এই নামে পরিচিত করেছেন।

সাধুজী আমাদের আরও একটি কিংবদন্তী শোনালেন। কালহস্তীর

শিবের পূজো প্রথম করেছিল তিনজন—একটি মাকড়শা এক সাপ ও একটি হাতি। মাকড়শা শিবের মাথায় জাল বুনত, সাপ দিয়েছিল তার ফণার মনি, আর হাতি তার শুঁড় দিয়ে শিবের স্নান করাত। কিন্তু কেউই জানত না যে শিবের ভক্ত আছে তিনজন। একদিন সাপ দেখল শিবের গায়ে জল আর বেলপাতা, ভাবল যে নিশ্চয়ই কেউ শিবের ক্ষতি করতে এসেছিল। এই ভেবে সে লুকিয়ে রইল। তারপরে হাতি যেই স্নান করতে এল, অমনি সাপ তার শুঁড়ের ভিতর ঢুকে পড়ল। যন্ত্রণায় হাতি তার শুঁড়টা শিবের গায়ে ঠুকতেই মাকড়শা আর সাপ দুজনেই মারা পড়ল, হাতিও মরল যন্ত্রণায়। শিব তিনজনেরই মুক্তি বিধান করলেন। তাঁর নাম হল শ্রীকালহস্তীশ্বর। শ্রী মাকড়শা, কাল সাপ, আর হাতি—এই তিনজনের ঈশ্বর।

সাধুজী বললেন : আরও কয়েকটি মন্দির আছে এখানে। উত্তরের পাহাড়ে দুর্গাম্মার মন্দির। কান্নাপ্পা মুনির নামে কান্নাবেশ্বরের মন্দির দক্ষিণের পাহাড়ে। এই পাহাড়ের গায়ে ছোট একটি ব্রহ্মার মন্দিরও আছে। কান্নাপ্পা মুনিরও একটি কাহিনী আছে। তিনি ছিলেন একজন সাধারণ লোক। বনের পশু পাখি মেরে শিবের ভোগ দিতেন। একদিন শিব তাঁকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। কান্নাপ্পা দেখলেন যে শিবলিঙ্গের একটা চোখ থেকে জল পড়ছে। কান্নাপ্পা ভাবলেন যে নিশ্চয়ই চোখে কিছু হয়েছে, তাই নিজের একটা চোখ তুলে শিবকে দিলেন। চোখের জল পড়া অমনি বন্ধ হয়ে গেল। খানিকক্ষণ পরে দেখলেন যে আর একটা চোখেও জল পড়ছে। কান্নাপ্পা তখনই তাঁর অন্য চোখটিও তুলে শিবকে দিতে যাচ্ছিলেন। শিব তাঁর এই ভক্তি দেখে দেখা দিয়ে ভক্তের চোখ দিলেন ফিরিয়ে। যাত্রীরা এখন তাই কান্নাপ্পার পুজো আগে করে, পরে শিবের পুজো।

সাধুজী একটু থেমে বললেন : লেপাক্ষীতেও এই রকমের একটা গল্প প্রচলিত আছে। লেপাক্ষীও অন্ধ্রে, প্রাচীন বিজয়নগর রাজ্যের একটি তীর্থ স্থান। রেনিগুণ্টা থেকে বম্বে যাবার পথে পেন্নার নদীর তীরে টাডপত্রী শিবের স্থান। টাডপত্রী থেকে লেপাক্ষী বা আলমপুরের তীর্থ করতে হলে গুণ্টাকলে গাড়ি বদল করতে হবে। দক্ষিণে ব্যাঙ্গালোরের দিকে এগোলে হিন্দুপুর স্টেশন থেকে দশ মাইল দূরে লেপাক্ষী, আর উত্তরে হায়দ্রাবাদের দিকে এগোলে আলমপুর। এখানকার মন্দির দেখে গুহামন্দির বলে মনে হয়।

সাধুজী আবার কালহস্তীর কথায় ফিরে এসে বললেন : কালহস্তীর মন্দির প্রাঙ্গণে এখন ছোট বড় অনেকগুলি মন্দির আছে। প্রথমে কাশীর বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার মন্দির, তারপরে মাটির বিশ হাত নিচে পাতাল বিনায়কের মন্দির। এ ছাড়া আছে সূর্য নারায়ণের মন্দির সুব্রহ্মণ্য সদা-মুক্তি গণপতির

মন্দির। দেবীর নাম জ্ঞান প্রসন্নাম্বা। তিনি হলেন তিরুপতির বেঙ্কটেশ্বর স্বামীর ভগিনী। দেবরাজ ইন্দ্রকে তিনি পরব্রহ্মের জ্ঞান দিয়েছিলেন বলে তাঁর এই নাম হয়েছে। সকলের বিশ্বাস যে ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রম ছিল এইখানে। লেপাক্ষীতে ছিলেন অগস্ত্য, আর পরশুরাম তপস্যা করেছেন টাডপত্রীতে।



কালহস্তীর কথা শেষ করে সাধুজী থামতে পারলেন না, থামার উপায় ছিল না। তিনি জেনে ফেলেছেন যে তাউজী তাঁকে থামতে দেবেন না। তাই বললেন: কালহস্তী থেকে তিরুপতি মাইল তিরিশেক পথ। ট্রেনে গেলে বড় লাইনের রেনিগুণ্টা স্টেশন থেকে ছোট লাইনের তিরুপতি স্টেশনে গিয়ে তিরুমালাই পাহাড়ে ওঠার বাস ধরতে হয়। রেনিগুণ্টা স্টেশন থেকেও পাহাড়ের বাস পাওয়া যায়। স্টেশনের বাইরে থেকে বাস ছাড়ে। দূরত্ব খুব বেশি নয়। দেখতে দেখতেই বাস পৌঁছে যায় পাহাড়ের ওপরে। ছোট শহর, কিন্তু খুব ব্যস্ত সমস্ত ভাব। বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে এসে যা দেখতে পাওয়া যায় তা আমাদের কল্পনাতীত। অসংখ্য বাস দাঁড়িয়ে আছে আর সেই বাসে উঠবার জন্য লাইন দেবার যে ব্যবস্থা তা কোথাও দেখা যায় না। দূর থেকে মনে হবে যে ঘরের মধ্যে রেলিঙ দিয়ে কিউ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আছে—এক সঙ্গে দুজন যাত্রী বাসের হাতল ধরতে পারবে না। গুনে গুনে যাত্রী তোলা হবে। একখানা বাস ছেড়ে গেলেই আর একখানা বাস এসে সেখানে দাঁড়াবে। একটি অবিচ্ছিন্ন জনস্রোত পাহাড়ে উঠছে আর নামছে। পাহাড়ের উপরে ভেঙ্কটেশ্বর, উত্তর ভারতের লোকে বলে বালাজী। আর নীচে দেবী পদ্মাবতী। নিচের শহর থেকে শিখরের মন্দির সাত মাইলের পথ। একসময় সিঁড়ি ভেঙে সাতটি পাহাড় ডিঙিয়ে মন্দিরের দরজায় পৌঁছতে হত।

তিরুমালাই তিরুপতি দেবস্থান শুধু মন্দির পরিচালনা করেন না, শিক্ষার দিকেও তাঁদের দৃষ্টি আছে। নানা প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছেন তাঁরা। শোনা যায় যে এক মাসে নাকি পঁচিশ লক্ষ টাকাও আয় হয়। কিন্তু যাত্রীদের কাছে জোর করে কিছু আদায় করা হয় না। মন্দিরে দান করবার জন্যে হুণ্ডি আছে,

যাত্রীরা যা প্রাণে চায় তাই দিয়ে যায়। তবে তাড়াতাড়ি দেবতার দর্শন পেতে হলে কিংবা ভাল করে দেবতাকে দেখতে হলে খরচ করতে হয়। দিনের খানিকটা সময় ধর্মদর্শন, তার মানে যে কোন যাত্রী বিনে পয়সায় দেবতার দর্শন পেতে পারে। শেষ রাতে উঠে লাইনে দাঁড়িয়ে ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে এই ধর্ম দর্শন। তা না পারলে নানা রকম টিকিটের ব্যবস্থা। অর্চনা একান্তসেবা তমালসেবা—কোনটা সাত টাকা, কোনটা তের টাকা। সাত টাকায় চারজন ও তের টাকায় পাঁচজন ঢুকতে পারে। কিন্তু এই টিকিট কাটবার জন্যেও লাইন আছে। আবার টিকিট কাটবার পরেও লাইন। লাইন না দিয়ে কারও নিস্তার নেই। কিন্তু কোন লাইনই সোজা গিয়ে মন্দিরে পেঁছয় নি। প্রথমে একটি খোঁয়াড়ের মতো চৌকো জায়গায় দাঁড়াতে হয়, ওপরে ছাদ। এই রকমের অসংখ্য খোঁয়াড়। যাত্রীরা অপেক্ষা করবার জন্য তৈরি হয়ে আসে, সঙ্গে বই পত্র আনে, পড়ে সময় কাটায়। মন্দিরে যাবার ডাক এলে শম্বুক গতিতে অগ্রগতি। পাশাপাশি দুজনে দাঁড়াবার উপায় নেই, বসবারও ব্যবস্থা নেই, এঁকে বেঁকে এমন ভাবে এগোতে হয় যে কোথায় যাচ্ছি বুঝতেই পারা যায় না। এ একেবারে নতুন ধরণের অভিজ্ঞতা। কিন্তু সবার জন্য এই ব্যবস্থা নয়।

কোন উৎসবের জন্য টাকা জমা দিলে লাইনে দাঁড়াতে হয় না। বসন্তোৎসবের জন্য দু হাজার টাকা, ব্রহ্মোৎসব দেড় হাজার বা সাড়ে সাতশোয়, আর পাঁচশোয় কল্যাণোৎসব হয়।

সাধুজী বললেন ঃ যা দেখেছি তাতে আমার মন ভরে নি। অনেক কষ্টে অনেক সময় নিয়ে গর্ভগৃহের কাছে পেঁছে দেখলাম যে দেবতাকে দর্শনের জন্য সময় পাচ্ছে না কেউ। দরজার সামনে যাত্রীরা এক মুহূর্ত দাড়াচ্ছে, প্রণাম করছে দেবতাকে, তারপরেই সরে যাচ্ছে। একটুখানি বেশি সময় দাঁড়ালেই পূজারীরা হাত নেড়ে সরে যেতে বলছেন। লাইন থামলে চলবে না, পিছনে যাত্রী আছে, আরও যাত্রী আছে বাইরে। দেবতাকে এক নজরে দেখে নাও, তারপরে সরে যাও দেবতার সামনে থেকে, আর একজন এসে দাঁড়াবে দেবতার সামনে। এমনি করে আমিও দেখলাম দেবতাকে, তারপরে বেরিয়ে এলাম। এরই নাম ধর্মদর্শন, এরই নাম অর্চনা তমাল-সেবা বা একান্ত সেবা। এরই নাম ফুলাঙ্গি অভিষেকম বা আরতি। ফুল তুলসিপাতা নেই, নেই কোন ভোগ নিবেদনের নিয়ম। দেবতাকে এক নজরে দেখেই হুণ্ডিতে টাকা ফেলতে যাও।

তাউজী প্রশ্ন করলেন ঃ দেবতা কী রকম দেখলেন ?

সাধুজী বললেন ঃ কঠিন প্রশ্ন। কী দেখলাম তা বুঝতেই পারলাম না। মনে হয়েছিল, কালো পাথরের মূর্তি, মুখে তিলকের মতো করে

চন্দন। বরাহ মূর্তি বলেই মনে হয়। কিন্তু শুনলাম যে শঙ্খচক্রধারী বিষ্ণুর মূর্তি। এর পরে আর কোন লাইন নয়, নিয়মকানুনও আর নেই। দেবদর্শনের পরে যাত্রীরা সবাই মুক্তি পায়, পাশাপাশি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলে স্বাধীন ভাবে। মন্দিরের ভিতরের অঙ্গন সেটা, উপরের দিকে তাকিয়ে সোনার পাতে মোড়া ঝকমকে বিমান দেখে। এই বিমানের নাম আনন্দ নিলয়ম। গর্ভগৃহে যেমন সোনার দরজা, তেমনি সোনার শিখর এই মন্দিরের। কিন্তু চারি দিকের দেওয়াল নিতান্তই সাধারণ। মন্দিরের তৃতীয় প্রাকার এটি, নাম বৈকুণ্ঠ প্রদক্ষিণম। দ্বিতীয় প্রাকারের নাম বিমান প্রদক্ষিণম। প্রথম প্রাকারের মধ্যে অনেক দ্রষ্টব্য বস্তু আছে, অনেক ঐতিহাসিক মূর্তি। মহিষীদের সঙ্গে বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায়, ভেঙ্কটপতি রায় ও অচ্যুত রায়। আকবর বাদশাহর মন্ত্রী টোডরমলের সস্ত্রীক তামার মূর্তিও আছে। রঙ্গমণ্ডপে আছে হুণ্ডি, মানে প্রণামী দেবার জায়গা। খুচরো পয়সা এত পড়ছে যে হিমসিম খাচ্ছে খাজাঞ্চীরা। সারাক্ষণ হুণ্ডি খুলে পয়সা বার করছে, পয়সা গুনবার সময় নেই। আধুলি সিকি দশ পাঁচ তিন দুই এক—এই সব মুদ্রার পাহাড়। বড় বড় পাল্লায় ওজন করে সরিয়ে ফেলছে বস্তায় ভরে। টাকা পয়সার ছড়াছড়ি। ভেঙ্কটেশ্বরের কাছে নাকি হিসেব দিতে হয়, যেমন রাজার কাছে হিসেব দেওয়ার নিয়ম।

সাধুজী একটু থেমে বললেন: যে যাত্রীরা এখানে থাকতে আসেন, তাঁরা ঘুরে ঘুরে তীর্থগুলি দেখেন—আকাশগঙ্গা পাপবিনাশম বৈকুণ্ঠতীর্থম পাণ্ডবতীর্থম জাবালিতীর্থম—এই সব নামের অনেক তীর্থ আছে চারি ধারে। দৃশ্য ভাল। আর মন্দিরে আসবার পথে একটা বড় বাড়ির মধ্যে অসংখ্য নাপিত অবিরত যাত্রীদের মাথা মুড়িয়ে দিচ্ছে।

এর পর সাধুজী দেবতার গায়ে কর্পূর মাখানোর গল্প বললেন। সে অনেক দিনের পুরনো ঘটনা। এক বুড়ো ব্রাহ্মণ ঠিক করেছিলেন যে নিজে পরিশ্রম করে এই মন্দিরের জন্য একটি পুকুর কাটবেন। তারপর একা সেই পুকুর কাটতে শুরু করেন, আর তাঁর ব্রাহ্মণী মাটি বয়ে নিয়ে যেতে থাকেন। ব্রাহ্মণীর খুব কষ্ট হচ্ছিল, তবু তিনি কাজ করছিলেন মুখ বুজে। হঠাৎ ব্রাহ্মণ দেখলেন যে একটা লোক মাটি বইবার কাজে ব্রাহ্মণীকে সাহায্য করেছে। ব্রাহ্মণ ভাবলেন যে তাঁদের পুণ্যে লোকটা ভাগ বসাতে এসেছে। এই ভেবে লোকটার কপালে শাবল দিয়ে আঘাত করলেন। লোকটা পালিয়ে গেল, কিন্তু পরে ব্রাহ্মণ মন্দিরে গিয়ে দেখলেন যে দেবতার কপাল ফেটে রক্ত ঝরছে। লোকটার যেখানে তিনি আঘাত করেছিলেন, দেবতার সেইখানেই গেছে ফেটে। হায় হায় করে উঠলেন ব্রাহ্মণ, আর আকুল হয়ে বিগ্রহের কপালে কর্পূর মাখালেন আরামের জন্য। দেবতা নিজেই যে

ভক্তদের সহায্যে করতে এসেছিলেন, তাতো তিনি বুঝতে পারেন নি!

তিনি আরও একটি গল্প বললেন। বৈষ্ণবাচার্য রামানুজ যখন এখানে বাস করতেন, তখন এই মূর্তি দেখে বিষ্ণু না শিব সে কথা বুঝতে যাত্রীদের কষ্ট হত। দেবতার হাতে শঙ্খচক্র গদাপদ্ম ছিল না। তার এক হাত ছিল কোমরে, আর এক হাতে বরাভয়, তার উপরে ভুজঙ্গ বলয়। ভক্তরা দ্বিধায় পড়ত। এই অসুবিধা দেখে রামানুজ এক দিন রাতে একটি শঙ্খ ও চক্র দেবতার সামনে রেখে প্রার্থনা করলেন যে দেবতা নিজেই যেন সন্দেহ ভঞ্জন করেন। লোকের বিশ্বাস যে রামানুজের কথা দেবতা শুনেছিলেন। সেই রাতেই তিনি শঙ্খ ও চক্র নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন।

সাধুজী থামতেই গুরুজী বললেন: আজ এই পর্যন্তই থাক।



সকালবেলায় বাগানে কাজ করতে করতে পাধ্যে বললেন: কাল আমার ভারি আশ্চর্য লাগছিল সাধুজীর কথায়। যে সব তীর্থের কথা তিনি বললেন, তার অনেক নাম আমার জানা ছিল না।

আমি বললাম: সে বোধ হয় আমাদের অজ্ঞতার জন্য। দক্ষিণভারত সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ।

কিছুক্ষণ পরে পাধ্যে আবার বললেন: উত্তর ভারতের সঙ্গে কি তার এতই প্রভেদ! এখানে এক একটা রাজ্যে দু একটির বেশি তীর্থস্থান নেই, কিন্তু দক্ষিণ ভারত মনে হচ্ছে তীর্থেরই দেশ!

আমি বললাম: দক্ষিণভারতের কথা তো সবে শুরু হয়েছে। অন্ধের পরে তামিলনাড়ু আছে, কর্নাটক কেরালা আছে।

তা তো আছেই এবং তীর্থস্থানও নিশ্চয়েই অনেক আছে।

ঠিক এই সময়ে চেনুলু যাচ্ছিল বাগানের পাশ দিয়ে। তাকে দেখতে পেয়েই পাধ্যে বললেন: শোন। কাল যে সব তীর্থের কথা শুনলে, তার মধ্যে কটা তীর্থ তুমি দেখেছ?

একটা।

বলে চেনুলু চলে যাচ্ছিল। কিন্তু পাধ্যে তাকে হেঁকে বললেন: দাঁড়াও। বোধ হয় একটু বেশি জোরে বলেছিলেন এই কথা। চেনুলু থমকে দাঁড়াল,

আর দূরে থেকে হেসে উঠল সুপ্তি। পাধ্যে বেশ বিরক্ত হলেন, কিন্তু তাকে কিছু না বলে চেনুলুকেই জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কোন্ তীর্থটি দেখেছ ?

চেনেলু বলল ঃ তিরুপতি।

আর সব তীর্থ ?

নাম শুনেছি মল্লিকার্জুন আর ভদ্রাচলমের। কিন্তু দুর্গম বলে যাই নি।

বলে সামনে ফুলের বাগানের দিকে এগিয়ে গেল।

কাজ করতে করতে পাধ্যে বললেন ঃ ছোকরা মিথ্যে এই আশ্রমে এসে জুটেছে। কিছু শোনবার শেখবার বা ভাববার যার আগ্রহ নেই, তাকে এখান থেকে দূর করে দেওয়া উচিত।

বলে হাতের খুরপিটা এমন ভাবে চালালেন যে একটা চারা গাছ প্রায় উপড়ে ফেললেন। আমি হাসলাম তাঁর রাগ দেখে। আর আমার হাসির শব্দ শুনে ভদ্রলোক আরও ক্ষেপে গিয়ে বললেন ঃ সারা দিন খুনসুড়ি করছে ঐ মেয়েটার সঙ্গে। তাউজী যেন দেখেও দেখেন না। দুজনকেই শাসন করা উচিত।

দণ্ডপাণির কাছে আমরা আসল খবর পেলাম। তিনি বললেন ঃ দক্ষিণ ভারতীয়দের কাছে মন্দির হল ক্লাবের মতো। সারা দিন কাজকর্ম করে আপনারা ক্লাবে যান, আমরা যাই মন্দিরে। আমাদের পোষাক আশাকও তো দেখেছেন, একখানা আট হাত ধুতি দুভাঁজ করে লুঙ্গির মতো পরে তার ওপরে একটা সার্ট আর পায়ে এক জোড়া চটি। বয়স্ক যারা তারা জামার বদলে কাঁধে একখানা চাদর নিয়ে চলে, পায়ে চটিরও দরকার হয় না। এই পোষাকে কোন অসম্ভ্রম নেই, কেউ লজ্জা পায় না এই পোষাকে চলতে। প্যান্ট কোট পরেই বরং লজ্জা করে অনেকের।

আমাদের বিস্ময় লক্ষ্য করে তিনি বললেন ঃ বড় শহরের কথা বলছি না। সেখানে সব রকমই দেখতে পাবেন। আমি বলছি ছোটখাট শহর বা গ্রামের কথা। আর এই নিয়ম বড় বড় মন্দিরেও দেখতে পাবেন। লোকে ধুতির লুঙ্গি পরে খালি গায়ে খালি পায়ে মন্দিরে আসছে যাচ্ছে। এটাই স্বাভাবিক। কাউকে অন্য পোষাকে দেখলে আমরা তাকে দক্ষিণ ভারতীয় ভাবি না।

পাধ্যে বললেন ঃ আমি তীর্থ স্থানের কথা বলছিলাম।

দণ্ডপাণি তখনই বললেন ঃ আমি তীর্থের কথাতেই আসছি। দক্ষিণ ভারতীয়রা পোষাকে আশাকে যেমন ভারতীয়, মনে প্রাণেও তেমনি। সারা দিনের কর্মক্লান্ত নরনারী এখনও সন্ধ্যা বেলায় মন্দিরে গিয়ে সমবেত হয়, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শোনে, স্তোত্রপাঠ শোনে, আরতি দেখে, দেবস্থানের শান্তি নিয়ে ঘরে ফেরে। গ্রাম একটু সমৃদ্ধ হলেই গ্রামবাসীর একটি মন্দির চাই।

যত সমৃদ্ধ গ্রাম, মন্দির তত বড়। প্রথমে একটি ছোট মন্দির তৈরি হয়, তারপরে প্রাঙ্গণ ও প্রাকার তৈরি হয়, সব শেষে গোপুর। ভক্তি দিয়ে দেবতাকে যত জাগ্রত করা সম্ভব হয়, তার মন্দিরও হয় তত সমৃদ্ধ। দেশের রাজা ও ধনীর কাছ থেকেও এসেছে অকৃপণ দান।

আমি বললাম : ভক্তি দিয়ে কি দেবতাকে জাগ্রত করা যায় ?

দণ্ডপাণি বললেন : ঢাক ঢোলের শব্দে তো দেবতা জাগেন না, দেবতা শুধু ভক্তির ডাকেই জাগেন। যে দেবতা অনেকের ডাক শোনেন, তাঁকেই আমরা জাগ্রত দেবতা বলি। আমাদের ভক্তির মূলে হল বিশ্বাস।

পাধ্যে এসব কথা নিয়ে আলোচনা করলেন না, তিনি একটি প্রশ্ন করলেন সরাসরি : অন্ধ্রে যে এত সব তীর্থ আছে, আপনি তা জানতেন ?

দণ্ডপাণি বললেন : কিছু নাম জানতাম। কিন্তু এই জানাজানির ব্যাপারে একটা কথা আমাদের জানতে হবে। সেটি হল দক্ষিণের সাম্প্রদায়িকতা। মানে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণের ভেদ, আবার বৈষ্ণব ও শৈবের ভেদ। কপালে ফোঁটা তিলক কেটে তাঁরা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের বিজ্ঞাপন দেন। শৈবরা বৈষ্ণব তীর্থ সম্বন্ধে কম জানেন, আবার বৈষ্ণবরা শৈব তীর্থ মাড়ান না। সাধুজীর কাছে নাল্লামালাই পাহাড়ের যে চারটি তীর্থের কথা শুনলেন, তার দুটি শৈব ও দুটি বৈষ্ণব তীর্থ। নাণ্ডিয়াল স্টেশনে নেমে শৈবরা মহানন্দী যান, আর বৈষ্ণবরা যান অহোবলম। শৈবরা নবনন্দী করেছে বলে বৈষ্ণবরাও নরসিংহের নবরূপ করেছে। কিংবা উল্টোটাও হতে পারে—বৈষ্ণবদের নবরূপ দেখেই শৈবরা নবনন্দী স্থাপন করেছে। চেঞ্চুদের নিয়ে গল্প আছে দুদলেরই। তেমনি তিরুপতি ও মল্লিকার্জুন। তিরুপতি কোন্ দেবতার মন্দির ছিল কে জানে, শিব না সূর্যের তা জানার উপায় নেই। শিবের দণ্ডায়মান মূর্তি আমরা দেখি না, তবে বিগ্রহের হাতে ভুজঙ্গবলয় দেখেই পুরাকালে শিবের মূর্তি বলে সন্দেহ করত। ভুজঙ্গ শিবেরই দেহের অলঙ্কার। কিন্তু সাধুজীর কাছে তো শুনলেন যে রামানুজ এসে এই সন্দেহ দূর করলেন। আট নশো বছর আগের ঘটনা। দেবতা তো শঙ্খচক্র নিজের হাতে তুলে নেন নি, বৈষ্ণব রামানুজই তুলে দিয়েছিলেন। এর পর থেকেই তিরুপতি বৈষ্ণবদের তীর্থ হয়ে গেল, আর শৈবরা রইল দূরে কালহস্তী আর শ্রীশৈলমে।

আমার ইচ্ছা হল দণ্ডপাণি শৈব না বৈষ্ণব তা জানবার কিন্তু সাধারণ সৌজন্যে সে প্রশ্ন করতে পারলাম না। দণ্ডপাণি বললেন : দেখি, তামিল-নাড়ুর তীর্থ সম্বন্ধে সাধুজী কী বলেন !

বলে নিজের কাজে চলে গেলেন। আর আমরা নিঃশব্দে আমাদের কাজ করতে লাগলাম।



সন্ধ্যাবেলায় উপাসনার মন্দিরে এসে সাধুজী আজ একটি নূতন দেবতার নাম করলেন। নূতন দেবতা বলব না। দেবসেনাপতি কার্তিককে আমরা দেবতা বলে মানি। দুর্গার সঙ্গে আছেন লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক ও গণেশ। লক্ষ্মী সরস্বতীর পূজা হয় বাংলার ঘরে ঘরে, সিদ্ধিদাতা গণেশের পূজা বিহিত হয়েছে সর্বাগ্রে। কার্তিকের পূজাও যে হয় না তা নয়, ভাদ্রে বিশ্বকর্মা পূজার মতো কার্তিকেরও পূজা হয় কার্তিক মাসে। কিন্তু তবু মনে হয় যে কার্তিক যেন প্রথম সারির দেবতা নন। এঁর মন্দির নেই, নিত্য পূজার বিধি নেই শিব পূজা বা নারায়ণ পূজার মতো। ময়ূরবাহন কার্তিক বাঙালীর কাছে রূপবান পুরুষের প্রতিমূর্তি। কার্তিকের মতো রূপ বলে আমরা ব্যঙ্গোক্তি করি, যেমন বলি গণেশের মতো পেট। কিন্তু সাধুজী আজ প্রথমেই বললেনঃ তামিলনাড়ুতে আমরা কার্তিককে প্রধান দেবতাদের অন্যতম বলে দেখি। বিষ্ণু ও শিবের মতো কার্তিকও নানা তীর্থে সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন। শুধু কার্তিকের জন্যই তীর্থ হয়েছে এমন স্থানেরও অভাব নেই।

আমরা সকলেই আশ্চর্য হয়েছিলাম এই কথা শুনে। কিন্তু সাধুজী বললেনঃ কার্তিক এ দেশে নানা নামে পূজিত হচ্ছেন। ওয়ালটেয়ার শহর এখন বিশাখাপত্তনম নামে পরিচিত, বিশাখ হল কার্তিকের নাম। পুরাকালে যেখানে বিশাখস্বামীর মন্দির ছিল, সে মন্দির এখন সমুদ্র গর্ভে। কার্তিক বা কার্তিকেয়র সব চেয়ে প্রিয় নাম হল সুব্রহ্মণ্যম, এই নামেই তিনি বেশি পরিচিত। অন্য নাম কুমারন, ষন্মুখম আড়ুমুখম বা মুরুগন। কার্তিক শিবের কনিষ্ঠ পুত্র। শৈবরাই কার্তিক পূজা করেন।

গুরুজীর কাছে আমরা কার্তিকের জন্ম রহস্য শুনেছি। কিছু অলৌকিক আর কিছু রহস্যে আবৃত সেই কাহিনী। কার্তিককে অগ্নির পুত্র বলে মনে হয়েছে, আবার বলা হয়েছে যে তা অগ্নিরূপী রুদ্র। রুদ্রই শিব। দেবতারা শিবের তপস্যা করে তারকাসুর বধের জন্য কার্তিককে লাভ করেছিলেন। কার্তিক দেবসেনাপতির পদে বৃত হয়েছিলেন অসুর বধের জন্য। শক্তির আধার

তিনি। দক্ষিণ ভারতীয়রা তাই কার্তিকের পূজা প্রচলন করেছেন সারা দেশে।

সাধুজী বললেন : তিরুপতি থেকে যে ট্রেন মাদ্রাজে যায়, সেই ট্রেন তিরুত্তানি নামে একটি ছোট স্টেশনে দাঁড়ায় অল্পক্ষণ। স্টেশন ছোট, কিন্তু তীর্থস্থান বড়। কার্তিকের বিখ্যাত মন্দির আছে এইখানে। দক্ষিণের লোক এই তীর্থটি উপেক্ষা করে না। ভোরবেলায় তিরুপতির বেঙ্কটেশ্বর দর্শন করে রেনিগুণ্টায় সকালের গাড়ি ধরলে এখানে নেমে এখান থেকে বিকেলের গাড়ি ধরা যায়। মাদ্রাজ থেকেও সকালে বেরিয়ে বিকেলে ফিরে যাওয়া যায়। দূরত্ব হবে মাইল পঞ্চাশেক। স্টেশন থেকে মন্দির মাইল খানেকের মধ্যেই। কিন্তু একটা পাহাড়ের উপরে উঠতে হয়। খুব উঁচু পাহাড় নয়, তিনশো পঁয়ষট্টি ধাপ সিঁড়ি ভাঙলেই উপরে পৌঁছনো যায়। এক একটা ধাপ হল বছরের এক একটা দিন। কার্তিক মাসের পূর্ণিমায় সুব্রহ্মণ্যস্বামীর মন্দিরে একটা উৎসব হয়। এই উৎসব দেখে নাকি মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়।

সাধুজী বললেন : তামিলনাড়ু রাজ্যে সুব্রহ্মণ্যের আরও অনেকগুলি মন্দির আছে। তার মধ্যে খুবই বিখ্যাত হল পালনি ও তিরুচেন্দুরের মন্দির। পালনি পাহাড়ের মন্দির আমি দেখি নি, দেখেছি তিরুচেন্দুরের সুন্দর মন্দির। কন্যাকুমারীর চেয়েও এই মন্দিরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বেশি। কন্যাকুমারীর মন্দির তো দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। সমুদ্র থেকে মন্দির দেখা যায় না, মন্দির থেকেও দেখা যায় না সমুদ্র।

ভাউজী বললেন : এই সব তীর্থের কথা বলবেন তো ?

সাধুজী সহাস্যে বললেন : বলব।

তারপরেই বললেন : মাদ্রাজ কোন তীর্থস্থান নয়। কিন্তু দুটি বড় মন্দির আছে—পার্থসারথি কৃষ্ণের মন্দির, আর কপালিশ্বর শিবের মন্দির। তীর্থযাত্রীরা তাই অনেক সময়েই মাদ্রাজে না গিয়ে তিরুত্তানি থেকে মাদ্রাজের পথে আর্কোনাম নামে একটি বড় জংসন স্টেশনে নেমে কাঞ্চীপুরমের ট্রেন ধরেন। মাদ্রাজ থেকেও কাছে বলে বাসেও যাতায়াত করা সুবিধের।

মোক্ষদায়িকা সপ্ত তীর্থের অন্যতম এই কাঞ্চী খুব প্রাচীন তীর্থ। অনেক পুরনো মন্দির আছে এই শহরে। মন্দিরের স্থাপত্যকলাও এমন ঐশ্বর্যময় যে যাত্রীরা সে সব মনোযোগ দিয়ে দেখেন। কাঞ্চীপুরম মানে কাঞ্চনপুর বা সোনার শহর। একে অনেকে দক্ষিণ কাশীও বলেন। দক্ষিণ কাশী অনেক। কেউ কুম্ভকোনামকে দক্ষিণ কাশী বলেন, কেউ তিরুবিল্লমলয়কে। ত্রিবেন্দ্রাম যাবার পথে তেনকাশী নামে একটি স্টেশন আছে, তেনকাশী মানেও দক্ষিণ কাশী। এ অঞ্চলে দক্ষিণ মথুরা আছে, দক্ষিণ দ্বারকা আছে, দক্ষিণ মক্কাও আছে। মাদুরাকে আমরা দক্ষিণ মথুরা বলি, মন্নারগুড়িকে দক্ষিণ

দ্বারকা, আর দক্ষিণ মক্কা বলি মহিসুরের বুদনকে। অনেক শহরের ইংরেজী নামও আছে। যেমন কুম্ভকোনামের নাম কেম্‌ব্রিজ অব ইণ্ডিয়া ও মাদুরার নাম এথেন্স অব ইণ্ডিয়া।

সাধুজী একটু থেমে বললেন ঃ এই কাঞ্চী যে কত কালের পুরনো শহর তার হদিস পাওয়া যায় নি। তন্ত্রে কাঞ্চীর উল্লেখ আছে বলে শুনেছি। ঐতিহাসিক প্রমাণেও এই শহরটি খুব প্রাচীন। গৌতম বুদ্ধ নাকি এই নগরবাসীকে ধর্মান্তরিত করেছিলেন। তারপরে সম্রাট অশোক এই শহরের চারি ধারে অনেক স্তূপ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। ভারতের প্রথম কূটনৈতিক পণ্ডিত চাণক্য বা কৌটিল্যের জন্ম হয়েছিল এই শহরে। আর তামিল ভাষার রামায়ণ রচয়িতা কবি কাম্বার বাস করতেন এই কাঞ্চীতে। শিব কাঞ্চীর একাম্বরনাথ থেকে তাঁর নাম হয়েছিল কাম্বর।

কাঞ্চীপুরম শহরে তিনটি কাঞ্চী আছে—শিব কাঞ্চী বিষ্ণু কাঞ্চী ও বেগবতী নদীর দক্ষিণে জৈন কাঞ্চী। বাস স্ট্যাণ্ডে নেমেই মন্দির পরিক্রমা শুরু করতে হয়। সব চেয়ে নিকটে চিত্রগুপ্তের মন্দির। চিত্রগুপ্ত হলেন যমরাজের পেশকার। সমগ্র দক্ষিণ ভারতে তাঁর একটি মাত্র মন্দির। একটুখানি এগিয়ে সাঙ্গুপানি বিনায়কের মন্দির। কাশীতে যেমন ঢুণ্ডি গণেশ, কাঞ্চীতে তেমনি সাঙ্গুপাণি বিনায়ক। এখান থেকে মিনিট তিনেক উত্তরে হাঁটলে ধলগলিও পেরুমলের মন্দির। দেবতা এখানে বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম বামন মূর্তি প্রায় ষোল হাত উঁচু। এই মূর্তিই তিন পায়ে ত্রিভুবন অধিকার করেছিলেন।

বামন অবতারের মূর্তির কথা আমি এই প্রথম শুনলাম। গুরুজীর কাছে আমরা এই গল্প শুনেছি। অসুররাজ বলি যজ্ঞ শেষ করে ব্রাহ্মণদের দান করছেন। সেই সময়ে বিষ্ণু এলেন বামন রূপে, বলির কাছে ত্রিপাদ ভূমি চাইলেন। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য বিষ্ণুর ছলনা বুঝতে পেরে বলিকে সতর্ক করেছিলেন, কিন্তু বলি সত্যভ্রষ্ট হতে চান নি, বামনের প্রার্থনা পূরণে রাজী হয়েছিলেন। তারপর বিষ্ণু সেই বিরাট মূর্তি ধারণ করে এক পায়ে পৃথিবী আর এক পায়ে আকাশ অধিকার করলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, আমার তৃতীয় পা আমি কোথায় রাখব? বলি বললেন, আমার মাথায়। বিষ্ণু তাই করলেন, বলি নির্বাসিত হলেন পাতালে। দেবতারা ফিরে পেলেন তাঁদের স্বর্গরাজ্য।

সাধুজী তারপরে কামাক্ষী আম্মান মন্দিরের কথা বললেন। সেখানে আছে আচার্য শঙ্করের কামকোটি পীঠ। আদি শঙ্করের একটি ছোট মন্দিরও আছে। তারপরে কুমার কোট্টমে। এটি সুব্রহ্মণ্যম বা কার্তিকের মন্দির। কার্তিককে সেখানে সৃষ্টিকর্তা রূপে কল্পনা করা হয়েছে। ব্রহ্মাকে তিনি

শিক্ষা দেবার জন্য বন্দী করেছিলেন এবং সৃষ্টির কাজ নিজের হাতে নিয়েছিলেন। শিব এসে রক্ষা করেন ব্রহ্মাকে, আর ব্রহ্মা কার্তিকের পূজো করেছেন এই কুমার কোট্টমে। ছোটখাট মন্দির আরও অনেক আছে।

বড় মন্দির হল শিব কাঞ্চীর একাম্বর নাথের মন্দির। বড় রাস্তা থেকে ডান দিকে মোড় নিলেই মন্দিরের বিরাট গোপুর চোখে পড়ে। দশ তলা এই গোপুরটি একশো অষ্টআশি ফুট উঁচু। দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্যের খাঁটি নিদর্শন। তার সামনে একটি ষোলস্তম্ভের মণ্ডপ। এ সব পেরিয়ে মন্দিরের প্রাঙ্গণে ঢুকতে হয়। আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে হাজার স্তম্ভের মণ্ডপ। স্তম্ভ এখন আর নেই। এখন মাত্র পাঁচশো চল্লিশটি থাম আছে।

সাধুজী একটু থেমে বললেন : কাঞ্চীপুরের লোক বলে যে সেখানকার একাম্বরনাথ হলেন পঞ্চভূতের ক্ষিতি লিঙ্গ। শিবলিঙ্গটি বালির তৈরি, তাই জলে শিবের অভিষেক হয় না। তেল আর মধু দিয়ে শিবের অভিষেক করতে হয়। এই একাম্বরনাথ দর্শনে কাশীর বিশ্বনাথ দর্শনের পুণ্য হয়। দেবী হলেন কামাক্ষী। তবে ইনি এখন নকল, আসল কামাক্ষী দেবী আছেন তাঞ্জোরে। হায়দার আলির সঙ্গে যুদ্ধের সময় দেবীকে তাঞ্জোরে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। তাঁকে আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয় নি। এখানে তাই নকল কামাক্ষী দেবীর প্রতিষ্ঠা হয়েছে। একাম্বরনাথকেও মাদ্রাজে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, কিন্তু শোনা যায় যে রবার্ট ক্লাইব একাম্বরনাথকে ফিরিয়ে এনে এই মন্দিরে আবার প্রতিষ্ঠা করেছেন।

একাম্বরনাথ নাম কেন হল, তার সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। এই মন্দির প্রাঙ্গণে নাকি একটি প্রাচীন আম গাছ আছে, সেই গাছে চার রকম স্বাদের ফল হত—টক মিষ্টি কটু ও তেতো। এর মানে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ফল। কিন্তু একটি করে আম প্রতি দিন পাকত আর সেই আমটি দেওয়া হত শিবের ভোগে। এক আম্র থেকে একাম্রনাথ, চতুর্বর্গ ফলদাতা তিনি।

দক্ষিণের সকল মন্দিরে দেবতার ভোগমূর্তি বা উৎসব মূর্তি থাকে। উৎসবের সময় এই মূর্তিটি রথে পাল্কীতে বা নৌকোয় চাপিয়ে ঘোরানো হয়। একাম্বরনাথেরও একটি ভোগমূর্তি আছে, পার্বতী তাঁকে আলিঙ্গন করে আছেন। এই নিয়ে একটি গল্প প্রচলিত আছে। পার্বতী এক দিন খেলাচ্ছলে শিবের চোখ দুহাতে চেপে ধরেছিলেন। শিবের ত্রিনয়ন হল চন্দ্র সূর্য ও অগ্নি। এই তিনটি চোখ ঢাকা পড়তেই পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেল। শিব অসন্তুষ্ট হয়ে পার্বতীকে ত্যাগ করলেন। তপস্যায় আবার শিবকে সন্তুষ্ট করবার জন্য পার্বতী কাঞ্চীতে এসে নদীর তীরে বালি দিয়ে লিঙ্গমূর্তি তৈরি করে শিবের পূজায় নিমগ্ন হলেন। শিব পার্বতীর ভক্তি পরীক্ষার

জন্য নদীকে বললেন বন্যার মতো প্রবাহিত হতে, কিন্তু পার্বতী সেই বন্যা দেখে ভয় পেলেন না। দু হাতে আঁকড়ে ধরলেন শিবলিঙ্গ। নদী আর বইতে পারল না, স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দূরে। এই মূর্তিই একাম্বরনাথের ভোগমূর্তি।

কামাক্ষী দেবীর সামনে যে শ্রীচক্র সেটি শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠা করেছেন বলে লোকের বিশ্বাস। একটি ছোট মন্দির আছে শঙ্করাচার্যের, তাঁর সমাধি এইখানে। কাঞ্চীর লোকেরা দাবী করে যে শঙ্কর এই মন্দিরে দেবীর পূজার্চনা করে তাঁর শেষ জীবন কাটিয়েছেন।

সাহেবদের হিসাবে কাঞ্চীতে এক হাজার শিব মন্দিরে দশ হাজার শিব-লিঙ্গ ছিল। এখনও কম করে একশো চল্লিশটা মন্দির আছে।

তাউজী সবিস্ময়ে বললেন : এত মন্দির আপনি দেখেছেন ?

সাধুজী সহাস্যে বললেন : না। কৈলাসনাথের মন্দির থেকে আমি বিষ্ণুকাঞ্চী চলে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে দেখেছিলাম বৈকুণ্ঠ পেরুমল মন্দির। কৈলাসনাথের মন্দির যেন অন্য জাতের মন্দির। আকাশ ছোঁয়া গোপুর নেই সামনে, বিমানটি পিরামিডের মতো চৌকো। কিন্তু মণ্ডপ আর অন্তরল আছে। প্রাকার দিয়ে ঘেরা একটি বড় এলাকার মধ্যে ছোট ছোট অনেকগুলি মন্দির। নানা দেবদেবীর মূর্তি আছে তাতে।

শিবকাঞ্চী থেকে বিষ্ণুকাঞ্চীর দূরত্ব হবে দু তিন মাইল। এই পথে বাস যাতায়াত করে। ট্যাক্সি সাইকেল ও টাঙ্গাও পাওয়া যায়। দুই কাঞ্চীর মধ্যে কোন ছেদ নেই, প্রশস্ত রাজপথের দুধারে ঘরবাড়ি দোকানপাট ও ছোট ছোট মন্দির। যাত্রীরা বরদরাজ স্বামীর মন্দিরের দরজায় এসে নামে। এ মন্দিরের প্রাঙ্গণও অতি প্রশস্ত। সামনে একটি উঁচু মণ্ডপ, অপরূপ তার কারুকার্য। সাততলা গোপুর। একাম্বরনাথের মন্দিরের মতো এ মন্দির খোলামেলা নয়। বিষ্ণুর নৃসিংহমূর্তি দেখবার পরে লক্ষ্মীর মন্দির দেখতে অনেকটা ঘুরে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে হয়। মূল মন্দিরে বিষ্ণুর চতুর্ভুজ মূর্তি নানা অলঙ্কার শোভিত। নিচে নেমে তাঁর ভোগ-মূর্তি দেখতে হয়। বোঝা যায় না যে বরদরাজ স্বামীর মূর্তি নগ্ন। এই নিয়ে একটি কাহিনী আছে প্রচলিত। ব্রহ্মা যজ্ঞ করবার জন্য এই স্থান নির্বাচন করেছিলেন। সরস্বতী নারদের মুখে এই কথা শুনলেন। ব্রহ্মা তাঁকে খবর দেন নি বলে ক্রুদ্ধ হয়ে এই যজ্ঞ স্থল ভাসিয়ে দেবেন বলে তিনি নদীরূপে প্রবাহিত হলেন। ব্রহ্মা প্রমাদ গুণে স্মরণ নিলেন বিষ্ণুর। বিষ্ণুকে দেখে সরস্বতী অন্তঃসলিলা হয়ে প্রবাহিত হলেন। বিষ্ণু আর উপায় না দেখে নগ্ন হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলেন নদীতে। সেই নগ্ন মূর্তি দেখে লজ্জিত সরস্বতী থমকে দাঁড়ালেন। ব্রহ্মার যজ্ঞ সমাপ্ত হল, আর

বিষ্ণু সেই নগ্ন মূর্তিতে বরদরাজ স্বামী নামে এইখানেই রয়ে গেলেন।

সকলের শেষে সাধুজী বৈকুণ্ঠ পেরুমল মন্দিরের কথা বললেন। কাঞ্চীর অনেক মন্দিরে এখন আর পূজা হয় না। কিন্তু এই মন্দিরে এখনও বিষ্ণুর পূজা হচ্ছে। অনেক পরবর্তী কালের মন্দির এটি, এর পরিকল্পনা তাই অনেক পরিণত বুদ্ধির। উত্তর ভারতের কাশীর মতো দক্ষিণ ভারতের কাঞ্চীও একটি মন্দিরের শহর। এত মন্দির আর কোন শহরে নেই।



সাধুজী বললেন: পক্ষীতীর্থ যাত্রীদের একটি প্রিয় তীর্থ। কাঞ্চীপুর থেকে দক্ষিণে যাবার পথে চিঙ্গলপুট জংশনে নেমে পক্ষীতীর্থ ও মহাবলী-পুরম যেতে হয় বাসে। মাদ্রাজ থেকেও বাস যাতায়াত করে। একটি পাহাড়ের নিচে তিরুক্কলুকুন্রম ছোট শহর। মন্দিরে উঁচু গোপুর আছে। কিন্তু আসল মন্দির পাহাড়ের উপরে, টিকিট কেটে উঠতে হয়। পাঁচশো সাঁইত্রিশটি সিঁড়ি আছে বলে যাত্রীরা শিবের দর্শনের জন্য ওঠে না, ওঠে পাখি দেখতে। পক্ষীতীর্থের পাখি চিলের মতো বড় কিন্তু ধবধবে সাদা। পুরোহিতের হাত থেকে রোজ ভোগ খেতে আসে নির্দিষ্ট সময়ে। গত কয়েক শতাব্দী ধরে যে কাহিনী লোকের মুখে মুখে চলে আসছে তাতে জানা যায় যে এই পাখিরা শাপভ্রষ্ট ঋষি। তাঁরা কাশীর গঙ্গায় স্নান করে পক্ষীতীর্থে আসেন খাবার জন্য, তারপর রামেশ্বরে পূজার্চনা করে চিদম্বরমে বিশ্রাম করেন।

তাউজী জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি দেখেছিলেন এই পাখি?

সাধুজী বললেন: দেখেছিলাম। বেলা তখন বোধ হয় এগারটা হবে। বহু যাত্রী এসে সমবেত হয়েছিল পাখি দেখবার জন্য। হঠাৎ কলরব শুনে পুরোহিতের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে একটা মস্ত সাদা পাখি পাখা ঝটপট করে এগিয়ে আসছে পুরোহিতের দিকে। বুড়ো পাখি, উড়বার যেন ক্ষমতা নেই, কোন রকমে একটু একটু করে নিচে থেকে উপরের দিকে উঠছে ভোগ খেতে। নিন্দুকেরা বলে যে পাখিকে বশ করা হয়েছে আফিং

খাইয়ে। ভোগের সঙ্গে আফিং মেশানো থাকে বলে নেশার জন্যেই পাখি আসে নির্দিষ্ট সময়ে।

এর পরে সাধুজী বললেন চিদম্বরমের কথা। সহাস্যে বললেন: দক্ষিণ ভারতের আর কোথাও যা নেই, তা আছে চিদম্বরমে—একই মন্দিরের প্রাঙ্গণে শিব ও বিষ্ণুর মূর্তি আছে। এক দিকে নটরাজ শিবের মন্দির, অন্য দিকে গোবিন্দরাজ বিষ্ণুর মন্দির। দুটি নদীর মাঝখানে বত্রিশ একর জমির উপরে অবস্থিত এই নটরাজ মন্দির। ভিতরের প্রাকারে চারটি গোপুর। তার দুটির গায়ে নাট্য শাস্ত্রের একশো আট ভঙ্গি খোদাই করা আছে। প্রাঙ্গণে আছে কারুকার্য মণ্ডিত পাঁচটি সভা—রাজ সভা ও দেব সভা, চিৎ সভা কনক সভা ও নৃত্য সভা। এক হাজার স্তম্ভের বিরাট রাজসভায় নাকি রাজারা পুরাকালে বিজয়ের উৎসব করতেন। চিৎসভায় শিবের আকাশ লিঙ্গ, অর্থাৎ এখানে তিনি সম্পূর্ণ নিরাকার। একটি রত্নহার দিয়ে এই নিরাকার লিঙ্গের স্থান নির্দেশ করা হয়েছে। তার সামনে একটি পর্দা ঝোলানো থাকে, প্রয়োজন মতো সেটা সরিয়ে নেওয়া হয়। কনক সভায় নটরাজের মূর্তি, আর নৃত্য সভাটি একটি রথের আকারে নির্মিত। মোটের উপরে এই মন্দিরের সর্বত্র—মণ্ডপে স্তম্ভে গোপুরমে—একটা নৃত্যের আবহাওয়া লীলায়িত হয়ে উঠছে।

সাধুজী বললেন: এ লাইনে তীর্থস্থানের অভাব নেই। কোনটা ছোট, কোনটা বড়, আবার এক একজনের কাছে এক একটা বড়। মায়াভরমের বর্তমান নাম মযূরম, তীর্থস্থান হিসাবে কিছু খ্যাতি আছে। কাবেরী নদীর তীরে শহর, কার্তিক মাসে তুলা কাবেরীর মেলা একটি বিশেষ আকর্ষণ। লোকের বিশ্বাস যে তুলা রাশিতে রবির অবস্থানের সময় গঙ্গা মিলিত হন কাবেরীতে। এখানে শিব মায়ানাথ, আর বিষ্ণু পরিমল রঙ্গনায়ক। মাইল তিনেক ব্যবধানে দুই মন্দির। মাঘ মাসে বিষ্ণু যখন কাবেরীতে স্নান করেন, তখন একমাস ব্যাপী তার উৎসব হয়।

তারপর কুম্ভকোনামের কথা। কুম্ভকোনাম বড় প্রাচীন শহর, পুরাণেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রলয়ের সময় যে কুম্ভে অমৃত রাখা হয়েছিল, তারই একটি কানা পড়েছিল মহামোক্ষম সরোবরে। বারো বছর পরে পরে তাই এখানে পূর্ণ কুম্ভের উৎসব হয়। ছোট বড় আঠারোটি মন্দির তখন যাত্রী সমাগমে মুখর হয়ে ওঠে। কুম্ভকোনামও কাবেরী নদীর তীরে। বছরে এখানে সাত আটটি মেলা বসে। উৎসবও হয় অনেকগুলি। এখানে

চক্রপাণি বিষ্ণু মূর্তির একটা বিশেষত্ব আছে। চক্রপাণি এখানে অষ্টভুজ ও ত্রিনেত্র, শিব ও বিষ্ণুর মিলিত মূর্তি।

একই নিঃশ্বাসে সাধুজী তাঞ্জোরের কথাও বললেন। সেখানকার বৃহদীশ্বরের মন্দির দুশো ষোল ফুট উঁচু। দক্ষিণ ভারতে মন্দিরের গোপুর নির্মাণের যে রীতি আছে, তাঞ্জোরেই তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। মন্দিরের চেয়ে গোপুর বড় নয়, মন্দিরই বড়। শিবগঙ্গা দুর্গের ভিতরে এই মন্দির। শিবের লিঙ্গ মূর্তি তের ফুট উঁচু, আর তাঁর নন্দী উচ্চতায় বারো ফুট। এই মন্দিরের চূড়ায় যে অখণ্ড গোল পাথরটি বসানো আছে, তার ওজন দুশো মণ। কী করে এই ভারি পাথর অত উঁচুতে উঠল, স্তম্ভিত হয়ে তাই অনেকক্ষণ ভাবতে হয়। বৃহদীশ্বরের সব কিছুই বৃহৎ।

রেলওয়ে স্টেশনের কাছেই বৃহদীশ্বরের মন্দির। হেঁটেই যাওয়া যায়, রিকসা টাঙ্গাও আছে। গোপুরের নিচে দিয়ে মন্দিরের প্রাঙ্গণে ঢুকতে হয়। চারি দিকে উঁচু প্রাকার দিয়ে ঘেরা প্রাঙ্গণ, তার মধ্যে অনেকগুলি মন্দির ও মণ্ডপ। সামনেই নন্দীর মণ্ডপ। এত বড় নন্দী যে আশ্চর্য হয়ে দেখতে হয়। মন্দিরের ভিতরে গিয়েও আশ্চর্য হতে হয়। অমরাবতীতে এর চেয়ে উঁচু শিবলিঙ্গ দেখেছি, কিন্তু তাকে শিব বলে মনে হয় নি। কিন্তু এখানকার শিব দেখে ভক্তি ও বিস্ময়ে মাথা আপনা থেকেই নত হয়ে যায়। চারি ধারে ও উপরের দিকেও চেয়ে দেখতে হয়। অজন্তার মতো চিত্র আছে দেওয়ালে ও ছাদে। অপরূপ এই সব চিত্র, মনোযোগ দিয়ে এ সব না দেখলে মন্দির দেখা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

পিছনের দিকে এগিয়ে ডান হাতে যে সুন্দর মন্দিরটি দেখা যায়, সেটা হল সুব্রহ্মণ্যের মন্দির। এর কারুকার্য ঠিক কাঠের উপরের কারুকার্যের মতো। অন্য ধারে বিনায়কের মন্দির। বৃহন্নায়কী আম্মন মন্দির ও আরও অনেক দেবদেবীর মূর্তি আছে। কাঞ্চীর কামাক্ষীদেবীর মন্দির অনেকটা দূরে। সদর রাস্তার উপরে একটি স্বতন্ত্র মন্দিরে তিনি অধিষ্ঠিত। মনে হবে যেন কাশীর বিশালাক্ষী মন্দিরে এসেছি।



সাধুজী বললেন ঃ তাঞ্জোরের কাছেই তিরুচিরপল্লী। সংক্ষেপে ত্রিচি। ত্রিচি বড় শহর, কিন্তু নিকটে শ্রীরঙ্গম ও জম্বুকেশ্বর আছে বলে তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। ত্রিচির রকফোর্টের মধ্যেও শিবের মন্দির আছে এবং পাহাড়ের মাথায় গণেশের মন্দির। ত্রিচি থেকে মাইল সাতেক দূরে শ্রীরঙ্গম। ছোট একটা স্টেশন আছে বটে, কিন্তু যাত্রীরা ত্রিচি থেকেই বাসে যাতায়াত করে। কাবেরী নদী হঠাৎ দু ভাগে বিভক্ত হয়ে শ্রীরঙ্গমকে বেষ্টন করে আছে।

কিংবদন্তী আছে যে লঙ্কার রাজা বিভীষণ শ্রীরঙ্গনাথজীর মূর্তি স্থাপন করেছেন। মন্দিরে বিভীষণের শ্রীরঙ্গনাথজীকে অর্চনার মূর্তি আছে। লোকে বলে যে এই মন্দির তৈরি হয়েছে খ্রীষ্টের জন্মের আগে। কিন্তু নাভাজীর ভক্তমাল গ্রন্থে আছে যে শ্রীরঙ্গনাথজীর দুই ভক্ত মামা আর ভাগনে স্পর্শমণি চুরি করে এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের শ্রীরামানুজ চরিতে এই বিবরণ অন্য রকম। অষ্টম শতাব্দীতে তিরুমঙ্গাই আলোয়ার একজন ভক্ত কবি নামে খ্যাতি লাভ করেন। এঁর শিষ্যদের মধ্যে চারজন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। একজন তর্কে সকলকে পরাস্ত করতে পারতেন, একজন ফুঁ দিয়ে তালা খুলতে পারতেন, একজন পা দিয়ে ছায়া স্পর্শ করে লোকের গতিরোধ করতে পারতেন, আর একজন জলের উপরে ভ্রমণ করতে পারতেন। এই তিরুমঙ্গাই শ্রীরঙ্গনাথজীর বনাকীর্ণ ভাঙ্গা মন্দিরটি সংস্কারের জন্য রাজা ও ধনীর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে ব্যর্থ হলে এই চারজন শিষ্য নিজেদের অলৌকিক ক্ষমতায় প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেন। সেকালে এই তিরুমঙ্গাই ছিলেন দেশের আসল রাজা। নিজে ভিক্ষুক থেকেও দরিদ্রের পালন ও দুষ্টের দমন করে গেছেন। পরের যুগে দক্ষিণের সমস্ত বংশের রাজারাই এই মন্দিরের শ্রীবৃদ্ধি করেছেন।

সাধুজী একটু থেমে বললেন ঃ সাতটি গোপুর পেরিয়ে মূল মন্দির। প্রথম প্রাকার একুশ ফুট উঁচু ও তার বেড় দু মাইলেরও বেশি। প্রথম গোপুর পেরিয়ে একটা শহর। বাড়ি ঘর লোকজন আছে, আছে চওড়া রাস্তা ও

বাজার হাট। আরও দুটি গোপুরের ভিতরেও এই রকম। হাজার হাজার লোক বসবাস করছে। যাত্রীদেরও থাকবার ব্যবস্থা আছে, যানবাহন আছে। এরই নাম শ্রীরঙ্গম শহর। এই প্রাকার তিনটি পেরোবার জন্যে চারিধারে চারটি গোপুর আছে। কিন্তু চতুর্থ প্রাকারে আছে তিনটি গোপুর। আর এই গোপুর ছোট নয়, প্রায় দেড়শো ফুট উঁচু। কারুকার্যও সুন্দর। মূল মন্দিরটি খুব ছোট, ওঙ্কার আকারের। উপরে যে চারটি সোনার কলস তা চার বেদের প্রতীক। চূড়ার কাছে সোনার বিষ্ণু মূর্তি। মন্দিরের প্রাঙ্গণে পাথরের গরুড় মূর্তি আর সোনার তালগাছ। ভিতরে রঙ্গনাথস্বামীর অনন্ত-শয়নে শায়িত মূর্তি, তাঁর মাথার উপরে শেষনাগ ফণা বিস্তার করে আছেন। প্রদীপের আলোয় দেবতার দর্শন করতে হয়। দেবী এখানে রঙ্গনায়কী লক্ষ্মী।

এখানেও আছে হাজার স্তম্ভের মণ্ডপ, তার নিচে বিভীষণের রত্ন। একটি বন্ধ দরজার নাম বৈকুণ্ঠ দ্বার। বৈকুণ্ঠ একাদশীতে রঙ্গনাথ স্বামীর সব চেয়ে বড় উৎসব হয়! সেদিন এই দরজা দিয়ে দেবতা শোভাযাত্রা করে বৈকুণ্ঠ ধামে যাবেন। হাজার স্তম্ভের সভামণ্ডপে আনা হবে রঙ্গনাথস্বামীকে। মন্দির প্রাঙ্গণে আরও অনেক দেবদেবী আছেন—বিষ্ণু শ্রীদেবী ভূদেবী লীলাদেবী ও গোদাদেবী। গোদাদেবীর উপাখ্যান বড় সুন্দর। মাদুরা থেকে কিছু দূরে বাস করতেন বিখ্যাত বিষ্ণুভক্ত পেরিয়া আলোয়ার। পেরিয়া অপুত্রক ছিলেন। একদিন তুলসী বনে তিনি এক কন্যা লাভ করেন, পরে এই মিষ্টভাষী কন্যারই নাম হয় গোদা। গোদা মানে মিষ্টভাষী। নারায়ণে অসীম ভক্তি ছিল গোদার। তাই বড় হয়ে বললেন যে নারায়ণ ভিন্ন আর কাউকে তিনি বিয়ে করবেন না। পেরিয়া উদ্বিগ্ন হলেন, কিন্তু তার পরেই স্বপ্নে নারায়ণের আদেশ পেলেন যে গোদা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, তিনিই তাকে বিয়ে করবেন। এ দিকে শ্রীরঙ্গমের পূজারী ব্রাহ্মণও স্বপ্নাদেশ পেলেন, গোদাকে বিবাহ সজ্জায় সাজিয়ে মন্দিরে আনতে হবে। তার পরের ঘটনা বড় অলৌকিক। শিবিকা থেকে নেমে গোদা যখন বিগ্রহের সম্মুখে এলেন, নারায়ণ দু হাত বাড়িয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। আর গোদা অদৃশ্য হয়ে গেলেন সেই বিগ্রহ মূর্তিতে। নারায়ণ পেরিয়া আলোয়ারকে দেখা দিয়ে বললেন যে আজ থেকে তুমি আমার শ্বশুর নামে খ্যাত হবে।

এ ছাড়াও আরও অনেক দেবদেবী আছেন। নৃসিংহদেব, রাম লক্ষ্মণ সীতা ও হনুমান। তামিল রামায়ণ রচয়িতা কবি কাম্বারের সমাধিও আছে। বৈষ্ণব আচার্য রামানুজ এই মন্দিরের অধ্যক্ষ ছিলেন দীর্ঘকাল এবং একশো কুড়ি বছর বয়সে এখানেই তিনি দেহরক্ষা করেন। সে প্রায় সাড়ে আটশো বছর আগের কথা।

জম্বুকেশ্বরের মন্দির এখান থেকে মাইল খানেকের বেশি দূর হবে না। শ্রীরঙ্গমে গেলে সকল যাত্রীই জম্বুকেশ্বর দেখে ফেরে। এই মন্দিরও পাঁচটি উঁচু প্রাকারে বেষ্টিত। প্রথম প্রাকারের ভিতর পথের দুধারে অনেক ঘরবাড়ি। অন্য প্রাঙ্গণগুলি ছোট। প্রাঙ্গণের কোথাও মণ্ডপ, কোথাও বা মন্দির। মূল মন্দিরের ভিতরটা ভারি আশ্চর্যের। সারাক্ষণ জল আসছে কোনখান থেকে। শিবের অপ্‌লিঙ্গ নাম এখানে সার্থক হয়েছে। ব্রাহ্মণেরা বলেন যে কাবেরীর স্রোতের সঙ্গে যুক্ত একটি কূপ আছে। এ সেই কূপের জল, প্রস্রবণের মতো সারাক্ষণ নির্গত হচ্ছে।

মন্দিরের প্রাঙ্গণে একটি প্রাচীন জাম গাছ আছে। ত্রিপুরারি নাকি এই গাছের নিচে দীর্ঘকাল তপস্যা করে জম্বুকেশ্বর নামে পরিচিত হয়েছেন। অনেকে বলেন যে পার্বতী এখনও এখানে মহাদেবের জন্য তপস্যারত। প্রাঙ্গণে তাঁরও মন্দির আছে, আর তার সামনের চাতালে মন্দিরের কাহিনী উৎকীর্ণ করা আছে চমৎকার ভাবে।

তাউজী বললেন: চারটির কথা শুনলাম, বাকি রইল একটি।

সাধুজী আশ্চর্য হয়ে বললেন: কোন চারটির কথা?

তাউজী বললেন: কাঞ্চীর ক্ষিতিলিঙ্গ, জম্বুকেশ্বরের অপ্‌লিঙ্গ, কালহস্তীর বায়ুলিঙ্গ আর চিদম্বরমের আকাশ লিঙ্গ। তেজলিঙ্গ কোথায় তা এখনও বলেন নি।

সাধুজী বললেন: অরুণাচলমে। ভিল্লুপুরম কাটপাডি লাইনে এই স্টেশন। সারা বছর যাত্রী বেশী হয় না, কিন্তু কার্তিক মাসের দীপম উৎসব একবার দেখলে সারা জীবনে আর ভোলা যায় না। পাহাড়ের নিচে মন্দির, কিন্তু গোপুরের সামনে দাঁড়িয়েই মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। চোখের সামনে অরুণাচলের অপরূপ দৃশ্য। পাহাড়ের একটি চূড়া মনে হবে যেন শিবলিঙ্গের মতো মাথা উঁচু করে আছে। চারটি বড় বড় গোপুর আর প্রাকার দিয়ে ঘেরা মন্দির। তার ভিতর নাটমন্দির সভামণ্ডপ পার্বতী ও গণেশের মন্দির। হাজার স্তম্ভের মণ্ডপও আছে সেখানে। কার্তিগাই দীপম দশ দিনের উৎসব। লক্ষ লক্ষ যাত্রী আসে। অদ্ভুত সমারোহ। আলোয় আলোয় উজ্জ্বল মন্দির, আগুনে আগুনে উজ্জ্বল পাহাড়, এর তুলনা কোথাও নেই। শিবের জন্য তপস্যা করে পার্বতী কার্তিকের এই পূর্ণিমা তিথিতে শিবের দর্শন পেয়েছিলেন একটি আগুনের শিখার মতো। সেই থেকে এই কার্তিগাই দীপম। সেদিন সুন্দর করে সাজিয়ে শিব ও পার্বতীর উৎসব মূর্তি আনা হয় মণ্ডপে। আর তখনই একটি হাওয়াই বাজী ছোঁড়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের উপরে আগুন জ্বলে ওঠে। তার জন্য আগে থেকেই ব্যবস্থা থাকে।

সাধুজী বললেন: ভক্ত কবি অরুণগিরিনাথর এইখানে বাস করতেন।

জীবনে বীতরাগ হয়ে এক দিন তিনি মন্দিরের গোপুর থেকে লাফিয়ে পড়েছিলেন। নীচে দাঁড়িয়ে সুব্রহ্মণ্য তাঁকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন। সুব্রহ্মণ্য হলেন দেব সেনাপতি কার্তিক। অরুণগিরিনাথরকে তিনি আশীর্বাদ করেছিলেন। এর পরে ষোল হাজার গান লিখলেন তিনি, তার তেরশো গান এখনও শোনা যায় লোকের মুখে মুখে। সুব্রহ্মণ্যের সঙ্গে এই কবির একটি সুন্দর মূর্তি আছে পাহাড়ের পূর্ব দিকে।

রমন মহর্ষির কথা আমি শুনেছি। এই মহাপুরুষের আশ্রম আছে এখানে, কিন্তু মহর্ষি আর নেই।



ত্রিচির পরে সাধুজী মাদুরার গল্প বললেন। ত্রিচি থেকে রামেশ্বর যাবার পথে মাদুরা, আবার রামেশ্বর থেকে কন্যাকুমারী যেতে হলেও এই মাদুরার উপর দিয়েই যেতে হয়। মাদুরা এই দক্ষিণ দেশের একটা খুব বড় শহর, মাদ্রাজের পরেই মাদুরা। আর এই মাদুরার মন্দির হল সৌন্দর্যে শ্রেষ্ঠ। কে একজন বলেছেন যে শ্রীরঙ্গমের মন্দির শ্রেষ্ঠ তার বিশালত্বে, রামেশ্বর গাম্ভীর্যে শ্রেষ্ঠ, আর সৌন্দর্যে তুলনা নেই মাদুরার মীনাক্ষী মন্দিরের। একটি দুটি নয়, নটি গোপুর আছে এই মন্দিরে। আর এই গোপুরগুলি অন্যান্য মন্দিরের মতো পাথরের রঙের নয়, বিবর্ণ হয়ে যায় নি কালি ও শ্যাওলায়। কোনটি সাদা ধবধব করছে, কোনটি আবার নানা রঙে সমুজ্জ্বল। গোপুর রঙীন নয়, রঙীন হল গোপুরের মূর্তিগুলি।

বসন্ত মণ্ডপ মন্দিরের বাহিরে একটি সুন্দর মণ্ডপ। নায়ক রাজাদের মানুষ প্রমাণ মূর্তি এই মণ্ডপে সাজানো আছে। অষ্ট লক্ষ্মীর মণ্ডপে এখন দোকান বসেছে। এই মণ্ডপে থাম নেই, তার বদলে অষ্ট ঐশ্বর্যের অধিকারিণী আটজন লক্ষ্মী এই মণ্ডপের ছাদ মাথার উপরে ধারণ করে আছেন। দরজার দু ধারে গণেশ ও কার্তিকের সুবিশাল মূর্তি। উপরের দিকে দেওয়ালের গায়ে অনেকগুলি রঙীন চিত্রে মীনাক্ষী দেবীর কাহিনীকে রূপ দেওয়া হয়েছে। পুত্র লাভের আশায় শিবের আরাধনা করে বিজয়নগরের কোন রাজা কন্যা লাভ করেছিলেন। এই কন্যার নামই মীনাক্ষী। মীনাক্ষী

মানুষ হলেন মণিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার মতো। তিনি রাজ্য পরিচালনা করেন, রণসাজে সজ্জিত হয়ে অশ্ব পৃষ্ঠে সৈন্য চালনা করেন। এক দিন সুন্দরেশ্বর শিব এলেন প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে। তাঁকে দেখে বিহ্বল হলেন দেবী মীনাক্ষী। তার পরিণতিতেই পরিণয়। মন্ত্র পড়লেন ব্রহ্মা ও নারদ, বিষ্ণু কন্যা সম্প্রদান করলেন। যথাসময়ে তাঁদের পুত্র সন্তান হল। তারই হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে দেবী ফিরে গেলেন শিবলোকে।

একটু চেষ্টা করলেই মন্দিরের পরিকল্পনাটি বুঝতে পারা যায়। স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় যে দুটি বিরাট মন্দির আছে পাশাপাশি, একটার গায়ে আর একটা, সুন্দরেশ্বর শিব ও দেবী মীনাক্ষীর মন্দির। পূর্বদ্বার দিয়ে প্রবেশ করে যদি সোজা এগিয়ে যায় তো সুন্দরেশ্বর শিবের দর্শন পাওয়া যাবে, আর ডান হাতে পড়বে হাজার স্তম্ভের মণ্ডপ। এখন এই মণ্ডপ আর্ট গ্যালারিতে পরিণত হয়েছে, দর্শনী দিয়ে ভিতরে ঢুকতে হয়। মীনাক্ষী মন্দির এরই উত্তরে, শিবের মন্দির থেকে সে মন্দিরে যাবার পথ আছে। আবার দক্ষিণের দ্বার দিয়ে ভিতরে এলে প্রথমেই পাওয়া যাবে এই মন্দির, আর প্রবেশ পথের ডান হাতেই একটি সুন্দর জলাশয়। তার চারিধারের ঘাট পাথর দিয়ে বাঁধানো। দেবতার নিকটে যাবার নিয়ম এখানে নেই। দূর থেকে দেখতে হয় দেবতাকে। দেবরাজ ইন্দ্র নাকি সুন্দরেশ্বর শিবের প্রথম পূজা করেছিলেন, আর প্রথম মন্দিরটিও তিনিই তৈরি করিয়েছিলেন বিশ্বকর্মাকে দিয়ে। এখানকার স্থলপুরাণে এই গল্পটি আছে। অপ্সরা পরিবৃত ইন্দ্র গুরুর আগমন জেনেও তাঁকে সম্মান করেন নি। এই দেখে দেবগুরু বৃহস্পতি তাঁকে পরিত্যাগ করে তপস্যার জন্য চলে যান। ক্রিয়াকর্ম লোপ হচ্ছে দেখে ইন্দ্র ব্রহ্মার পরামর্শে ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকে গুরুপদে বরণ করেন। এই বিশ্বরূপ যজ্ঞের সময় তাঁর মাতৃকুলের দৈত্যদের জন্যও আহুতি দিয়েছিলেন বলে ইন্দ্র তাঁকে বধ করেন। ইন্দ্রের উপরে ক্রুদ্ধ হয়ে ত্বষ্টা দ্বিতীয় পুত্র বৃত্রকে লাভ করেন যজ্ঞাগ্নি থেকে। প্রবল যুদ্ধে ইন্দ্র এই বৃত্রকেও বধ করেন। ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়েছিল দেবরাজের। এই পাপস্খলনের জন্য তিনি ত্রিভুবন ঘুরে মাদুরার কদম্ববনে আসতেই তাঁর পাপস্খলন হয়। পরম বিস্ময়ে ইন্দ্র দেখলেন যে কদম্ব বনে আছেন সুন্দরেশ্বর শিব। তাঁরই দয়ায় তিনি পাপমুক্ত হয়েছেন। তাই পূজা করলেন শিবের এবং বিশ্বকর্মাকে ডেকে তাঁর জন্য মন্দির নির্মাণ করে দিলেন। মাদুরায় প্রবাদ আছে যে এখনও দেবরাজ ইন্দ্র বৈশাখী পূর্ণিমায় আসেন সুন্দরেশ্বরের পূজা করতে। মাদুরায় তাই প্রতি বছর বৈশাখের শুক্লপক্ষে দশ দিন ব্যাপী উৎসব চলে আসছে।

সাধুজী একটু থেমে বললেন: মাদুরায় উৎসব লেগেই আছে।

সাহেবেরা তাই মাদুরাকে বলত, এ সিটি অব ফেস্টিভালস। হাতিশালায় হাতি আছে অনেক, এই সব হাতিকে সাজিয়ে বার করা হয় উৎসবের সময়। রাত্রে আরতির পরে একটি পাল্কীতে করে সুন্দরেশ্বর স্বামীর ভোগমূর্তি আনা হয় মীনাক্ষী দেবীর কাছে। আগে এই সময়ে দেবদাসীর নৃত্য হত। এখন শুধু বাজনা বাজে। উৎসবের দিনে পুরুষ গায়কেরা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত দিয়ে পুরানো দিনের অভাব পূর্ণ করেন।

সাধুজী আর একটি মন্দিরের কথা আমাদের বললেন, তার নাম আলাগার কয়েল। মাদুরা শহর থেকে বৈগাই নদী পেরিয়ে এগার মাইল দূরে আলাগার পাহাড়ের নিচে একটি সুন্দর মন্দির আছে। মীনাক্ষী দেবীর ভাইএর নাম আলাগার। বোনের বিয়ের খবর পেয়ে তিনি মাদুরায় আসছিলেন, কিন্তু পথেই খবর পেলেন যে বিয়ে হয়ে গেছে। তিনি ভাবলেন যে বোন তাঁকে অবহেলা করেছে, তাই মাদুরায় না এসে তিনি আলাগার পাহাড়ের কোলে ফিরে গেলেন।

মীনাক্ষী মন্দিরের সব চেয়ে বড় উৎসব হয় চৈত্র মাসে। সুন্দরেশ্বর শিবের সঙ্গে মীনাক্ষী দেবীর বিবাহ উৎসব। মন্দিরের মধ্যে বিবাহ হবার পরে তাঁদের উৎসব মূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা বেরোয়। পরদিন আবার তাঁরা বৈগাই নদী পর্যন্ত যান। নদীর ওপার থেকে আলাগারও আসেন শোভাযাত্রা করে। তিন দিন উৎসবের পরে তাঁরা ফিরে যান নিজ নিজ মন্দিরে। সমস্ত মাদুরায় তখন নাকি আনন্দের স্রোত বয়ে যায়।



মাদুরার পরে রামেশ্বর। কিন্তু রামেশ্বরের কথা বলবার আগে সাধুজী বললেন: আগে আর একটি তীর্থ ছিল রামেশ্বরের নিকটে, এখন তা সমুদ্র গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

সেই তীর্থের নাম ছিল ধনুস্কোডি। যাত্রীরা রামেশ্বর যাবার আগে ধনুস্কোডিতে সমুদ্র স্নান করে যেত। সিংহলে যাবার জাহাজ এখান থেকেই ছাড়ত। এখন জাহাজ নাকি রামেশ্বরের সমুদ্রে দাঁড়িয়ে থাকে, আর নৌকোয় চেপে গিয়ে যাত্রীদের জাহাজে উঠতে হয়।

রামেশ্বর একটি দ্বীপ। পশ্চিমে একটি লোহার পুল দিয়ে ভারতের সঙ্গে যুক্ত। এই দ্বীপের আয়তন পূর্ব-পশ্চিমে পঁচিশ মাইল আর উত্তর-দক্ষিণে ছ মাইলের বেশি কোথাও নেই। বিষ্ণুর শঙ্খের আকৃতি এই দ্বীপের। মাদুরা থেকে যে গাড়ি ছাড়ে তা সোজা এসে রামেশ্বরে দাঁড়ায়। রামেশ্বর চার ধামের এক ধাম। পূর্বে পুরী, পশ্চিমে দ্বারকা, উত্তরে বদরীনারায়ণ আর দক্ষিণে এই রামেশ্বর। যাঁরা এখানে ত্রিরাত্রি বাস করেন, তাঁরা অনেকে কিছু দেখবার সুযোগ পান। গন্ধমাদন পর্বতে রামঝরকা মাইল দেড়েক পথ, একান্ত রামেশ্বরম তিন মাইল, নাম্বিনায়কী আম্মন দু মাইল, সীতাকুণ্ডম আর ভিল্লুরনি তীর্থম মাইল পাঁচেক। ভৈরব তীর্থম পাম্বনে। ধনুষ্কোডির দিকে কোদণ্ডরমণ কয়েল।

সাধুজী বললেন ঃ মন্দির দর্শনের আগে রামঝরকায় একবার যাওয়া দরকার। একটি দোতলা মন্দিরে আছে রামের চরণ কমল। এইখানে দাঁড়িয়ে রাম তাঁর সেতু নির্মাণ দেখতেন, দেখতেন তাঁর সৈন্য চালনা। এখন এই মন্দিরের উপর থেকে দেখা যাবে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন গোটা রামেশ্বর দ্বীপ। উত্তর দক্ষিণ ও পূর্বে অসীম জলরাশি, পশ্চিমে একটি ছোট পুল দিয়ে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা হচ্ছে। এই রামঝরকা যাবার পথে অনেক তীর্থ আছে। সুগ্রীব জাম্ববান অঙ্গদ পাণ্ডব ধর্ম ভীম অর্জুন নকুল সহদেব—সকলের নামে তীর্থম। তীর্থম মানে কুণ্ড। কোথাও জল আছে একটুখানি, কোথাও নেই। দ্রৌপদী তীর্থমও আছে, তা ভদ্রকালী আম্মন মন্দিরের কাছে।

যে বালুকাময় পথ গন্ধমাদন পর্বতে উঠেছে, তার রঙ লাল। এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর কাহিনী আছে। রাম রাবণ বধ করে ফিরে এসে শিব পূজা করবেন। হনুমান কাশী থেকে শিবলিঙ্গ আনতে দেরী করছেন দেখে রাম বালির লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করলেন। হনুমান ফিরে এসে রেগে গেলেন। তাঁর সকল শ্রম কি ব্যর্থ হয়ে যাবে! রাম বললেন, তুমি এই লিঙ্গ তুলে ফেলে নিজের আনা শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা কর। আদেশ পেয়েই হনুমান তাঁর লেজ দিয়ে বালির শিবলিঙ্গ জড়িয়ে সকল শক্তি প্রয়োগ করলেন। কিন্তু শিবের মায়ায় রক্তাক্ত কলেবরে ছিটকে পড়লেন সমুদ্রের ধারে। সেই দিনই হনুমানের রক্তে রাঙিয়ে গেছে রামেশ্বরের বালি।

রামনাদ স্টেশন থেকে সাত মাইল দক্ষিণে দর্ভশয়নমে পৌঁছে রাম সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিলেন। দর্ভ বা কুশের উপরে শয়ন করে তিনি বরুণের উপাসনা করে সমুদ্র বন্ধনের অনুমতি নিয়েছিলেন। আরও খানিকটা দূরে দেবী পত্তনমে আদিত্যাদি নবগ্রহের পূজা করেন। এখনও সমুদ্র তীরে জলের ভিতর নয়টি প্রস্তর খণ্ড জেগে আছে। আদি সেতুর নির্মাণ শুরু

হয়েছিল দর্ভশয়নম থেকে। এ সবই আমাদের তীর্থ।

তাউজী বললেন: কিষ্কিন্ধ্যাও আমাদের তীর্থ। কিন্তু কিষ্কিন্ধ্যার কথা আপনি বলেন নি!

সাধুজী বললেন: কিষ্কিন্ধ্যায় কেউ তীর্থ করতে যায় না বলেই বলি নি। তবে রামায়ণে বর্ণিত সব স্থানই সেখানে আছে। ব্যাঙ্গালোর থেকে হায়দ্রাবাদ যাবার পথে গাড়ি বদল করে হস্পেটে যেতে হয়। সেখানে তুঙ্গভদ্রার তীরে শুধু কিষ্কিন্ধ্যার নয়, প্রাচীন বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষ ও তুঙ্গভদ্রার নতুন বাঁধ সবই দেখা যায়।

তারপরে সাধুজী বললেন: রামেশ্বরের প্রতিষ্ঠার সম্বন্ধে দুটি মত আছে। কেউ বলেন, রাম সেতুবন্ধের পূর্বে শিব পূজা করেছিলেন। সারা দিনে তাঁরা যতটা সেতু নির্মাণ করতেন, রাতে রাবণ ততটাই দিতেন ভেঙে। সমুদ্রের পরামর্শে রাম শিব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাবণকে জব্দ করতে। তারপরে রাবণ আর কোন অনিষ্ট করতে পারেন নি। অন্য মত আগেই বলেছি, সে মতে রামেশ্বর শিব দুটি। একটি রামের প্রতিষ্ঠিত বালির লিঙ্গ, অন্য শিব হনুমান এনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখনও নাকি নিয়ম আছে যে হনুমানের শিবকে আগে পূজা করে তারপর রামেশ্বর শিবের পূজার বিধান।

শোনা যায় যে এক কুঁড়ের নিচে ছিল রামেশ্বর শিব লিঙ্গ, একজন সন্ন্যাসী তাঁর পূজা করতেন। সিংহলের রাজা প্রথম তৈরি করলেন একটি কালো পাথরের গর্ভগৃহ, তারপর আর একজন সিংহলের রাজা প্রায় আটশো বছর আগে এই মন্দির নির্মাণ করেন। রামনাদের সেতুপতিরা এখন এই মন্দিরের মালিক। তাঁরা মন্দিরের প্রাকার ও গোপুর নির্মাণ করেছেন, সংস্কারও করেছেন অনেক। কয়েক শো বছর ধরে এই মন্দিরটি ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে এবং এখনও বাড়ছে।

সাহেবরা এই মন্দিরের বয়স তিনশো বছরের কিছু বেশি বলে অনুমান করেন। তাঁদের মতে এই রামেশ্বরের মন্দির হল দ্রাবিড় স্থাপত্য শিল্পের এমন একটি নিদর্শন যে তাতে সৌন্দর্য ও সম্পূর্ণতার সঙ্গে শ্রেণীগত ত্রুটিও প্রকাশ হয়ে পড়েছে। কিন্তু আমরা এ সবের বিচার করতে মন্দিরে আসি নি। মন্দিরের প্রশস্ত বারান্দার সামনে দাঁড়িয়ে আনন্দে ও বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে থাকি। কী বিরাট, কী গম্ভীর, কী সুন্দর! চার হাজার ফুট লম্বা, আর প্রায় চব্বিশ ফুট প্রশস্ত। দুধারের বড় বড় থামের উপরে ছাদ। সেই থামের গায়ে বিচিত্র কারুকার্য নেই দক্ষিণের অন্যান্য মন্দিরের মতো। দেওয়ালের রঙেও কোন জৌলুস নেই। সমগ্র ভাবে একটা বিরাট কীর্তির মহিমা আছে, নেই কোন সূক্ষ্ম শিল্পের আবেদন।

সাধুজী বললেন: প্রদীপের আলোয় আমরা রামেশ্বর দর্শন করলাম

দূর থেকে। মন্দিরের সর্বত্র বিদ্যুতের আলো, কিন্তু ভিতরে ঘৃতের প্রদীপ। কর্পূরের আলোয় আরও ভাল দেখা যায় দেবতাকে। গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে আছেন পাষাণ দেবতা। কী কঠোর তপস্যায় সেই ধ্যান ভঙ্গ হবে তিনিই জানেন। পূজারী উদাত্ত স্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করছেন, যাত্রীরা করজোড়ে স্তব্ধ হয়ে আছে। শান্ত সমাহিত পরিবেশ।

এখানে নিজের হাতে বাবার মাথায় ফুল বেলপাতা চড়াবার অধিকার কারও নেই। এই দেবস্থানম পরিচালনার জন্য অন্যান্য তীর্থস্থানের মতো কমিটি আছে। একজন বেতনভোগী ট্রাষ্টি মাদুরায় থেকে মন্দিরের জমিদারী দেখাশোনা করেন। আর রামেশ্বরে তাঁর সহায়তা করেন একজন কোষাধ্যক্ষ ও একজন পেশকার। পূজারীরা বেতনভোগী ব্রাহ্মণ। বাবার পূজার্চনা ও অভিষেকাদি করবার রীতি পেশকারের কাছে নানা মূল্যের টিকিট কিনে। এখানেও অন্নপূর্ণা ও বিশ্বেশ্বর আছেন। বাইশটি তীর্থম আছে মন্দিরের প্রাকারের ভিতর। তার মধ্যে কোটিতীর্থম ও সর্বতীর্থমের জল যাত্রীরা দড়ি দিয়ে ঘটি নামিয়ে কুণ্ড থেকে তুলে মাথায় ঢালে। অনেকে স্নান করে অগ্নি তীর্থে। মন্দিরের পূর্ব গোপুর দিয়ে বেরিয়ে সমুদ্রের ধারে এই তীর্থ।

সাধুজী একটু থেমে বললেন: কোন তীর্থে গেলে দেবতার শেষ আরতি দেখতে হয়। সাধারণ যাত্রীর ভিড় ও ঠেলাঠেলি তখন থাকে না। মন্দিরের ভিতরে শুষ্ক পরিচ্ছন্ন পরিবেশ শান্ত ও গম্ভীর। উদাত্ত কণ্ঠে পূজারীরা বেদপাঠ করেন, বাদ্য যন্ত্রসঙ্গীত শোনা যায় অনেক মন্দিরে। শয়ন আরতির নানা আয়োজন দেখা যায়। দেবতার ভোগ মূর্তি নিয়ে যাওয়া হয় দেবীর কাছে, ভোরবেলায় সেই মূর্তি আবার ফিরিয়ে আনা হয়। এ সব না দেখলে তীর্থ দেখা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।



সাধুজী বললেন: রামেশ্বর থেকে মাদুরায় ফিরে কন্যাকুমারী যাবার দুটো পথ আছে। একটা পথ তিরুনেলভেলি স্টেশন থেকে, আর একটা পথ ত্রিবেন্দ্রাম স্টেশন থেকে। এখন বাকি ত্রিবেন্দ্রাম থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ট্রেন যাচ্ছে। আগে তিরুনেলভেলির পথটাই সংক্ষিপ্ত ছিল। আর এই পথে গেলে

তিরুচেন্দুরে। উপরি লাভ হত। সে এক বেলার ব্যাপার। তাই তিরুচেন্দুর না দেখে কন্যাকুমারী যাবার কোন মানে হয় না। পথ মাইল চল্লিশেক। সমুদ্রের ধারে এই শহর পর্যন্ত ট্রেনও আছে। এক্সপ্রেস বাসে দেড় ঘণ্টাতেই পৌঁছানো যায়। রেল স্টেশন আর বাস স্টেশন কাছাকাছি, কিন্তু মন্দির কিছু দূরে। টাঙ্গার মতো ঘোড়ার গাড়িতে চাপলে একেবারে মন্দিরের কাছে গিয়ে নামা যায়। সদর রাস্তা থেকেই মন্দিরের পথ শুরু হয়েছে। উঁচু থামের উপরে ছাদ আছে, নিচের পথ বাঁধানো।

মন্দিরে পৌঁছে সমুদ্র দেখতে পাওয়া যায়। সমুদ্রের ধারেই মন্দির। যাত্রীরা সমুদ্রে স্নান করে মন্দিরে আসে পূজোর জন্যে। পুরুষদের ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত করতে ভিতরে ঢুকতে হয়, ধুতি বা লুঙ্গি পরতে হয় দক্ষিণীদের মতো। দেবসেনাপতি কার্তিকের মন্দির। আর কোন দেবতা এখানে নেই। প্রতি দিন অগণিত যাত্রী এখানে আসে।

সাধুজী একটু থেমে বললেন ঃ এই মন্দিরের সৌন্দর্যের কথা আমি বলেছিলাম। সমুদ্রের ধারে গিয়ে দাঁড়ালে এই সৌন্দর্য দেখতে পাওয়া যায়। দক্ষিণে অকূল সমুদ্র উদ্বেলিত হয়ে আছে। উত্তরে মন্দির। পশ্চিমে মন্দিরের প্রধান প্রবেশ পথ, আর একটা ঢাকা পথ সমুদ্রের ধারে ধারে পূর্ব দিকে চলে গেছে। মন্দিরের পিছনে একটা বিরাট উঁচু গোপুরও দেখতে পাওয়া যায়। তাতে তিনটি মানুষের মূর্তি আছে। মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত নেহেরু ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মূর্তি।

কিছুক্ষণ নীরবে থাকবার পরে সাধুজী বললেন ঃ তিরুচেন্দুরের পর কন্যাকুমারীর কথা। তিরুনেলভেলি থেকে দূরত্ব হবে মাইল পঞ্চাশের কিছু বেশি। তিরুচেন্দুর থেকেও সমুদ্রের ধারে ধারে বাস বদল করে যাওয়া যায়। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো সরাসরি বাস চলবার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। যাত্রীরা নাগেরকয়েলে নেমে শুচীন্দ্রমের মন্দির দেখেই কন্যাকুমারীতে যান। আমিও তাই করেছিলাম। নাগেরকয়েল থেকে কন্যাকুমারী যাবার পথে শুচীন্দ্রমের মন্দির। ঠিক পথের ধারে নয়, সদর রাজপথ ছেড়ে ডান দিকের একটা পথ ধরে খানিকটা এগোতে হয়।

পুরাকালে এই অঞ্চল গভীর অরণ্যে আবৃত ছিল। তার নাম ছিল জ্ঞানারণ্য। মহর্ষি অত্রির আশ্রম ছিল এইখানে। তাঁর পত্নী অনসূয়ার সতী নামের খ্যাতি তখন চারি দিকে ব্যাপ্ত হয়েছে। দেবর্ষি নারদের মুখে সেই কথা শুনে ঈর্ষান্বিত হলেন দেবতার পত্নীরা। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বাধ্য হলেন এর পরীক্ষা নিতে। তিন জনে ব্রাহ্মণের বেশে অত্রির আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। অত্রি তখন তপস্যার জন্য হিমালয়ে গেছেন,

অতিথি সংকার করতে এগিয়ে এলেন অনসূয়া। কিন্তু ছদ্মবেশী দেবতারা বললেন, নগ্ন দেহে খাদ্য পরিবেশন করলেই তাঁরা তা গ্রহণ করতে পারেন। অনসূয়া চমকে উঠেছিলেন এই কথা শুনে, তারপরেই মনে পড়ল স্বামীর পাদোদকের কথা। তিনি সেই পাদোদক এনে অতিথিদের মাথায় ছিটিয়ে দিয়ে বললেন, বালোভব, মানে শিশু হয়ে যাও। দেখতে না দেখতেই দেবতারা শিশুতে পরিণত হয়ে গেলেন। তাঁদের সামনে অনসূয়ার আর কোন লজ্জা রইল না, তিনি তাঁদের সংকার করলেন। শিশুরা ভুলে গেলেন ঘরে ফেরার কথা। দেবর্ষি নারদ আবার দেবলোকে গিয়ে বললেন, সর্বনাশ হয়েছে, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এখন শিশু হয়ে অত্রির আশ্রমে খেলা করছেন। ভয় পেয়ে ছুটে এলেন তাঁদের পত্নীরা, কিন্তু নিজেদের পতিকে আর চিনতে পারলেন না। এমন সময় অত্রি তপস্যা শেষ করে গৃহে ফিরলেন। সব কথা শুনে তিনি কমণ্ডলুর জল শিশুদের গায়ে ছিটিয়ে দিতেই তাঁরা নিজ রূপ ফিরে পেলেন। সেই অবধি এই ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আছেন জ্ঞানারণ্যে। শুচীন্দ্রমের মন্দিরে এই তিন দেবতারই পূজা হয়।

বিশাল একটি পুষ্করিণীর ধার দিয়ে মন্দিরে যাবার পথ। গোপুরম আছে সামনে। দু ধারে দোকান পাট। পুরুষদের জন্যে এখানেও সেই একই নিয়ম। খালি গায়ে ঢুকতে হবে ধুতির লুঙ্গি পরে। ধুতি ভাড়া পাওয়া যায়।

মন্দিরের ভিতরে বারান্দার দু ধারে কারুকার্য করা থাম রামেশ্বরের মতো বিরাট না হলেও গাম্ভীর্যপূর্ণ। এক জায়গায় চারটি সরু থাম আছে পাশাপাশি। সেই থামগুলিতে করাঘাত করলে চারটি সুর বাজে চার রকম যন্ত্রের মতো। এই রকমের থাম আছে মাদুরাতেও। মন্দিরের ভিতরে একাধিক মণ্ডপ, অনেক দেবতা। হনুমানের বিরাট মূর্তি দেখে বিস্মিত হতে হয়। তিন চারজন মানুষের সমান উঁচু। এত বড় মূর্তি সচরাচর দেখা যায় না। ডমরু হাতে শিবের দণ্ডায়মান মূর্তি, নৃত্যপর বেনুগোপালের মূর্তি, বাঁশি হাতে চতুর্ভুজ বিষ্ণু মূর্তি ও আরও অনেক দেবদেবী।

জ্ঞানারণ্য থেকে এ জায়গার নাম শুচীন্দ্রম কেন হল সে সম্বন্ধেও একটি কাহিনী আছে। দেবরাজ ইন্দ্র ব্যভিচার করেছিলেন গৌতম ঋষির পত্নী অহল্যার সঙ্গে। ঋষির শাপে তাঁর সারা দেহে অশুচি চিহ্ন দেখা দিয়েছিল। গৌতমের কাছে ইন্দ্র যখন শাপমুক্তির উপায় জানতে চাইলেন, গৌতম এই জ্ঞানারণ্যে তাঁকে তপস্যা করতে বললেন। অত্রি-অনসূয়ার আশ্রমে তখন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের বাস। ইন্দ্র এখানে তপস্যা করে শুচি হবার পরে জ্ঞানারণ্যের নাম হয়েছিল শুচীন্দ্রম। শুচীন্দ্রমের লোকেরা বলে যে সেখানকার

প্রথম মন্দিরটি দেবরাজ ইন্দ্রের তৈরি। এখনও প্রতি রাত্রে দেবরাজ আসেন ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের পূজা করতে। ইন্দ্রের পূজা না পেলে দেবতারা অপূজিত থাকেন।

তারপরে শুচীন্দ্রমের শিব ও কন্যাকুমারীর গল্প। দুর্ধর্ষ বাণাসুর কঠোর তপস্যা করে ব্রহ্মার কাছে বর পেয়েছিলেন যে দেবদানব যক্ষ নরনারী গন্ধর্ব কিন্নর কেউ তাঁকে বধ করতে পারবে না। বাণাসুর তারপরে ত্রিভুবন জয় করে দেবরাজ ইন্দ্রকে তাড়ালেন অমরাবতী থেকে। নির্বাসিত ইন্দ্র যজ্ঞ করলেন বিষ্ণুর পরামর্শে। সেই যজ্ঞের আগুন থেকে এক কুমারী কন্যার জন্ম হল। এই কন্যাই বধ করবেন বাণাসুরকে। কিন্তু তার আগেই দেবাদিদেব মহাদেবর সঙ্গে তাঁর বিবাহ স্থির হয়ে গেল। ইন্দ্র প্রমাদ গুনলেন কন্যার বিবাহ হয়ে গেলে বাণাসুরকে বধ করবে কে! ইন্দ্র তাই দেবর্ষি নারদের শরণাপন্ন হয়ে বললেন, বিয়ে পণ্ড করতেই হবে। নির্দিষ্ট দিনে শিব সেজেগুজে যাত্রা করলেন ষাঁড়ের পিঠে চেপে। লগ্ন উত্তীর্ণ হবার আগে তাঁকে কন্যাকুমারী পেঁৗছতেই হবে। তা না হলে শর্ত মাফিক এ বিয়ে আর হবে না। কিন্তু জ্ঞানারণ্যে অত্রি মুনির আশ্রমের কাছে এসে তিনি নারদের সাক্ষাৎ পেলেন। নারদ তাঁর সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা জুড়ে দিলেন। সে আলোচনা শেষ হবার আগেই লগ্ন পার হয়ে গেল। শিব জ্ঞানারণ্যেই রয়ে গেলেন। তাঁর অধিষ্ঠান এখন শুচীন্দ্রমের মন্দিরে। আর কন্যাকুমারীতে আজও অপেক্ষা করছেন সেই কুমারী কন্যা।

সাধুজী বললেন: লোকে বলে যে কন্যাকুমারীর চেয়ে সুন্দর তীর্থ এ দেশে আর নেই। এই কথা আমার অনেক জায়গায় মনে হয়েছে। সৌন্দর্যের বিচারে বুদ্ধির চেয়ে মনের শক্তি বেশি। মন যাকে সুন্দর ভাবে, বুদ্ধি সেই বিচারকে নাকচ করতে পারে না। বুদ্ধির বিচারে তিরুচেন্দুরকে বেশি সুন্দর হলেও মন মানে না। তিন সমুদ্রের মিলনের মুখোমুখি বসে মন বলে যে এর চেয়ে সুন্দর স্থান আর নেই। মন্দিরের চেয়ে সমুদ্র বড় কন্যাকুমারীতে।

তাউজী বললেন: কন্যাকুমারীতে আর কী দেখলেন?

সাধুজী বললেন: সমুদ্রের ধারে মাতৃতীর্থের স্নানের ঘাট। এই ঘাটে স্নান করে পরশুরামের মাতৃহত্যার পাপ স্খলন হয়েছিল।

ঋষির কথায় আমরা এই মাতৃহত্যার গল্প শুনেছি। পিতার আদেশে পরশুরাম তাঁর মাতাকে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু সাধুজী এই গল্প বললেন না। তিনি বললেন: খুব ছোট জায়গা কন্যাকুমারী, কিন্তু যাত্রীদের বাসস্থানের কোন অভাব নেই। ধর্মশালা আছে, হোটেল আছে। দরিদ্র যাত্রীর যেমন অসুবিধা নেই, তেমনি ধনী যাত্রীরও সুবিধা আছে। মহাত্মা

গান্ধীর স্মৃতি মন্দির হয়েছে, বিবেকানন্দের স্মৃতি মন্দির তৈরি হয়ে গেছে। সমুদ্রের মধ্যে এই পাহাড়ে যেতে হয় নৌকায় চেপে।

কন্যাকুমারীর মন্দিরেও জামা খুলে ধুতি পরে ঢুকতে হয়। বাজারের মধ্য দিয়ে মন্দিরের পথ। উঁচু গোপুর নেই, আছে নিচু গেট। তারই ধারে কোন দোকানে জামা খুলে রেখে কোমরে কাপড় জড়িয়ে মন্দিরে প্রবেশের রীতি। প্রাঙ্গণের পূর্ব দিকে সমুদ্রের ধারেও একটি দরজা আছে, কিন্তু সেটি বন্ধ থাকে। এই দরজা দিয়ে বেরিয়ে ধাপে ধাপে সমুদ্রের জলে নামা যায়। ঘাটের সামনে যে দুটি ন্যাড়া পাহাড়, তারই নাম বিবেকানন্দ পাহাড়। স্বামী বিবেকানন্দ সমুদ্র সাঁতরে ঐ পাহাড়ে উঠে তপস্যা করেছিলেন। তাই তাঁর স্মৃতি মন্দির তৈরি হয়েছে ঐ পাহাড়ের উপরে।

সন্ধ্যাবেলায় মন্দিরে গিয়ে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। প্রদীপে ও ফুলের মালায় সাজানো হয় মন্দিরের অভ্যন্তর। ধূপ দীপ বাদ্য ও উদাত্ত মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে আমরা কন্যাকুমারীকে দেখি। চন্দন-চর্চিতা কুঙ্কুমরঞ্জিতা বালিকামূর্তি, বসনে ভূষণে মাল্যে ও সৌরভে তাঁর অধিবাস তখন সম্পন্ন হয়েছে। শিবের আগমনের প্রতীক্ষায় দেবীর তখন মোহিনী মূর্তি। কিন্তু দেবীর নিকটে যাবার উপায় নেই, পিতলের হাতল ধরে দূর থেকেই দেবীকে দেখতে হয়। তাঁর উজ্জ্বল মুখে জ্বলজ্বল করে জ্বলে দুটো হীরে, একটা কপালে ও একটা নাকে। নাকের হীরেটা মনে হয় প্রদীপের শিখার মতো কাঁপে।

সাধুজী একটু থেমে বললেন: সকালের দর্শন অন্য রকম। বিবাহের লগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, কিন্তু শিব আসেন নি। সে কী অপরিসীম ক্ষোভ তাঁর! গলার মালা আর পুষ্পাভরণ ছিঁড়ে ফেলেছেন, খুলে ফেলেছেন মহার্ঘ বসন ভূষণ। প্রেম তাঁর ব্যর্থ হয়েছে, কী প্রয়োজন তাঁর বাহিরের আড়ম্বরে! দেবীর সেই অরক্ষণীয়া কুমারী মূর্তি দেখি সকালের দর্শনে।



আজ অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথা হয়েছে। তবু মনে হচ্ছিল যে রাত বেশি হয় নি। ধূপ নিবে গিয়েছিল, তার সুবাস মিলিয়ে গিয়েছিল বাতাসে। রোজই এমনই হয়, যখন এসে আমরা বসি তখন এই ধূপের গন্ধে মনও

সুবাসিত হয়ে ওঠে, তারপরে আর কিছুর দরকার থাকে না। শুধু প্রদীপ জ্বলে স্নিগ্ধ আলোর। সেই আলোয় আমরা পরস্পরকে দেখতে পাই। দক্ষিণের তীর্থ প্রসঙ্গের শেষ শোনবার জন্য আমরা সাগ্রহে বসে রইলাম।

সাধুজী বললেন: আর বেশি তীর্থের কথা বাকি নেই, বেশি কথাও নেই সেই সব তীর্থ সম্বন্ধে। কন্যাকুমারী থেকে ফেরার পথে যাত্রীরা এই সব তীর্থ দেখেন। কিন্তু সব তীর্থের নাম জানা নেই বলে সকলের আর দেখা হয় না। গুরুভায়ুরের মতো বিখ্যাত তীর্থ নাম না জানার জন্য বাদ পড়ে যায়।

ফেরার পথে প্রথমেই ত্রিবেন্দ্রাম। পদ্মনাভ স্বামীর মন্দির এখানে প্রসিদ্ধ। এই মন্দিরটি সকল যাত্রীকেই দেখতে হয়। স্টেশন থেকে বেশি দূর নয়, হাঁটার অভ্যাস থাকলে হেঁটেই যাতায়াত করা যায়, বাসে বা ট্যাক্সিতে যাবার প্রয়োজন হয় না। বিশাল এক জলাশয়ের এক ধারে বিপুল আকারের গোপুরম। কিন্তু সেই গোপুর উচ্চতায় দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য গোপুরের মত নয়। অত বড় গোপুর অমন থ্যাবড়া কেন, তাই ভেবে আশ্চর্য হতে হয়। আর তার চেয়েও বেশি আশ্চর্য হতে হয় পাহারার ব্যবস্থা দেখে। সত্যি বলতে কি, আমার ভাগ্যে দেবতার দর্শন হয় নি। আর শুধু আমার ভাগ্যে নয়, অনেকেরই এই সৌভাগ্য হয় না। ত্রিবাঙ্কুরের রাজা এই পদ্মনাভ স্বামীর দাস বলেন নিজেকে। দেবতার নামেই রাজ্য শাসন করতেন। কিন্তু কার্যত তিনিই হলেন মন্দিরের মালিক। তাঁর নিজের পূজা আছে, সে সময়ে কড়া পাহাড়া। সাধারণ যাত্রীদের জন্যে যে সময় নির্ধারিত আছে, যাত্রীদের তা জানা না থাকার জন্য অনির্দিষ্ট কাল অপেক্ষা করতে হয়। তা না হলে ফিরে যেতে হয়। বিধি নিষেধও কড়া। পাৎলুনের উপরে কাপড় জড়ালে চলবে না, পাৎলুন খুলে কাপড় পরতে হবে, জামা গেঞ্জি খুলতে হবে। সাধারণ যাত্রী এ সবের জন্য প্রস্তুত থাকেন না বলে দুঃখ করে তাঁদের ফিরে যেতে হয়। তার জন্যে মন্দির কর্তৃপক্ষের কোন দুঃখ নেই।

তারপরেই হেসে বললেন: আমি দর্শন পাই নি বলেই বোধ হয় এই রকম বলছি, যাঁরা দর্শন পেয়ে কৃতার্থ হয়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই এ কথা বলবেন না। মন্দিরের ভিতরে পদ্মনাভ স্বামীর দর্শন একেবারে পাওয়া যায় না, তিনবারের চেষ্টায় তাঁকে দর্শন করতে হয়। পদ্মনাভ স্বামী হলেন অনন্ত শয়নে বিষ্ণু, তাঁর বিরাট দেহ। গর্ভগৃহে প্রবেশের তো রীতি নেই, তিনটি পৃথক দ্বার দিয়ে দেখতে হয়। প্রথম দ্বারে চরণ কমল, মধ্য দ্বারে নাভি কমল, এবং শেষ দ্বারে মুখ মণ্ডল দেখা যায়। দেবতা তাঁর ডান হাতের উপরে কপোল রেখে অর্ধ শায়িত ভঙ্গিতে বিরাজ করছেন।

সাধুজী একটু ভেবে বললেন: এই স্থানকে তীর্থ না বললে বোধ হয়

ভুল বলা হবে। মহাভারতে এর উল্লেখ আছে তীর্থ বলে। বনবাস কালে পঞ্চ পাণ্ডব নাকি পদ্মনাভ স্বামী দর্শন করেন। বাঙলার চৈতন্যদেব আদি কেশব দর্শনের পরে এসেছিলেন এই তীর্থে। আচার্য রামানুজ ও যমুনাচার্যও এই মন্দিরে দেবতার স্তবগান করে গেছেন প্রাণের আবেগে।

ছাব্বিশ মাইল উত্তরে কুইলনের পথে আর একটি মন্দির আছে বর্কলায়, জনার্দনের মন্দির। বর্কলা নামে একটি স্টেশনে নেমে মাইল দেড়েক দূরে সমুদ্রের ধারে যেতে হয়। ট্যাক্সি পাওয়া যায় স্টেশনে, হেঁটে যেতেও কষ্ট হয় না। ত্রিবেন্দ্রাম বা কুইলন থেকে বাসেও যাতায়াত করা সম্ভব। পথের ধার থেকে সিঁড়ি আছে উপরে উঠবার। বেশি উঁচু নয়, উপরে খানিকটা সমতল ভূমির উপরে ছোট মন্দির। গোপুর নেই, মণ্ডপ নেই। কিন্তু দেবতার রূপ দেখে মুগ্ধ হতে হয়। মন্দির থেকে সমুদ্র দেখা যায় না। সমুদ্র দেখতে হলে নিচে থেকে খানিকটা এগিয়ে যেতে হয়। তখন মনে হবে যেন এমন অপরূপ স্থান আর বুঝি নেই। তরঙ্গের পর তরঙ্গ এসে পাহাড়ের পাদদেশে আছড়ে পড়ছে। নির্জন নীরব সাগর বেলায় শোনা যায় তরঙ্গ ভঙ্গের অবিরাম বন্দনা গান।

এর পরে সাধুজী ত্রিচুরের কথা বললেন। ত্রিবান্দ্রম থেকে এর্নাকুলম পর্যন্ত রেল গাড়ি। সেখান থেকে মাদ্রাজের পথে ত্রিচুর একটি স্টেশন। গুরুভায়ুর যেতে হলে এই ত্রিচুরে নামতে হয়। ত্রিচুর থেকে গুরুভায়ুর কুড়ি মাইল দূরে। সারাক্ষণ বাস যাতায়াত করে। ট্যাক্সিরও কোন অভাব নেই।

সাধুজী বললেন ঃ ত্রিচুরে হল ভডক্কুনাথন শিবের মন্দির, পার্বতীর মন্দিরও আছে। এখানে যা উল্লেখযোগ্য তা হল একটি বিশেষ ধরনের গোপুরম। কেরালার বৈশিষ্ট্য এটি। দক্ষিণ ভারতের গোপুর দেখে চোখ এমন অভ্যস্ত হয়ে যায় যে কেউ বলে না দিলে এখানে বোঝা যাবে না যে এটিও একটি মন্দিরের গোপুর। তেতলা বাসগৃহ বললে বোধহয় বেশি মানাবে। কিন্তু বাসগৃহের মতো নয়, চালা ঘরের মতো ছাদ একটির উপর একটি। সামনে একটি দীপ স্তম্ভ। উপরে উঠবার সিঁড়িও আছে। মনে হয় যে প্রদীপ জ্বালানো হয় সন্ধ্যার সময়। গুরুভায়ুরের গোপুরমও কতকটা এই রকম। সামনে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ ভাবলে নেপালের কথা মনে পড়ে। সে দেশের স্থাপত্য কতকটা এই ধরনেরই। শুধু মন্দির নয়, রাজপ্রাসাদগুলিও যেন কতকটা এই রকম ভাবেই নির্মিত হয়েছে। কিন্তু কেমন করে এই সাদৃশ্য দেশের উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে এল সমস্ত দেশটা ডিঙিয়ে, সে কথা ভাবলেই আশ্চর্য হতে হয়। এ নিয়ে কেউ অনুসন্ধান করেছেন বলে

আমার জানা নেই।

ত্রিচুর থেকে বাস এসে গুরুভায়ুরের মন্দিরের খুব কাছাকাছি দাঁড়ায়। চতুষ্কোণ প্রাকারে ঘেরা এই মন্দির। দুধারে দুটি গোপুর, কিন্তু ভিতরে প্রবেশের জন্য এক দিকেরই পথ খোলা থাকে। এক ধারে একটি বৃহৎ জলাশয় আছে যাত্রীদের স্নানের জন্য। বসস্থানের কোন অভাব নেই। দেবস্থানের অতিথিশালা হোটেল যাত্রীনিবাস অনেক আছে। বাজার দোকানপাট সবই গড়ে উঠেছে একটি মন্দিরকে কেন্দ্র করে।

সাধুজী বললেন : দ্বাপরে কৃষ্ণ এই মূর্তির পূজা করতেন। তাঁর স্বর্গারোহণের সময় তিনি এই মূর্তি দিয়ে যান উদ্ধবকে। উদ্ধব তা দেবগুরু বৃহস্পতিকে দিয়েছিলেন। গুরু বায়ুর সাহায্যে এই স্থান নির্বাচন করে সেই মূর্তি স্থাপন করেন, কলিযুগে মানুষের মুক্তির জন্য। গুরু ও বায়ু এখানে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন বলে এই স্থানের নাম হয়েছিল গুরু বায়ু পুর ও দেবতার নাম হয়েছে গুরুভায়ুরাপ্পন। শঙ্খ চক্র গদাপদ্মধারী বিষ্ণুর পূজা হয় এখানে। স্থানীয় লোকেরা বলেন কৃষ্ণ এই মন্দিরের দেবতা।

তাউজী বললেন : কৃষ্ণ তো চতুর্ভুজ নন।

সাধুজী বললেন : কৃষ্ণের যে রূপ দেখেছিলেন দেবকী ও বসুদেব, আর যে রূপে তিনি গীতা শুনিয়েছিলেন অর্জুনকে, কৃষ্ণের সেই রূপেরই পূজা হয় গুরুভায়ুরে। মন্দিরটি দেড়শো বছরের পুরনো বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু সত্যিকারের আশ্চর্য হবার বিষয় হল অন্য। মন্দিরের ভিতরে লক্ষ্মী নেই, কৃষ্ণেরও কোন পত্নী নেই। আছেন দুর্গা গণপতি ও সাস্তা। সাস্তার কথা কেরালাতেই প্রথম শুনেছি। ইনি হরিহর সুত বলে পরিচিত। এক সঙ্গে শিব ও বিষ্ণুর পুত্র হওয়া কী করে সম্ভব, তা ভেবে না পেয়ে আমি নানা জনকে জিজ্ঞাসা করে ব্যাপারটা জেনেছি। সমুদ্র মন্থনের সময় বিষ্ণু মোহিনী স্ত্রী রূপ ধারণ করে অমৃত কুম্ভ হরণ করেছিলেন দেবতাদের জন্য। আর সেই রূপেই শিবের সঙ্গে মিলিত হয়ে সাস্তার জন্মদান করেন। এই কাহিনী আমাদের পুরাণে আছে কিনা জানি না, কিন্তু কেরালার নানা স্থানে এই দেবতার পূজা হয়।

কেরালার মন্দির সম্বন্ধে আর একটি কথা জানা দরকার। মন্দির স্থাপত্য দেখতে কেরালায় কেউ আসে না। মন্দিরের কোন সৌন্দর্য যাত্রীকে মুগ্ধ করে না। মন্দিরের সামনে একটি ধ্বজস্তম্ভ এবং দীপস্তম্ভ আছে। গোপুরটি নিতান্ত সাধারণ ধরনের। দেবতা যে শ্রীকোভিলের ভিতরে আছেন তাও সাধারণ। যে প্রাকার বা গৃহ দিয়ে মন্দিরটি বেষ্টিত তার নাম নালম্বলম। আর নাট মন্দিরের পরিবর্তে আছে একটি কুথম্বলম। এই গৃহের মধ্যে চাকিয়াকুথু নামে নৃত্য নাট্যের অভিনয় হয়। কখনও কেরালায় গেলে

মালাবার অঞ্চলের একটি মন্দির দেখা দরকার—ত্রিচুর কিংবা গুরুভায়ুরের মন্দির। দেবতার পুজো ও উৎসবের মধ্যেও যে বৈশিষ্ট্য আছে, নিজের চোখে না দেখলে তা উপলব্ধি করা যায় না।

বলে সাধুজী থামলেন। এবারে তাঁকে শ্রান্ত দেখাচ্ছিল। গুরুজী তা বুঝতে পেরেই বললেন: আজ থাক।

বলে উঠে দাঁড়ালেন। তারপরে সাধুজীকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন উপাসনার মন্দির থেকে। আমরাও উঠে পড়লাম।



পরদিন দুপুর বেলায় যখন একটু বিশ্রাম করছিলাম, সুপ্তি এসে গম্ভীর ভাবে বলল: শকুন্তলাদি ডাকছে।

তার দু চোখে কৌতুক আমি দেখেছিলাম। তবু বিশ্বাস করলাম তার কথা। কিন্তু উঠে বেরিয়ে যেতেই পিছনে তার হাসির শব্দ শুনে বুঝতে পারলাম যে এ তার ছল। আমাকে সরিয়ে দেবার জন্যেই যে এই ছল করছে, কিংবা জব্দ করতে চায় আমাকে। বয়স অল্প, তাই চপলতা বেশি। লক্ষ্য আমি, না চেনুলু, তা বোঝবার উপায় নেই। চেনুলুর প্রতি তার মনোযোগ যে বেশি, তা আগেই লক্ষ্য করেছি। চেনুলুর শিল্পী মন আছে, সে মন আমার নেই।

শকুন্তলাদির কাছে এসে দেখলাম যে তিনি এই মাত্র কোনখান থেকে ফিরলেন। হাতের বইগুলো নামিয়ে রেখে কী করবেন বোধহয় ভাবছিলেন। ঠিক এই সময়েই আমি এসে ঢুকলাম। শকুন্তলাদি আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন: কী খবর বিনায়ক?

আমি বুঝতে পারলাম যে শকুন্তলাদি আমাকে ডাকেন নি। কিন্তু হঠাৎ এই ভাবে আসার একটা কৈফিয়ৎ দেবার দরকার ছিল। তাই বললাম: আপনি আমাকে ডেকেছেন নাকি?

কে, সুপ্তি বলেছে বুঝি?

আমি মাথা নেড়ে বললাম: হ্যাঁ।

শকুন্তলাদি বললেন: মেয়েটা বোধহয় কানে কম শোনে। আমি

তাকেই ডেকেছিলাম।

আমি ফিরে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে বললাম : তাকেই ডেকে দিচ্ছি।

শকুন্তলাদি বসে বললেন : তুমি বোসো।

আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে শকুন্তলাদির কথা সুস্তি ঠিকই শুনেছিল। কিন্তু এখানে আসতে চায় নি বলেই আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে আর নিজে হয়তো চেনুলুর সঙ্গে গল্প জুড়েছে। শকুন্তলাদির কথায় আমি বসে পড়লাম।

শকুন্তলাদি বললেন : তোমার লেখা কেমন এগোচ্ছে ?

বললাম : অনেক পিছিয়ে পড়েছি। এক দিনে এত কথা শুনছি যে সব কথা মনে রাখতে পারছি না।

শকুন্তলাদি বললেন : সংক্ষেপে লিখে রাখ, পরে তোমার স্মৃতি শক্তি তোমাকে সাহায্য করবে।

বললাম : স্মৃতি আমার দুর্বল শকুন্তলাদি। যত মনে রাখতে পারি, তার চেয়ে বেশি কথাই ভুলে যাই।

শকুন্তলাদি হেসে বললেন : সবারই তাই মনে হয়, কিন্তু আসলে তা নয়। মন যা মনে রাখে তাই মনে রাখবার মতো, যা ভুলে যায় তা ভুলে গেলেও কোন ক্ষতি হয় না। প্রতি দিন তো অনেক ঘটনা ঘটে, কিন্তু সব কথা কি মনে থাকে। মন একটা শ্লেটের মতো, কিন্তু তার হাতে এক টুকরো ভিজে কাপড় আছে। শ্লেটের উপরে কোন দাগ পড়লেই সেই ভিজে কাপড় দিয়ে তখনি মুছে দেয়। কিন্তু যে দাগ গভীর, সে দাগ একেবারে মুছে যায় না। গত কালের ঘটনা আমরা ভুলে যাই, কিন্তু শৈশবের অনেক ঘটনাই তো মনে থাকে!

অন্যমনস্ক ভাবে আমি বললাম : বুঝেছি।

শকুন্তলাদি বললেন : এই সব তীর্থের কথা আমরা বেমালুম ভুলে যাব, কিন্তু ভুল হবে না এই আশ্রমে বসে সাধুজীর মুখে তীর্থের কথা শোনার গল্প। মন যা প্রত্যক্ষ করে তাকেই সত্য বলে মানে, আর সব কিছুই তার কাছে অসত্য। মনের ওপরে অসত্যের দাগ পড়ে না। বুদ্ধি দিয়ে তাকে ধরে রাখতে হয়, যেমন বিদ্যাকে আমরা ধরে রাখি। চোখে দেখা যায় না এমন অনেক সত্য তপস্যায় দেখা যায়। ঈশ্বরকে তাই তপস্বীরাই দেখতে পান।

এ সব কথার উত্তর আমি দিতে পারলাম না। কিন্তু শকুন্তলাদি নিজে থেকেই বলতে লাগলেন : আমরা তো তপস্যা করতে পারি না, আমরা নিজের উপরেই নির্ভর করি। নিজের চোখে যা দেখি মন তা মনে রাখে। কিন্তু সাধুজীর চোখে দেখা তীর্থ আমাদের মন মনে রাখবে না। এই

সাধারণ নিয়ম। তাই বলছিলাম, সংক্ষেপে সব টুকে রাখ। কিছু টোকা থাকলে বাকিটা মন মনে করিয়ে দেবে।

বললাম: পুরোপুরি লিখতে যাচ্ছিলাম বলেই পিছিয়ে পড়ছিলাম। এবার থেকে সংক্ষেপে টুকে রাখব।

শকুন্তলাদি বললেন: সাধুজীর সঙ্গে আমি কথা বলেছিলাম। সব কথা তাঁরও মনে নেই। তিনিও ভুলে গিয়েছেন অনেক কথা। কিন্তু নিজের চোখে দেখেছেন বলে এই সব তীর্থের সম্বন্ধে একটা ধারণা তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে। এখন তিনি সেই ধারণার কথাই বলছেন।

আমি বললাম: যা বলছেন তার চেয়ে বেশি বলার কি প্রয়োজন আছে! কোন তীর্থ সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশি কিছু জানবার হয়তো প্রয়োজন নেই।

শকুন্তলাদি বললেন: এটা তর্কের কথা। কতকটা রুচির কথাও বটে। কেউ সংক্ষেপে সব কিছু জানতে চায়, আবার কেউ একটা বিষয়েই পণ্ডিত হতে চায়। জীবনে সময়ের যখন একটা পরিমাণ আছে, তখন তা মেনে নিয়েই জ্ঞান সঞ্চয়ের কাজে নামতে হয়। আমার মনে হয় যে জীবনে কোন পরম প্রাপ্তির আশা না থাকলে সব বিষয়েই কিছু কিছু জেনে রাখার সার্থকতা আছে। নিজের চোখে তো পৃথিবী দেখা সম্ভব নয়, আর সব রকম জ্ঞানও আহরণ করা যায় না বই পড়ে। কাজেই এই রকম করে শুনে জানার প্রয়োজনও আছে। একজন মানুষ দীর্ঘ দিন ধরে যা জেনেছেন তা তিনি অনেককে বলবেন। নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে জানার মতো ভাল না হলেও না জানার চেয়ে তা অনেক ভাল।

শকুন্তলাদি তারপর হেসে বললেন: সাধুজী মেনে নিয়েছেন যে শুনে শেখার চেয়ে দেখে শেখা ভাল। শুনে শেখার দুটো বিপদ আছে। একটা হল ভুলে যাবার ভয়, আর একটা ভুল শেখার সম্ভাবনা।

আমি বললাম: সাধুজী কি আমাদের ভুল কথা বলছেন?

শকুন্তলাদি ভর্ৎসনা করে বললেন: পাগল নাকি! সাধুজী আমাদের ভুল কথা বলবেন কেন! তবে অনেক দিনের পুরনো দেখার কথা, যদি কিছু ভুল হয়ে যায় তো তার জন্যে তাঁকে দায়ী করা উচিত হবে না। যেমন একটা তীর্থের কথা তিনি বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন।

কোন্ তীর্থের কথা?

শকুন্তলাদি বললেন: হিংলাজ। এই তীর্থের কথা সাধুজীকে আমি জিজ্ঞেস করে এলাম। সাধুজী বললেন, নিজে ঐ তীর্থ দেখি নি বলেই তার কথা তাঁর মনে পড়ে নি অথচ মনে পড়া উচিত ছিল।

হিংলাজ কোথায়?

আমার প্রশ্নের উত্তরে শকুন্তলাদি বললেন : ভারতের পূর্ব প্রান্তে যেমন চন্দ্রনাথ তেমনি পশ্চিম প্রান্তে হিংলাজ। কিন্তু এই দুটো তীর্থই এখন বিদেশে। হিংলাজ একান্ন পীঠের প্রথম পীঠ, সতীর ব্রহ্মরন্ধ্র পড়েছিল এইখানে। শক্তি কোট্টরী এবং ভৈরব ভীমলোচন। হিংলাজের কথা পড় নি ?

আমি বললাম : না।

শকুন্তলাদি বললেন : সাধুজীর কাছে শুনে আমার জানা কথা একটু গোলমাল হয়ে গেল। আমি জানতাম যে এক সাংঘাতিক মরুভূমির মাঝে সে একেবারে দুর্গম জায়গা, উটের পিঠে চড়ে যেতে হয়। মকরান প্রদেশের মরুভূমির মধ্যে সিন্ধুর মোহনা থেকে আশী মাইল পশ্চিমে আর আরব সাগর থেকে বারো মাইল দূরে এই তীর্থস্থান হিঙ্গল নদীর পশ্চিম তীরে। পাহাড়ের ওপরে একটি কালী মন্দির, স্থানীয় লোক তাকে 'নানী' বলে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : সাধুজী কী বললেন ?

সাধুজী এক সাধুর কাছে এই তীর্থের খবর শুনেছেন। জাহাজে চেপে তিনি করাচী গিয়েছিলেন, সেখান থেকে নগর থাট্টা। তারপর মরুভূমি। 'সেখোর' সঙ্গে উটের পিঠে চড়ে হিংলাজ। যাতায়াতে বারো চোদ্দ দিন সময় লেগেছিল। তীর্থের বর্ণনা কিন্তু অন্য রকম। কালী মন্দিরের কথা কিছু বলেন নি, বলেছেন একটি কুণ্ডের কথা। এক মুসলমান বৃদ্ধা প্রদীপ জ্বেলে অপেক্ষা করে, যাত্রীরা স্নান সেরে বিভূতি মাখে, পরে জ্যোতি দর্শন ও দান পুণ্য করে ফিরে আসে।

শকুন্তলাদি বললেন : আসল কথাটিই জানা হল না।

কী কথা ?

হিংলাজে কালীমন্দির আছে, না শুধুই জ্যোতি দর্শন ?

এবারে আমি একটা কথা বলবার সুযোগ পেয়ে বললাম : তা না জানলেই বা ক্ষতি কি! দেবতা কি মন্দিরের মধ্যে, না মূর্তির মধ্যে! দেবতাকে উপলব্ধির জন্যে খানিকটা শ্রম স্বীকারের দরকার। তীর্থ যাত্রায় সেই শ্রম চাই। তার পরে মূর্তি বা জ্যোতি যাই থাক তাতে কিছুই আসে যায় না। কিছু একটা সামনে রেখে আত্মস্থ হতে পারলেই দেবতার উপলব্ধি হয়। সেই উপলব্ধিই দেবদর্শন।

শকুন্তলাদি আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন। আর আমি লজ্জা পেলাম সেই দৃষ্টির সামনে।



সন্ধ্যাবেলায় হিমালয়ের কথা শুরু হল। সাধুজী বললেন: হিমালয় নিজেই একটা বিরাট তীর্থ। হিমালয়ের নামে দেবতার কথা মনে আসে, মনে হয় যে দেবতার দর্শন পেতে হলে হিমালয়েই যেতে হবে। যুগ যুগ ধরে তাই ভারতের সাধকেরা হিমালয়ে আছেন তপস্যারত। এই তপস্যার শেষ কোন দিন হবে না। দেড় হাজার বছর আগে মহাকবি কালিদাস বলেছিলেন দেবতাত্মা হিমালয়। আজও হিমালয় এই নামেই পরিচিত।

একটু থেমে বললেন: হিমালয় তো ছোট পাহাড় নয়, এই বিরাট দেশের পশ্চিম থেকে পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত সমগ্র উত্তর সীমান্ত জুড়ে আছে হিমালয়। কিন্তু দেবতাত্মা বলতে আমরা সাধারণ ভাবে উত্তর-খণ্ডকেই বুঝি। গঙ্গা যমুনার জন্ম যেখানে হয়েছে এবং শিব ও বিষ্ণু যেখানে প্রতিষ্ঠিত আছেন প্রতিটি গিরিশৃঙ্গে, সেই অঞ্চলই সেরা তীর্থ। এ ছাড়াও হিমালয়ের অন্যত্রও কয়েকটি তীর্থস্থান অধিষ্ঠিত আছে স্বমহিমায়।

এরপর সাধুজী বললেন কাশ্মীরের অমরনাথের কথা। সত্য যুগে স্বয়ম্ভু তুষার লিঙ্গের দর্শন পেয়েছিলেন হিমালয় ভ্রমণরত মহর্ষি ভৃগু। কাশ্মীরে তখন তক্ষক নাগের রাজত্ব। মহর্ষি কশ্যপ তার আগে জল দৈত্য ধ্বংস করে এই উপত্যকাকে বাসোপযোগী করে গিয়েছিলেন। ভৃগু একটি দণ্ড তক্ষকের হাতে দিয়ে বলেছিলেন, অমরনাথের দুর্গম তীর্থে যাত্রার জন্য এই অভয়দণ্ড রাখো। এই দণ্ড নিয়ে যাত্রা করলে পথে কোন বিপদ হবে না। এই কাহিনী সত্য না কল্পিত সে প্রশ্ন অবান্তর। বর্তমানে কাশ্মীরের ধর্মার্থ সঙ্ঘের মোহান্ত একটি রৌপ্য দণ্ডের অধিকারী। তার প্রচলিত নাম ছড়ি। প্রতি বছর শ্রাবণের শুক্লা পঞ্চমীতে এই ছড়ি সামনে নিয়ে অমরনাথ যাত্রা আরম্ভ হয়। সারদা পীঠের শঙ্করাচার্য থাকেন সকলের আগে। দেশ দেশান্তর থেকে যাত্রীরা এসে শ্রীনগরে আমিরাকদলের নিকটে দশনামী আখড়ায় সমবেত হয়। তৎপর হয়ে ওঠেন কাশ্মীর রাজ্য সরকার। পথঘাট ও পুল মেরামত, নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা। ধর্মার্থ বিভাগের কর্মীরা

এই দশ হাজার যাত্রীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যথাসাধ্য আয়োজন করেন।

এখন শ্রীনগর থেকে শুধু সাধু সন্তরাই ছড়ি নিয়ে যাত্রা করেন, আর সামান্য কিছু যাত্রী। অন্য সবাই মোটর বাসে পহালগামে চলে যান। পহালগাম থেকে দ্বাদশীর দিন যাত্রা। অমরনাথের আসল দর্শন হল শ্রাবণের রাখী পূর্ণিমায়। লোকে আষাঢ় ও ভাদ্র পূর্ণিমাতেও যায়। পূর্ণিমায় তুষার লিঙ্গের পূর্ণ অবয়ব। কৃষ্ণা প্রতিপদ থেকে ক্ষয় হতে হতে অমাবস্যার দিন অদৃশ্য হয়ে যান, আবার শুক্লপক্ষে দিনে দিনে তাঁর বৃদ্ধি। প্রায় তের হাজার ফুট উঁচুতে পাহাড়ের গুহার ভিতরে চন্দ্রকলার সঙ্গে ক্ষয় বৃদ্ধি নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়।

সাধুজী বললেন : হিমালয়ের তীর্থ মন্দিরে আবদ্ধ নয়. পথের কথাই হল তীর্থের কথা। এতো আর রামেশ্বর বা সোমনাথ নয় যে ট্রেন থেকে নেমে ধূলো পায়েই দর্শন করা যায়। অমরনাথের জন্য একটা উদ্যোগ পর্ব আছে। তাঁবু চাই, রান্নার সাজসরঞ্জাম খাদ্য দ্রব্য গরম কাপড় ওষুধপত্র, কী না চাই! সবই ভাড়া পাওয়া যায়, আর তা বইবার জন্য আছে কুলি আর ঘোড়া। পয়সা থাকলে নিজেও ঘোড়ায় চেপে কিংবা মানুষের কাঁধে যাওয়া যায় ডাণ্ডিতে চেপে।

পহলগাম থেকেই যাত্রা শুরু। প্রথম পড়াও চন্দনবাড়ি, সাড়ে ন হাজার ফুট উঁচু। লোকালয় শেষ হয়ে গেলে উপত্যকাও সংকীর্ণ হয়ে যায়। এক দিকে নীল গঙ্গা আর অন্য দিকে পাহাড়। সরু পায়ে চলার পথ অসমতল। একজনের পিছনে আর একজনকে চলতে হয় সতর্ক ভাবে। প্রথমে ঘোড়া চলে. তারপরে তাদের রক্ষী, সবার পিছনে যাত্রী। চন্দনবাড়ি থেকে বেরিয়ে খানিকটা এগোলেই পাহাড়ের সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। দেড় হাজার ফুটের একটা চড়াই। পিছল পথ. পা হড়কালে গড়িয়ে একেবারে নিচে। ঘোড়া নয়, ডাণ্ডি নয়, নিজের পা দুখানাই সবচেয়ে নিরাপদ মনে হয়। এ চড়ায়ের নাম পিষু ঘাঁটির চড়াই। এ নাম কেন হল, তা নিয়ে একটা পৌরাণিক গল্প আছে। দেবতাদের সঙ্গে দানবদের যুদ্ধ হয়েছিল এইখানে। পাহাড়ের উপরে দেবতারা অমরনাথের ঘাঁটি আগলাচ্ছেন, আর নিচে থেকে দানবরা বলছে যে তারাও অমরনাথ দর্শনে যাবেন। দু দলে তুমুল যুদ্ধ বাধল। কিন্তু দেবতারা উপরে বলে দানবরা তাদের সঙ্গে পারবে কেন! দেবতারা তাদের পিষে ফেললেন। সেই থেকে এই জায়গার নাম হয়েছে পিষু ঘাঁটি। প্রায় বারো হাজার ফুট উঁচু।

তারপর কুট্টি ঘাঁটির চড়াই পার হয়ে শেষনাগ হ্রদ। পুকুরের মত ছোট হ্রদ, কিন্তু তার অপরূপ রূপ। চারিদিকের বরফের পাহাড় থেকে নদী বেরিয়ে এসে এই হ্রদে পড়েছে। আর এখান থেকে বেরিয়েছে শেষনাগ নদী। এই

দৃশ্য দেখেই স্বামী অভেদানন্দজী বলেছিলেন, চিরতুষারাবৃত হিমাদ্রি চূড়া হচ্ছে মহাদেবের মস্তক, আর ঐ তুষার নদী হচ্ছে তাঁর জটা।

শেষনাগ থেকে বায়ুজান দেড় মাইল দূরে। কেউ বলে ওয়াবজান, আর ঘোড়াওয়ালারা বলে ভাওজান। একটা খোলা মাঠের মধ্যে ঘর আছে। চারি দিকের পাহাড় খানিকটা দূরে। কিন্তু সারাক্ষণ প্রবল বাতাস বয়। লোকে বলে, আগে এই জায়গাটা আরও অশান্ত ছিল। সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে এক শিব ভক্ত দৈত্য এখানে বাস করত। দেবতারা তার অত্যাচারে কাতর ছিলেন। বিষ্ণু শেষনাগকে পাঠিয়েছিলেন তাকে বধের জন্য। তার মৃত্যুর পরেই এই জায়গাটা কিছু শান্ত হয়েছে।

ভাওজান থেকে পঞ্চতরণী উঁচু নিচু পথ, তুষারপাতের জন্য পিছল হয়ে থাকে। দু হাজার ফুটের চড়াই পার হতে হয়। চোদ্দ হাজার ফুট উঁচুতে মহাগুনস এই পথের সব চেয়ে উঁচু জায়গা। নিঃশ্বাসে টান ধরে। অনেকে বমি করে, অসুস্থ হয়ে ফিরেও যায় অনেকে। শুধু মনের জোরেই পৌঁছতে হয় মহাগুনসের শীর্ষে। সেখানে বসে আছেন নগরপাল, বাবা অমরনাথের দ্বারপাল। তাঁর কাছে অনুমতি নিয়ে যাত্রীদের এগোতে হয়। কোন মূর্তি নয়, বিরাট এক শিলাখণ্ড। লোকে বলে এক ঋষি এই পাহাড়ের মাথায় চারি দিকের শোভা দেখতে বসেছিলেন। এখন তুষারে আবৃত শিলা হয়ে বসে আছেন। নানা রঙের ফুল ফুটেছে তাঁর চারিধারে। এর পরে আর চড়াই নেই। একে একে পাঁচটি নদীর বালি আর জল পেরিয়ে পঞ্চতরণীর প্রশস্ত মাঠ। পহলগাম থেকে প্রায় তেইশ মাইল পথ। বিদেশীরা ঘোড়ায় চেপে এক দিনে আসে, আর ভারতীয়েরা আসে তিন দিনে। যারা দুবেলা হাঁটতে পারে তারা আসে দু দিনে। লাদাখের সীমান্ত এখান থেকে ন মাইল।

পঞ্চতরণী হল অমরনাথের পথের শেষ পড়াও। তের হাজার ফুট উপরে অমরনাথে তো মানুষ থাকে না, কাজেই সকালবেলায় যাত্রা করে অমরনাথ দর্শন করে তখনি ফিরে আসতে হয়। প্রথমে ভৈরবঘাট পাহাড়, তারপরে অমরনাথ পাহাড়, মাঝখানে অমরাবতী নদী। হাতের লাঠি ঠুকে সন্তর্পণে নদী পেরোতে হয়। এই নদী মিলেছে অমর গঙ্গার সঙ্গে। তার সাদা জল দেখে অনেকে বলে দুধগঙ্গা। তারপরে আবার খানিকটা চড়াই ভেঙে অমরনাথের বিরাট গুহা দেখতে পাওয়া যায়।

সাধুজী বললেন ঃ এত বড় গুহা সচরাচর দেখা যায় না। চওড়া প্রায় পঞ্চাশ ফুট আর পঁচিশ ফুট উঁচু। গুহার মুখ থেকে কুড়ি পঁচিশ ফুট তফাতে অমরনাথের লিঙ্গ মূর্তি প্রায় তিন ফুট উঁচু। তার দুদিকে আরও দুটি স্তূপ আছে, তা পার্বতী ও গণেশ রূপে পূজিত। আর আছে দুটি পায়রা। পায়রা তো নয়, শিবের অনুচর নন্দী ও ভৃঙ্গী পায়রার

রূপে অমর হয়ে আছেন। কিংবদন্তী আছে যে দেবর্ষি নারদ শিবের সঙ্গে পার্বতীর বিবাদ বাধাতে চেয়েছিলেন। পার্বতীকে বলেছিলেন, শিবের গলায় মুণ্ডমালাটি কিসের জেনে তা নেবেন। পার্বতী সেই কথা শিবকে জিজ্ঞেস করলে শিব বললেন, এ যাবৎ তোমার যত জন্ম হয়েছে এ তারই হিসেব। পার্বতী এই কথা জেনে বললেন, তবে আমাকে তুমি অমর করবে না কেন! শিব বললেন, একটা শর্তে পারি। আমি সারা রাত ধরে গল্প বলব, আর তুমি যে জেগে আছ তা জানাবার জন্যে 'হুঁ' বলে যাবে। পার্বতী সম্মত হলেন এই প্রস্তাবে, আর শিব গল্প বলা শুরু করলেন। কিন্তু গভীর রাতে পার্বতী ঘুমিয়ে পড়লেন। দরজার বাহিরে ছিলেন নন্দী ও ভৃঙ্গী। তাঁরা দেখলেন যে পার্বতী ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাই তাঁরাই 'হুঁ' দিতে লাগলেন। দিনের আলোয় শিব দেখলেন যে পার্বতী ঘুমিয়ে পড়েছেন। আর নন্দী ও ভৃঙ্গী 'হুঁ' দিয়েছে। পার্বতীর বদলে অমর হলেন তাঁরাই। কিন্তু এই অমর কাহিনী যাতে প্রকাশ হয়ে না যায় তার জন্যে তাঁদের পায়রা করে দিলেন। আজ তাই অমরনাথের গুহায় আছে অমর পায়রা। যাত্রীরা তাদেরও দেখতে পায় গুহার কাছে। অমর গঙ্গায় স্নান করে যাত্রীরা অঞ্জলি ভরে বনফুল তোলে, পূজা করে অমরনাথের। কেউ হাসে, কেউ কাঁদে, কেউ দাঁড়িয়ে থাকে স্তম্ভিত হয়ে। প্রাণান্তকর পরিশ্রমের ফল পেয়েছে তারা, জীবন সার্থক হয়েছে। এই অভূতপূর্ব আনন্দ নিয়েই সবাই ফেরে।

সাধুজী বললেন : জম্মু প্রদেশেও একটি তীর্থস্থান আছে, তার নাম বৈষ্ণোদেবী। জম্মু থেকে বাসে তিরিশ মাইল দূরে কাটরা থেকে পায়ে হেঁটে যেতে হয়। সাত আট মাইল পথ। শেষ পথটুকু নাকি খুবই কষ্টের। আমি নিজে যাইনি বলে তার বর্ণনা দিতে পারব না।



তারপরে বললেন, অমরনাথ দর্শনের পর জ্বালামুখী দেখার কোন অসুবিধা নেই। পাঠানকোটের এক দিকে যেমন জম্মু ও কাশ্মীর, তেমনি অন্য দিকে কাংড়া উপত্যকায় জ্বালামুখী।

পাহাড়ের উপরে জ্বালামুখীর মন্দির, নিচে দাঁড়ায় বাস। ধর্মশালা আছে নিকটে, পাণ্ডাও অনেক। জ্বালামুখী পীঠস্থান, জিহ্বা পীঠ, সতীর জিহ্বা পড়েছিল এইখানে। শিবও আছেন, তাঁর নাম উন্মত্ত ভৈরব। যে পাহাড়ে মন্দির, তার নাম কালীধর। পাহাড় বেশি উঁচু নয় বলে সকল যাত্রীই হেঁটে ওঠে।

সাধুজী একটু ভেবে বললেন ঃ এই পীঠস্থান আবিষ্কারের একটি গল্প আছে। সত্যযুগে ভূমিচন্দ্র নামে এক রাজা জানতে পেরেছিলেন যে এই পাহাড়ে সতীর জিহ্বা পড়েছে এবং দেবতাদের তেজে তা জ্বলছে। তিনি সেই স্থান নির্ণয়ের জন্য অনেক অনুসন্ধান করে ব্যর্থ হলেন। তারপর নগরকোটে একটি ছোট মন্দির নির্মাণ করলেন। এক দিন একজন গোয়ালা রাজাকে সংবাদ দিল যে সে পাহাড়ের এক জায়গায় আগুন দেখেছে। রাজা এসে নিজেও তা দেখলেন এবং সবই বুঝতে পারলেন। তখনই তিনি এই জ্বালামুখী মন্দির নির্মাণ করে দিলেন, আর পূজার জন্য দুজন ব্রাহ্মণ আনলেন শকদ্বীপ থেকে। এখনও নাকি এই দুই ব্রাহ্মণের বংশধরেরাই পূজা করছেন। এঁরা বলেন যে দ্বাপরে পঞ্চপাণ্ডব এসেছিলেন এখানে, এই মন্দির বড় করেছিলেন তাঁরাই।

সাধুজী বললেন ঃ ব্রাহ্মণদের কাছে একটি ঐতিহাসিক গল্পও শোনা যায়। ফিরোজ তুঘলক নাকি এই মন্দির ধ্বংস করতে এসেছিলেন। দেবীর মহিমায় লক্ষ মৌমাছি তাঁকে আক্রমণ করে তাড়িয়ে দেয়। দেবীর মাহাত্ম্য দেখে আকবর বাদশাহ এখানে একটি ছত্র নির্মাণ করে দিয়ে যান। পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ এই মন্দিরের চূড়া সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়েছেন।

মন্দিরের দেওয়ালে নানা জায়গায় আগুনের শিখা অনির্বাণ জ্বলছে। মনে হয় এই আগুন পাহাড়ের দেহে থেকেই জ্বলছে। মূল মন্দিরের মাঝখানে একটা ছোট কুণ্ড, তারও চারিধারে আগুন জ্বলছে। কোন মূর্তি নেই, কোন চিত্র নেই, কোন মঙ্গল কলস নেই, কোন অলঙ্কার আভরণ নেই, নেই কোন বিচিত্র বিজ্ঞাপন। পূজারী ব্রাহ্মণ বলেন, এই হল দেবী জ্বালামুখী, এখানেই প্রণাম করুন। বলে কুণ্ডের জলেও আগুন দেখিয়ে দেন।

এক রকমের গম্ভীর ভাবে হৃদয় পূর্ণ হয়ে যায়। আপনা থেকে মাথা নত হয়ে আসে। কৌতূহলী যাত্রীকে ব্রাহ্মণেরা দেখিয়ে দেন আগুনের কোন শিখা নিভিয়ে দিলেও আবার জ্বলে ওঠে। যাদের বৈজ্ঞানিক মন অবিশ্বাসী তারা বলাবলি করে যে এ নিশ্চয়ই কোন গ্যাসের ব্যাপার। কিন্তু মন্দিরের ভিতরে এ সব আলোচনা ভাল লাগে না। বিশ্বাস দিয়েই তো দেবতাকে আমরা বাঁচিয়ে রাখি। এই বিশ্বাস কেউ কেড়ে নিতে চাইলে মন যেন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।



জ্বালামুখীর কথা শেষ করে সাধুজী হরিদ্বারের কথা শুরু করলেন। অযোধ্যার কথা বলবার পরে তিনি হরিদ্বারের কথা বলেন নি। রামের কথার পর বলেছিলেন কৃষ্ণের কথা।

সাধুজী বললেন ঃ মোক্ষদায়িকা সপ্ত পুরীর তালিকায় মায়া নামের একটি তীর্থ আছে। হরিদ্বারেরই নাম মায়া, গঙ্গাদ্বার এর অন্য নাম।

হরিদ্বারের নামে আমার হর কী পৌড়ির কথা প্রথমেই মনে পড়ে।

স্টেশন থেকে যে রাস্তা এসেছে, তা এই হর কী পৌড়ির পাশ দিয়ে হৃষীকেশ গেছে। পথের ধারে বড় বড় বাড়ি ও ধর্মশালা গায়ে গায়ে লেগে আছে। হর কী পৌড়ি আমার কাছে একটি বিচিত্র স্থান বলে মনে হয়। চারিদিক বাঁধানো যেন একটি জলাশয়। গঙ্গার ধারা এক ধার দিয়ে প্রবেশ করে অন্য ধার দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। মাঝখানে ব্রহ্ম কুণ্ড। পুণ্যার্থীরা এই কুণ্ডে স্নান করেন, ঘাটে বসে সাধন ভজন করেন। ঘাটের উপরেই গঙ্গা গায়ত্রী রামচন্দ্র বদরীনাথ ও লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির। কুণ্ডের জলের মধ্যে যে গোলাকার মন্দির, তা মহারাজ মানসিংহের ছত্রী। আকবর বাদশাহ তাঁর আজীবনের বিশ্বস্ত সেনাপতি মানসিংহের অস্থি এইখানে বিসর্জন দিয়ে এই স্মৃতি সৌধটি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। মূল গঙ্গা ও হর কী পৌড়ির মাঝখানে প্রশস্ত ঘাট তীরের বাঁধানো ঘাটের সঙ্গে পুল দিয়ে যুক্ত। এরই এক পাশে একটি উঁচু ঘণ্টা ঘর, আর দুটি পাথরের মূর্তি। একটি মূর্তি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের।

সাধুজী বললেন ঃ বিকেল থেকেই যাত্রীরা এসে এই ঘাটে জমা হয়। প্রথমে পাতার ডালায় প্রদীপ জ্বেলে ব্রহ্মকুণ্ডের জলে ভাসিয়ে দেয়। সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই দীপশিখার ছায়া পড়ে গঙ্গার জলে। স্রোতের টানে ভেসে চলে যায়। একটা দুটো নয়, অসংখ্য দীপ। মানুষের বাসনার শেষ নেই। এক একটি বাসনার জন্য এক একটি দীপ জ্বেলে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেয়। আর ভাবে তাদের বাসনাটি গেল গঙ্গার জলে ভেসে। অন্ধকার

গভীর হলে আরতি শুরু হয়। গঙ্গার আরতি। ব্রাহ্মণেরা ধূপ দীপ কর্পূর আরতি শুরু করেন। কাঁসর ঘণ্টার ধ্বনিতে দশ দিক মুখর হয়ে ওঠে। যাত্রীরা চারি দিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে স্তব্ধ হয়ে এই দৃশ্য দেখে। আলো, আরো আলো, ব্রাহ্মণদের হাতের আলোয় যেন আগুন লাগে। জলের উপরে তার প্রতিবিম্ব ওঠে দুলে। অপরূপ দৃশ্য, এ দৃশ্যের তুলনা কোথাও নেই।

সাধুজী বললেন ঃ এখান থেকে মাইল দুই দক্ষিণে গঙ্গার তীরে ছিল দক্ষ প্রজাপতির বাসস্থান। এই স্থানের নাম এখন কনখল। পুরাণের দক্ষ যজ্ঞ হয়েছিল এইখানে। সতী এখানেই দেহত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু হরিদ্বার তবু পীঠস্থান হয় নি। অনেকে অবশ্য বলেন যে সতীর অধর এইখানে পড়েছিল। দেবী ভৈরবী, আর ভৈরব বক্র। কনখলে এখন দক্ষের একটি মন্দির আছে। গঙ্গার ধারে ছায়া শীতল পরিবেশে এই মন্দিরে দক্ষেশ্বর মহাদেবও আছেন। কনখলের আর এক ধারে একটি কুণ্ড আছে, তার নাম সতীকুণ্ড। স্থানীয় লোকেরা বলে যে এই কুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে সতী দেহত্যাগ করেছিলেন।

হরিদ্বার ও কনখলের মধ্যে মায়াপুর একটি প্রাচীন স্থান। কিছু ধ্বংসাবশেষ নাকি এখনও আছে। লোকে বলে, তা পৌরাণিক যুগের রাজা বেণের জীর্ণ দুর্গের চিহ্ন। এখন আর লোকে এই দুর্গ দেখতে যায় না, কিন্তু হরিদ্বারের প্রাচীন নাম যে মায়া ছিল, এ তারই প্রমাণ।

কুশাবর্ত তীর্থে ঋষি দত্তাত্রেয় দশ হাজার বছর তপস্যা করেছিলেন। এই তীর্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি কাহিনী শোনা যায়। গঙ্গার তীরে এক পায়ে দাঁড়িয়ে তিনি যখন তপস্যা করছিলেন, সেই সময়ে গঙ্গা স্ফীতা হয়ে ঋষির দণ্ড বস্ত্র ও কুশ ভাসিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ঋষির তপস্যার প্রভাবে ব্যর্থ হন। সেই জিনিসগুলি গঙ্গার জলে বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে। ঋষি ক্রুদ্ধ হয়ে গঙ্গাকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতারা এসে বাধা দেন। ঋষি বলেন, যদি তোমরা এই তীর্থে সারাক্ষণ বিরাজ কর, তাহলেই আমি অভিশাপ দেব না। দেবতারা বলেন, তথাস্তু। সেই থেকে এই স্থানের নাম হল কুশাবর্ত তীর্থ।

শ্রবণনাথ মহাদেবের মন্দির এই তীর্থেরই নিকটে। মহাদেবের মূর্তি পঞ্চমুখ। শঙ্খ পাথরের বিরাট নন্দীশ্বর মূর্তি। শ্রবণনাথ এক সাধুর নাম। তিনি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে তাঁর নামেই মহাদেবের নাম। এই সাধুর নামেও অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। একবার নাকি তিনি ভাণ্ডারা করেন। সন্ন্যাসী অতিথিরা আহার করবে। বিরাট আয়োজনে ঘি কম পড়ে যায়। শিষ্যদের মাথায় বজ্রাঘাত। স্বামীজীকে

বলতেই তিনি বললেন, গঙ্গার কাছে চেয়ে নাও। কী আশ্চর্য ব্যাপার! শিষ্যরা গঙ্গার তীরে পেঁছিতেই আকাশ বাণী হল, টিন ভর্তি করে নাও। গঙ্গার জলই ঘি হল।

মনসা দেবীর পুরনো মন্দির শিবালিক পাহাড়ের মাথায়। দেবীর তিন মাথা ও পাঁচ হাত। পাশে দেবী অষ্টভুজা ও তাঁর ভৈরবের মন্দির। গঙ্গার অপর পারে যে পাহাড় তার নাম নীল পর্বত কেন হল সে সম্বন্ধে একটি কাহিনী আছে। অবন্তিকাপুরের এক ব্রাহ্মণের নাম অশ্বচিত্র। কঠিন দারিদ্র্যের জন্য সে চুরি করতে শুরু করে। একদিন সে চুরি করবার জন্য মায়াপুরে এসে উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু এই স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে তার মন আধ্যাত্মিক ভাবে ভরে যায়। এই পাহাড়ে উঠে সে মহাদেবের চিন্তায় মগ্ন হয়। অনাহারে অনিদ্রায় সাত দিন সাত রাত কাটবার পর মহাদেব তাকে দর্শন দিলেন। নীলকণ্ঠ মহাদেবের বরে এই পাহাড়ের নাম নীল পর্বত হয়, আর অশ্বচিত্রের নামও এই সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে।

সাত আট মাইল দূরে, আর একটি পাহাড়ের উপরে চণ্ডী দেবীর মন্দির। ভীমগোড়ার কুণ্ড ও মন্দির হর কী পৌড়ির খুবই নিকটে। খানিকটা দূরে সপ্ত সরোবর। গঙ্গা এখানে শত ধারায় প্রবাহিত হয়ে আবার মিলিত হয়েছেন। পুরাকালে সপ্ত ঋষি এখানে তপস্যা করেছিলেন। আর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর এখানে দেহত্যাগ করেছিলেন। দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমের নামে ভীমগোড়া নাম। ভগীরথ যখন স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে আনলেন, তখন গঙ্গাকে পথ দেখাবার জন্য ভীম এখানে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁরই ঘোড়ার ক্ষুরে কুণ্ড তৈরি হয়েছে।

সাধুজী বললেন: আশ্চর্যের কথা এই যে এখানে কোন দেবতাকে নিয়ে উৎসব হয় না। গঙ্গাই এখানে দেবতা। কুম্ভযোগে গঙ্গাস্নান এখানকার সব চেয়ে বড় উৎসব।



সাধুজী একটু থেমে বললেন: হরিদ্বার থেকে হৃষীকেশ চোদ্দ মাইল পথ। ট্রেনে যাবার যেমন আরাম আছে তেমনি শহরের মধ্য দিয়ে বাসে যাবারও

একটা আনন্দ আছে। পথে সাত মাইলে সত্যনারায়ণের মন্দির। সেখানে বাস দাঁড়ায়। হৃষীকেশের বাজারে না থেমে লছমনঝুলার পুল পর্যন্ত নিয়ে যায়। টেনে এসে প্ল্যাটফর্মে নামলে এই পথটুকু টাঙ্গায় যেতে হয়।

হৃষীকেশ থেকে একটা পায়ে চলার পথ লছমনঝুলার ঝোলানো পুল পেরিয়ে দেবপ্রয়াগের দিকে গেছে। গঙ্গার অপর পার দিয়ে এখন মোটরের পথ দেবপ্রয়াগে যায়। ভাগীরথী ও অলকনন্দার সঙ্গম দেবপ্রয়াগে। আরও কিছু দূর এগিয়ে অলকনন্দার এক তীরে কীর্তিনগর ও অন্য তীরে শ্রীনগর। শ্রীনগর থেকে রুদ্র প্রয়াগ। মন্দাকিনী এখানে মিলেছে অলকনন্দার সঙ্গে। কোটদ্বার থেকে যে পথ উত্তরাখণ্ডে এসেছে, সে পথ মিলেছে শ্রীনগরে।

হৃষীকেশ থেকে যারা গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী যাবে, তারা নরেন্দ্রনগরের উপর দিয়ে টিহ্‌রি হয়ে উত্তরে যাবে। ধরাসু ছাড়িয়ে যমুনোত্রীর পথ আলাদা হয়েছে। এই পথে বড়কোট একটি জায়গা। মসুরি থেকে এখন বড়কোট পর্যন্ত সরাসরি বাস যাতায়াত করছে। গঙ্গোত্রী যেতে হলে ধরাসু থেকে সোজা এগিয়ে যেতে হয় উত্তর কাশী। সেখানে গঙ্গোত্রী যাবার অনুমতি পত্র নিয়ে আবার বাসে চাপতে হয়।

রুদ্র প্রয়াগ হল কেদারবদরীর পথের সঙ্গমে। যারা কেদারনাথ যাবে, তারা উত্তরের পথ ধরে মন্দাকিনীর ধারে ধারে এগোবে। কুণ্ডচটি ও গুপ্তকাশী ছাড়িয়ে সোমপ্রয়াগ পর্যন্ত বাস চলছে। তার পরে দশ এগারো মাইল হাঁটতে হয় যাত্রীদের। বদ্রীনাথ যেতে এখন আর একেবারেই হাঁটতে হয় না। অলকনন্দার তীরে তীরে কর্ণ প্রয়াগ চামোলি পিপুলকোটি যোশীমঠ বিষ্ণু প্রয়াগ হয়ে মোটর বাস এখন বদ্রীনাথ গিয়ে পৌঁছায়। কেদারনাথের পথে কুণ্ড চটি থেকে বদ্রীনাথের পথে চামোলি পর্যন্ত মোটরের রাস্তা হয়েছে। উত্তরাখণ্ডের এই বিরাট এলাকা এখন মানুষের কব্জায়।

সাধুজী থামতেই তাউজী বললেন: এতগুলি তীর্থের কথা আপনি এমন সংক্ষেপে বললেন।

সাধুজী সহাস্যে বললেন: লছমনঝুলায় লক্ষ্মণের মন্দির আছে। দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ভাগীরথী গঙ্গা। নীচে জলের ধারা আর উপরে ঝোলানো পুল। লোহার তার দিয়ে দুধারের পাহাড়ের সঙ্গে বাঁধা। এ ধারে যেমন ধর্মশালা ও মন্দির আছে ওধারেও তেমনি। লক্ষ্মণের মন্দিরটিই সবচেয়ে ভাল। হৃষীকেশে ভরতের মন্দির আছে, আর রামচন্দ্রের মন্দির দেবপ্রয়াগে। শত্রুঘ্নের মন্দির কোথায় আছে তা জানি নে। লক্ষ্মণ এখানকার তপোভূমিতে কঠোর তপস্যা করে শান্তি লাভ করেছিলেন, আর যাত্রীদের তীর্থযাত্রার জন্য গঙ্গার উপরে নির্মাণ করেছিলেন

একটি সেতু। এই সেতুই এখনও লক্ষ্মণঝুলো নামে পরিচিত। স্থানেরও একই নাম। কিন্তু রামায়ণে এ কথার উল্লেখ নেই। রাম লক্ষ্মণ ও ভরতের মন্দির দেখেই লোকে এই কথা বল। আর পাহাড়ের উপরে উঠে মনে পড়ে পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থানে যাত্রার কথা।

উত্তরাখণ্ডে আছে চারটি-ধাম—যমুনোত্রী গঙ্গোত্রী কেদার ও বদরী। যাত্রীরা একে একে এই চার ধাম দর্শন করে। এর একটি নির্দিষ্ট ক্রম আছে—যমুনোত্রী থেকে গঙ্গোত্রী, তারপর কেদারনাথ, বদ্রীনাথ সকলের শেষে।

যমুনোত্রীর পথে নরেন্দ্র নগর হল প্রথম শহর। হৃষীকেশ থেকে দশ মাইল দূরে প্রায় চার হাজার ফুট পাহাড়ের উপরে একটি সুন্দর শহর। আরও তেতাল্লিশ মাইল উত্তরে টেহরি শহর দু হাজার ফুটেরও কম উঁচু। ভাগীরথী ও ভীলাঙ্গনা নদীর সঙ্গমে এই শহরটি একটি চৌরাস্তার উপরে। চল্লিশ মাইল পথ এসেছে মসুরি থেকে, কীর্তি নগরের পথ পঁয়ত্রিশ মাইল আর গঙ্গোত্রী যমুনোত্রীর পথে ধরাসু ছাব্বিশ মাইল দূরে। এ ছাড়া একটি হাঁটা পথ ভাগীরথীর তীরে তীরে এসেছে দেবপ্রয়াগ থেকে। এ পথের দূরত্বও চৌত্রিশ মাইল।

ধরাসু গ্রামটি প্রায় সাড়ে তিন হাজার ফুট উঁচুতে ভাগীরথী নদীর তীরে। একটু খানি এগিয়ে যমুনোত্রীর পথ বেরিয়েছে বাঁ হাতে। ছাব্বিশ মাইল দূরে বড়কোট নামে একটি বড় গ্রাম প্রায় পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে। মাসুরি থেকে এখন বড়কোট পর্যন্ত বাস আছে। ষাট মাইল দূরে মাসুরি, আর যমুনোত্রী পঁচিশ মাইল দূরে। মোটরের পথ আরও মাইল সাতেক এগিয়ে গেছে। যমুনোত্রীর পথে শেষ গ্রাম হল খরশালি। দশ হাজার আটশো ফুট উঁচুতে অবস্থিত যমুনোত্রীতে রাত্রিবাস কষ্টসাধ্য বলে পাণ্ডাদের বাস এই গ্রামেই। যমুনার অপর পারে আছে বীফা গ্রাম, তার নাম মার্কণ্ডেয় তীর্থ। একটি উষ্ণ প্রস্রবণ থেকে গন্ধকের জল বেরোয়। খরশালি থেকে যমুনোত্রী চার মাইল দূরে। এক মাইল সমতলের পরে দেড় মাইলের শেষ চড়াই, তারপরে আবার সমতল। যমুনোত্রীর মন্দিরে পৌঁছে সমস্ত কষ্টের অবসান হয়ে যায় সৌন্দর্য দেখে। সামনে বন্দরপুঁছ পর্বতের উদার বিস্তার। তারই তলদেশ দিয়ে যমুনার ধারা গলে নেমে আসছে। চারি দিক পাহাড়ে ঘেরা বলেই এ জায়গাটি খুব ঠাণ্ডা। কয়েকটি গরম জলের কুণ্ডেই যাত্রীরা চাল ডাল ও আলু সেদ্ধ করে নেয়। গামছায় বেঁধে জলে ফেলে দিলেই সেদ্ধ হয়ে যায়। আর যারা ঠাকুর দেখতে যায়, তারা একটা ছোট মন্দিরের মধ্যে যমুনার মূর্তি দেখে। কিন্তু দেবতা তো এখানে বড় নয়, বড় এই সুন্দর পৃথিবী। যা সুন্দর, তাই তীর্থ। সুন্দরের সাধনা করেই তো আমরা দেবতাকে পাই। দেবতাও যে সুন্দর!



সাধুজী বললেন : যাত্রীরা এখন বাসে চেপে ধরাসু এসে অন্য বাসে উত্তর কাশীতে আসছে। উত্তর কাশীতে অনুমতি পত্র নিয়ে এগোতে হয়। থানায় গিয়ে দরখাস্ত করলে এক দিনেই অনুমতি পত্র পাওয়া যায়। তার পরে আবার বাসে যাত্রা।

উত্তরকাশীকেও তীর্থস্থান বলা চলে। বিশ্বনাথের মন্দির আছে শহরের মাঝখানে। শক্তি একাদশ রুদ্র পরশুরাম ও কালীর মন্দির আছে। আর আছে একটি আধ্যাত্মিক পরিবেশ, ভারতের আর কোথাও যা নেই।

শহর থেকে মাইল খানেক দূরে উজেলি নামে একটি গ্রাম আছে। সেই গ্রামে শুধু সাধু মহাত্মাদের বাস। গঙ্গোত্রী যাবার পথে গঙ্গার ধারে পাহাড়ের পায়ে তাঁরা কুঠিয়া নির্মাণ করে সাধন ভজন করেন। অনেক আশ্রম আছে সাধু সন্ন্যাসীদের। নানা শাস্ত্রের অধ্যয়ন আছে এই সব আশ্রমে। আর সব চেয়ে বড় কথা এই যে এই সব সাধু মহাত্মাদের ভিক্ষা করার প্রয়োজন হয় না, হাত পাতেন না যাত্রীদের কাছে। পয়সার অভাবে তাঁদের সাধনারও কোন ব্যাঘাত হয় না। দুটি সদাব্রত প্রতিষ্ঠান আছে, একটি কালী-কমলিওয়ালার আর একটি পাঞ্জাব-সিন্ধু ক্ষেত্রের। প্রত্যেক সাধু মহাত্মাকে প্রতি দিন সদাব্রত থেকে রুটি ও ডাল দেওয়া হয় সকাল বেলায়। যাঁরা দুবেলা আহার করেন তাঁরা দু জায়গায় যান। শুনে আশ্চর্য হতে হয় যে একজন সাধু এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর নাম স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী। সারাক্ষণ তিনি একখানি কম্বল ব্যবহার করতেন বলে তিনি কালী কমলি-ওয়ালা বলে পরিচিত ছিলেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে হৃষীকেশে তাঁর ক্ষেত্র স্থাপিত হয়। এখন এই ক্ষেত্রের নব্বইটি ধর্মশালা, পঞ্চাশটি সদাব্রত, সত্তরটি পিয়াও মানে পানীয় জলের ব্যবস্থা, ছটি মন্দির, আটটি চিকিৎসালয়, পাঁচটি গোশালা, দুটি অনাথাশ্রম ও একটি আয়ুর্বেদ সংস্কৃত পাঠশালা চলছে উত্তরাখণ্ডে। অনেক স্থানে পথ ও পুল নির্মাণও করে দিয়েছেন। সাধু মহাত্মা ও তীর্থ যাত্রীর জন্য এমন ব্যবস্থা আর কোন প্রতিষ্ঠান করেছেন কিনা জানা নেই।

মহাভারতে জতুগৃহ দাহের কথা আছে। সেই জতুগৃহদাহ হয়েছিল এইখানে। যেখানে জতুগৃহদাহ হয়েছিল সেই জায়গাটি এখনও আছে।

উত্তরকাশী থেকে গঙ্গোত্রীর পথে ভৈরোঁ ঘাঁটি পর্যন্ত পথ অতি সুন্দর। ভৈরোঁ ঘাঁটি গঙ্গোত্রীর ছ মাইল নিচে ভাগিরথীর সঙ্গে জাহ্নবী বা জাড গঙ্গার সঙ্গমের কাছে। এই সঙ্গমের উপরে খাদের দিকে আছে ভৈরবের মন্দির। বিশাল পাহাড় আর দেবদারুর বন দেখে যাত্রীরা স্তম্ভিত হয়ে যায়। এখান থেকে একটি পথ গেছে মানস সরোবর ও কৈলাসের দিকে। ন হাজার ফুট উঁচু ভৈরোঁ ঘাঁটিতে শীত খুব বেশী নয়। দেওদার বনে ঘেরা এ জায়গাটিতে গন্ধক আছে বলেই কিছু উষ্ণ।

তার পরেই গঙ্গোত্রী, তার উচ্চতা দশ হাজার তিনশো ফুট। হৃষীকেশ থেকে এই স্থানের দূরত্ব একশো আটাত্তর মাইল। যমুনোত্রী এর চেয়ে নিকটে। তার দূরত্ব একশো চৌত্রিশ মাইল। তবু এখনও মোটর গাড়ির পথ যমুনোত্রী জয় করে নি, করেছে গঙ্গোত্রী জয়।

গঙ্গা এখানে উত্তর বাহিনী বলেই নাম গঙ্গোত্তরী বা গঙ্গোত্রী। যমুনোত্রীতেও তাই। যমুনাও সেখানে উত্তর বাহিনী বলে যমুনোত্তরী বা যমুনোত্রী বলা হয়। কিন্তু যমুনোত্রীর মতো গঙ্গোত্রী গঙ্গার উৎস নয়। গঙ্গার উৎস দেখা যায় না। দুর্গম পথে চৌদ্দ মাইল দূরে আরও আড়াই হাজার ফুট উপরে উঠলে গোমুখ নামে এক গুহার সামনে পৌঁছান যায়। মনে হয় যে গঙ্গার জন্ম সেই গুহা থেকে। কিন্তু তাও নয়। বদ্রীনাথের কাছে চৌখাম্বা নামের তুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গগুলি থেকে আরম্ভ করে গোমুখ পর্যন্ত বিস্তৃত গঙ্গোত্রী হিমবাহ। সাড়ে তের হাজার ফুট উঁচু এই হিমবাহের কোন্ স্থানে গঙ্গার জন্ম হয়েছে তা দেখা যায় না। যারা তিব্বতের দিক থেকে আসে তারা বলে যে গোমুখ থেকে চল্লিশ মাইল দূরেও ভাগীরথী গঙ্গাকে দেখা যায়। কিন্তু আমরা গোমুখকেই গঙ্গার উৎস স্থল ভাবি। এই জনহীন পথে একটি রাত্রি বাস করতে হয়।

সাধুজী বললেন : পাহাড়ের উপরে গঙ্গা ভাগীরথী নামেই পরিচিত। গঙ্গা নাম হয়েছে সমতল ভূমিতে। স্বর্গ থেকে গঙ্গা এনেছিলেন ভগীরথ। তার জন্য তিনি এই গঙ্গোত্রীতে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। গঙ্গা সম্মত হয়েছিলেন স্বর্গ থেকে অবতরণ করতে, কিন্তু তাঁর বেগকে ধারণ করবে! ভগীরথ আবার তপস্যা করে মহাদেবকে এই কাজে রাজী করেছিলেন। এখানে তাই ভগীরথের নামেই গঙ্গার নাম ভাগীরথী।

পৌরাণিক যুগে আর একটি ঘটনা ঘটেছিল এইখানে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর পঞ্চপাণ্ডব আত্মীয় বন্ধুজনের প্রায়শ্চিত্তের জন্য এই তীর্থে এসে দেবযজ্ঞ করেছিলেন।

এখন এখানে একটি মন্দির আছে, গঙ্গার মন্দির। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই সুন্দর মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন অমর সিং থাপা। যমুনোত্রীর মতো নির্জন নয় গঙ্গোত্রী। এখানে বাসস্থান বেশি, দোকান-পাটও আছে, সাধু সন্ন্যাসী পাণ্ডা পূজারী ও যাত্রী সমাগমে বছরের ছটি মাস এই তীর্থ মুখর হয়ে থাকে।



সাধুজী বললেন: গঙ্গোত্রীর পরে কেদারনাথের কথা। এখন গঙ্গোত্রী থেকে ফিরতে হয় উত্তরকাশী টেহরি হয়ে শ্রীনগর। শ্রীনগর প্রধান রাজপথের উপরে। হৃষীকেশ থেকে সমস্ত বাস শ্রীনগরের উপর দিয়ে কেদার বদরীর পথে যায়। কেদারনাথ যেতে হলে রুদ্রপ্রয়াগ থেকে উত্তরের পথ ধরতে হবে। হৃষিকেশ থেকে কেদারনাথের দূরত্ব একশো আটাশ মাইল। সকাল বেলায় হৃষীকেশ থেকে যাত্রা করলে মোটর বাস দেবপ্রয়াগ কীর্তিনগর শ্রীনগর রুদ্রপ্রয়াগে থেমে সন্ধ্যার আগেই সোম প্রয়াগে নামিয়ে দেবে।

দেব প্রয়াগে অলকনন্দা ও ভাগীরথীর সঙ্গম থেকেই ভাগীরথীর নাম হয়েছে গঙ্গা। হৃষীকেশ থেকে বিয়াল্লিশ মাইল দূরে এই ছোট শহরটি প্রায় দেড় হাজার ফুট উঁচুতে। বদ্রীনাথের পাণ্ডাদের বাস এইখানে। রঘুনাথজীর বিরাট মন্দির দেড় শো বছর আগে ভূমিকম্পে ভেঙ্গে পড়েছিল। নতুন করে গড়া হয়েছে। রাবণ বধের পরে ব্রহ্মহত্যার পাপ স্খালনের জন্যে রাম এইখানে তপস্যা করেছিলেন দীর্ঘকাল। সেই স্মৃতি রক্ষার জন্যই এই মন্দিরটি এখানে নির্মিত হয়েছে।

দেবপ্রয়াগ থেকে একুশ মাইল দূরে কীর্তিনগর। টিহরি গারোয়াল রাজ্যের মহারাজা কীর্তি শাহর নামে এই শহরের নাম। অলকনন্দার পরপারে তিন মাইল দূরে শ্রীনগর এর চেয়ে বড় শহর। এক সময় এও রাজ্যের রাজধানী ছিল। গত শতাব্দীর শেষে গোহনা লেকের বন্যায় শহরটি ধ্বংস হয়ে যাবার পরে নতুন করে আবার গড়ে উঠেছে। কমলেশ্বর শিবের সম্বন্ধে একটি অলৌকিক কাহিনী এখানে প্রচলিত আছে। রাম যখন এই শিবের পূজো করতেন তখন তাঁর নাম কমলেশ্বর ছিল না। সহস্রাক্ষ রুদ্ররূপে

শিবের পূজা করবার জন্য তিনি এক হাজার কমল সংগ্রহ করলেন। কিন্তু শিব তাঁর ভক্তি পরীক্ষার জন্য একটি পদ্ম হরণ করলেন। একটি একটি করে রাম সেই পদ্ম দেবতাকে নিবেদন করে দেখলেন যে একটি পদ্ম হয়েছে। তিনি কোন দ্বিধা না করে তখনই নিজের একটি চোখ উপড়ে সেই অভাবটি পূরণ করলেন। সেই দিন থেকেই শিবের নাম হল কমলেশ্বর। শীতের প্রারম্ভে বৈকুণ্ঠ চতুর্দশী রাতে এই মন্দিরে একটি উৎসব হয়। সন্তান কামনায় নারীরা এসে ঘিয়ের প্রদীপ হাতে নিয়ে দাঁড়ায় মন্দিরের চারিধারে। সেই দীপ শিখা যদি সারা রাত ধরে জ্বলে তাহলে দেবতার কৃপা হয়েছে বলে তারা বিশ্বাস করে।

এখান থেকে বাইশ মাইল এগোলে রুদ্র প্রয়াগ। সেখানে মন্দাকিনী ও অলকনন্দার সঙ্গম প্রায় দু হাজার ফুট উঁচুতে। রুদ্রনাথ শিবের নামে শহরের নাম হয়েছে রুদ্র প্রয়াগ। দেবর্ষি নারদ এখানে রুদ্রনাথের দর্শনের জন্য তপস্যা করেছিলেন। রুদ্রনাথের পথ অলকনন্দার উপত্যকা ধরে, আর মন্দাকিনীর ধারে ধারে এগিয়েছে কেদারনাথের পথ।

এগার মাইল দূরে অগস্ত্যমুনির উচ্চতা প্রায় তিন হাজার ফুট। ঋষি অগস্ত্য এইখানে তপস্যা করেছিলেন। তাঁর একটি মন্দির আছে। এমনি কত মন্দির আছে এই পথের ধারে ধারে তার কোন হিসাব নেই। আরও এগার মাইল এগিয়ে কুণ্ড চটি। এইখান থেকেই দুটি পথ দুই পাহাড়ে উঠেছে। মন্দাকিনীর এ পার থেকে যে পথ উঠেছে তা উখীমঠ ও গোপেশ্বর হয়ে চামোলি যাবে। চামোলি বদ্রীনাথের পথে। এই পথের ধারেই অনুসূয়া ও তুঙ্গনাথ। কেদারনাথের পথ অন্য। সে পথ মন্দাকিনীর পুল পেরিয়ে গুপ্ত কাশীতে উঠবে। নদীর ধার থেকে মাইল দুই দূরে গুপ্ত কাশী। কিন্তু দুরন্ত চড়াই। চার হাজার আটশো পঞ্চাশ ফুট। এই পথের ধারে চন্দ্রাপুরীতে চন্দ্রা নদী মিলিত হয়েছে মন্দাকিনীর সঙ্গে। চটিতে চন্দ্রশেখর মহাদেব ও দুর্গার মন্দির আছে। গুপ্ত কাশীতেও আছে দুটি প্রাচীন মন্দির। তার মধ্যে একটি চন্দ্রশেখর মহাদেবের, অন্যটি অর্ধনারীশ্বরের। এই গুপ্ত কাশী থেকে উখীমঠ দেখা যায় পরিষ্কার ভাবে। মন্দাকিনীর এপারে গুপ্তকাশী, ওপারে উখীমঠ।

সাধুজী বললেন : বাস এখন গুপ্ত কাশীতে দাঁড়ায় অল্পক্ষণের জন্য। মাতাদেবী নারায়ণ কোটি ও মৈখণ্ডার মহিষ মর্দিনীকে প্রণাম করে বাসে যেতে যেতে। নামে সোনপ্রয়াগে। কেদারনাথ এক দিনের পথ।

ত্রিযুগীনারায়ণ এই পথের ধারে নয়, একটুখানি পথ ঘুরে যেতে হয়। এই জন্যেই যাত্রীরা এই তীর্থ দেখে যেতে চায়। কিন্তু পঞ্চকেদারের অন্যতম মদ্মহেশ্বর দর্শনে কেউ যায় না। তার কারণ সে তীর্থ হয়ে কেদারনাথে

যাওয়া যায় না, আবার ফিরে আসতে হয় কেদারনাথের পথে। গুপ্ত কাশী থেকে কালীমঠ মাইল তিনেক দূরে, মন্দাকিনীর সঙ্গে কালী নদীর সঙ্গম স্থল থেকে কিছু দূরে কালী নদীর বাম তীরে অবস্থিত। এই তীর্থে আছেন মহাকালী মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী, গৌরীশঙ্কর মহাদেব ও ভৈরব। বশিষ্ঠ ও ব্যাসদেব এই তীর্থের উল্লেখ করে গেছেন বলে জনশ্রুতি আছে। মদমহেশ্বর এখান থেকে চোদ্দ মাইল উত্তরে চৌখাম্বা শৃঙ্গের নিচে মদমহেশ্বর নদীর মুখে। এর উচ্চতা কেদারনাথের চেয়ে কিছু কম হলেও বদ্রীনাথের চেয়ে বেশি। প্রায় সাড়ে এগার হাজার ফুট উঁচু। গুপ্তকাশী থেকে দু-হাজার ফুটেরও বেশি উঠতে হবে শুধু একটি তীর্থ দেখবার জন্য। তারপরে কেদারনাথ আছে, তুঙ্গনাথ আছে। তুঙ্গনাথ তো কেদারনাথের চেয়েও বেশি উঁচু। মদ্‌মহেশ্বরে শিবের একটি মন্দির। দুরন্ত শীতে বন্ধ থাকে এই মন্দির। পাথরের শিবলিঙ্গ মন্দিরে ফেলে রূপার মহাদেব নিয়ে পূজারীরা নেমে আসেন উখীমঠে। তখন মদ্‌মহেশ্বর শিবের পূজা হয় উখীমঠে। কালীমঠ থেকে উখীমঠে আসবার জন্যে পায়ে চলার পথ আছে। মদ্‌মহেশ্বরের যাত্রীরা এই পথেই যাতায়াত করে।

ত্রিযুগীনারায়ণের পথ তো রাজপথ। কেদারনাথের যাত্রী পাটাগড় থেকে ত্রিযুগীনারায়ণের পথ ধরে তিন মাইল চড়াই ভেঙ্গে ত্রিযুগীনারায়ণ প্রায় ছ হাজার ফুট উঁচুতে। পথে শাকম্ভরী দেবী বা মনসা দেবীর মন্দির। ত্রিযুগীনারায়ণে পৌঁছে মনে হবে যে জীবন সার্থক হয়ে গেল। এক দিক থেকে গঙ্গোত্রীর পথ ধীরে ধীরে নেমে এসেছে, অন্যদিক থেকে উঠে এসেছে রুদ্রপ্রয়াগের পথ, আর তৃতীয় পথ সোমদ্বার বা সোমপ্রয়াগের দিকে ধীরে ধীরে নেমে গিয়ে কেদারনাথের পথের সঙ্গে মিলিত হয়। কিন্তু ত্রিযুগীনারায়ণে এসে উত্তর দিগন্তর দিকে খানিকক্ষণ নির্বাক হয়ে চেয়ে থাকতেই হবে। বরফের এমন দৃশ্য কোন যাত্রী বোধ হয় আগে কখনো দেখে নি। মন যখন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে তখন মনে পড়বে ত্রিযুগীনারায়ণের কথা। ইনি হলেন তিন যুগের সাক্ষী নারায়ণ, হরপার্বতীর বিবাহ দিয়েছিলেন এইখানে। আজও সেই অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে। যাত্রীরা এই কুণ্ডে কাঠ কিনে দিচ্ছে, কিংবা কাঠের দাম দিয়ে যাচ্ছে সেই কাঠ পোড়াবার জন্য। অগ্নিকুণ্ড কোন দিন নিভবে না, যাত্রীদের ভক্তিতেই চিরকাল জ্বলবে এমনি ভাবে।

আরও চারটি কুণ্ড আছে ত্রিযুগীনারায়ণে। সেগুলির নাম হল ব্রহ্মা কুণ্ড বিষ্ণু কুণ্ড রুদ্র কুণ্ড ও সরস্বতী কুণ্ড। এই সব কুণ্ডে যাত্রীরা স্নান তর্পণ করেন। ত্রিযুগীনারায়ণে ধর্মশালা আছে, দোকান পাটও আছে। রাত্রিবাসের কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু যাত্রীরা সারারাত এখানে রাত্রিবাস করে না।

সকালবেলায় যাত্রা করে সকালেই এখানে এসে পৌঁছয়। দেবতার দর্শনের পর দুপুরের আহার সেরে এগিয়ে যায় কেদারনাথের দিকে। সাড়ে তিন মাইল উৎরাইর পরে সোমদ্বার। সোম বা বাসুকী নদী এখানে মন্দাকিনীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে বলে সোমদ্বারকে সোমপ্রয়াগও বলে। নদীর উপরে পুল আছে। নিচে নেমে এই পুল পার হয়ে আবার উঠতে হয় গৌরীকুণ্ডের দিকে। মুণ্ডকাটা গণেশ এখান থেকে মাইল খানেক দূরে।

আমার মনে হচ্ছিল যে সাধুজী আজ চোখের সামনে এই তীর্থ পথের কথা ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করছেন। কোন দিন এই পথে আমরা যেতে পারব কিনা জানি না, তাই অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে তাঁর কথা শুনছিলাম।

সাধুজী বললেন : পথ চলতে যখন ক্লান্তি বোধ হয়, তখনই একটা চটি দেখতে পাওয়া যায় সামনে। চটি মানেই আশ্রয়। দুদণ্ড বসা যায়, চা খাবার পাওয়া যায়, প্রয়োজন হলে রাত্রিবাসও করা যায়। যারা পদব্রজে চলে, চটি দেখলেই তারা হাতের লাঠি পাশে রেখে বসে পড়ে, এক গেলাস চা খায়, পকোড়া ও জিলিপিও খায় অনেকে। তারপর নতুন উদ্যমে আবার যাত্রা শুরু করে।

সাধুজী বললেন : সোমপ্রয়াগ থেকে গৌরীকুণ্ড মাত্র মাইল তিনেক পথ। উঁচু নিচু রাস্তা প্রায় সাত হাজার ফুট উপরে পৌঁছেছে। গৌরীকুণ্ড এ পথের একটি বড় জায়গা, যাত্রীদের জন্য অনেক বাসস্থান আছে। অনেক দোকান পাট। লাল জলের একটি কুণ্ডের নামে গৌরীকুণ্ড নাম। গৌরী নাকি ঋতুস্নান করেছিলেন এই কুণ্ডের জলে। জল খুব শীতল। তাই যাত্রীরা এখানে স্নান করে না। মন্দাকিনীর নিকটে আর একটি কুণ্ডে স্নান করে। তার উষ্ণ জলে পথ চলার ক্লান্তি দূর হয়, ব্যথা বেদনার উপশম হয়। এই জলে স্নান করবার জন্য ভিড় লেগেই আছে। গৌরীকুণ্ডে একটি মন্দির আছে। সেই মন্দিরের সঙ্গে সৌভরি মুনির কাহিনী যুক্ত। বৃদ্ধ ঋষি রাজা মান্ধাতার পঞ্চাশটি কন্যাকে বিবাহ করে সংসারী হয়েছিলেন, ভুলে গিয়েছিলেন তাঁর তপস্যার কথা।

কেদারনাথ এখান থেকে সাত মাইল, কিন্তু এই পথ ফুরোতে চায় না। এগার হাজার সাত শো তিপ্পান্ন ফুট উঁচুতে কেদারনাথ। শুধু চড়াই। ডাণ্ডিবাহকেরা যাত্রীকে নামিয়ে বারে বারে বিশ্রাম নেয়। ডাণ্ডিবাহকেরা একজনকে বহন করে পিঠে। তারা যাত্রীকে নামিয়ে দিয়ে খানিকটা হাঁটতে বলে। যাদের ঘোড়া আছে, তারা ঘোড়ার পিঠে চলে ধীরে ধীরে। পায়ে হেঁটেও আনন্দ আছে। লাঠি ঠুকে তারা বীরের মতো এগোয়, পাহাড়ের গায়ে পাকদণ্ডী দেখলেই উঠে পড়ে তাই দিয়ে। তাদের উৎসাহ দেখে

ফিরতি পথের যাত্রী সহাস্যে বলে, জয় কেদার। শুকনো মুখের উত্তর পায়, জয় কেদার।

চার মাইল দূরে রামবাড়া একটি বড় চটি। খুব শীতল স্থান। কেদারনাথে রাত্রিবাস করতে যারা ভয় পায়, তারা থাকে এখানে। ভোর বেলায় বেরিয়ে কেদার দর্শন করে ফিরে আসে বিকেল বেলায়। ঝড় বৃষ্টি এখানে লেগেই আছে। পথ চলতে চলতে দেখা যায় যে পাহাড়ের গায়ে একটা ঝর্ণা বরফ হয়ে জমে আছে, আরও গরম না পড়লে সেই ঝর্ণা জল হয়ে নিচে নামবে না। এমনি বরফের ঝর্ণা পেরিয়ে এগোতে হয়। পায়ের উপর থেকে বরফ সরিয়ে দিয়েছে, কিন্তু পাহাড়ের গায়ে লেগে আছে বরফ। হাত দিয়ে মুঠো করা যায় সেই চিনির মতো বরফ, দলা করে খেলা করা যায় বলের মতো। এমন দৃশ্যের তুলনা আর কোথাও নেই।

রামবাড়া থেকে জীবন মরণ পণ করে দু মাইল পথ উঠতে হয়। সেই চড়াইএর মাথায় দেবদেখনি। সেই স্থানে দাঁড়িয়ে কেদারনাথের মন্দির দেখা যায় মাইল খানেক দূরে। পিছনের বরফের সঙ্গে মিশে আছে এই মন্দির। দিনের আলোয় রূপার মতো ঝকঝক করে। যাত্রীরা হতবুদ্ধি হয়ে এই দৃশ্য দেখে খানিকক্ষণ, তারপরে প্রাণের আবেগে চেঁচিয়ে ওঠে, জয় কেদারনাথকি জয়। জাদুর মতো দেহের সমস্ত কষ্ট এক নিমেষে অন্তর্হিত হয়ে যায়, নূতন উদ্যমে আবার অগ্রসর হয় তারা। এবারে আর চড়াই নয়। উঁচু নিচু পথে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে মন্দাকিনীর পুল। সেই পুল পেরিয়ে উপরে উঠলেই কেদারনাথ। ছোট একটি জনপদ ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। বাসগৃহ ধর্মশালা রেস্ট হাউস হোটেল দোকানপাট পাণ্ডাদের আস্তানা—এই সব পেরিয়ে গিয়ে শহরের শেষ প্রান্তে হল মন্দির। তার পরেই চির তুষার মণ্ডিত পর্বত।

সাধুজী বললেন : কেদারনাথের মন্দির পাথরের। মস্ত উঁচু ভিতের উপরে নন্দী, তারপরে দোচালা নাট মন্দির, পিছনে গর্ভগৃহ। তার চতুষ্কোণ শিখর ক্রমান্বয়ে ছোট হয়ে কোন বিন্দুতে মেলে নি। তার উপরেও একটি চালা আছে, চালের উপরে চূড়া। সমস্ত উত্তরাখণ্ডের মন্দিরই এই রকম। কারও নাট মন্দির আছে, কারও নেই। কোন নাট মন্দির পাথরের, কোনটা বা টিনের। এ অঞ্চলের একটি মন্দির দেখলে সব মন্দিরই দেখা হয়ে যায়।

তারপরে সাধুজী মন্দিরের দেবতার কথা বললেন। দেবতা তো নয়, বিরাট এক খণ্ড পাথর। শিবলিঙ্গ নয়, ত্রিকোণাকার। প্রাণের আবেগে যাত্রীরা সেই পাথরের গায়ে ঘি মাখছে, আর জড়িয়ে ধরে নতি স্তুতি করছে। যারা শিব পুজা করে, তারা বাহিরে গণেশের পূজা করে ভিতরে আসছে। কেউ গঙ্গোত্রীর জল এনেছে অভিষেকের জন্য, কেউ বেল এনেছে দেশ থেকে।

সাধারণ যাত্রীরা পূজার উপকরণ সংগ্রহ করে মন্দিরের সামনের দোকানে। শুকনো ফুল আর বেলপাতা, বাসি মিষ্টান্ন। আর পাণ্ডারা ব্রহ্ম কমলের কথা বলেন। ব্রহ্মকমলের সময় হলে সেই আশ্চর্য ফুলে কেদারনাথের পুজো হয়। অসময়ে পাণ্ডারা শুকনো ব্রহ্মকমল দেন নির্মাল্য বলে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য।

সাধুজী বললেন ঃ কেদারনাথের প্রতিষ্ঠা হয়েছে দ্বাপরের শেষে কলি যুগের প্রথমে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে স্বজন হত্যার পাপ হয়েছিল পাণ্ডবদের। সেই পাপ থেকে মুক্তি পাবার জন্য তাঁরা কাশীর বিশ্বনাথ দর্শনে গিয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্বনাথ তাঁদের দর্শন দেবেন না বলে পালিয়ে এলেন হিমালয়ে। পাণ্ডবরাও তাঁকে অনুসরণ করে এখানে এলেন। যুধিষ্ঠির ধ্যানে সব দেখতে পাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন যে বিশ্বনাথ মহিষের রূপ ধারণ করে অন্যান্য মহিষের সঙ্গে মিশে আছেন। যুধিষ্ঠির ভীমকে সেই মহিষটি দেখিয়ে দিতেই ভীম দেখলেন যে বিশ্বনাথ শিং দিয়ে মাটি খুঁড়ে ভূগর্ভে প্রবেশ করছেন। বাধা দিলেন ভীম। মহিষের পিছনের অংশটাই শুধু বাহিরে রইল। বিশ্বনাথ এই রূপেই এখানে অধিষ্ঠান করলেন।

শঙ্করাচার্যের একটি মর্মর মূর্তি সম্প্রতি স্থাপিত হয়েছে। জগৎগুরু শঙ্করাচার্য বোধহয় তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়ে এইখানে এসেছিলেন। তারপরে কোথায় হারিয়ে গেছেন তা কেউ জানে না। গঙ্গোত্রীর মতো সাধু মহাত্মা মহাপুরুষের বাস এখানে অসম্ভব। তবু এখানে ফলাহারি বাবা কি ভাবে সারা বছর থাকতেন তা সকল যাত্রীরই বিস্ময়ের বস্তু।

সাধুজী বললেন ঃ আরও কিছু এখানে দেখবার আছে। সন্ধ্যাবেলায় যখন অন্ধকার নামবে ধীরে ধীরে, মন্দিরে আরতির কাঁসর ঘণ্টা বেজে থেমে যাবে, নির্জন নিস্তব্ধ হয়ে যাবে পৃথিবী, তখন এই দৃশ্য দেখা যাবে। কখনও পেঁজা তুলোর মতো, কখনও চিনির দানার মতো বরফে বাতাস ভারি হয়ে উঠবে। দিনের বেলায় স্থানে স্থানে যে বরফের দলা দেখা গেছে তারই উপরে জমবে নতুন বরফ। কখনও চালের উপরে শব্দ হবে পাথরের নুড়ি পড়ার মতো। পাণ্ডার কাছে ভাড়া করা লেপের নিচেও বুকটা গুড়গুড় করে কেঁপে উঠবে। তবু যদি সাহস করে ঘরের দরজা খুলে বেরোনো যায়, তবে মনে হবে যেন স্বপ্নের জগতে এসেছি। বাহিরে যদি জ্যোৎস্না থাকে আর আকাশে চাঁদ তো শীতের কথা আর মনে থাকবে না। মনে হবে যে আমাদের স্বপ্নের দেশ কৈলাসে এসে পৌঁছে গেছি। স্থির হয়ে তপস্যায় বসতে পারলে শিবকে দেখতে পাব চোখের সামনে। ঐ মন্দির থেকেই তিনি বেরিয়ে আসবেন। অগণিত যাত্রীর মধ্যে শুধু কয়েকজন পাগলকে দর্শন দেন কেদারনাথ শিব।



কেদারনাথের কথা শেষ করে সাধুজী থামলেন না। বললেন ঃ উখীমঠ হল কেদারনাথের শীতাবাস, শীতের ছ মাস উখীমঠেই কেদারনাথের পুজো হয়। শিবের মন্দির আছে এখানে, কিন্তু মূর্তি সব ধাতুর। শিব পার্বতী মান্ধাতা অনিরুদ্ধ ও ঊষা। বাণাসুরের কন্যা ঊষা নাকি এইখানে তপস্যা করেছিল, ঊষার নামেই উখীমঠ। কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছিল। এখানে নবদুর্গার মূর্তিও আছে, আর আছে উত্তরাখণ্ড বিদ্যাপীঠ।

উখীমঠ থেকে চামোলি মাত্র সাতাশ মাইল পথ, আর বদ্রীনাথ চুয়াত্তর মাইল। চামোলি জেলার প্রধান শহর গোপেশ্বর হল এই পথের উপরে, গোপেশ্বরের পর চামোলি। উখীমঠ থেকে প্রায় পনর মাইল দূরে তুঙ্গনাথের পথ সোজা তিন মাইল উপরে উঠেছে। কঠিন চড়াই, কিন্তু উপরে উঠে জীবন সার্থক মনে হবে। এই পাহাড়ের নাম চন্দ্রশিলা, আর চোখের সামনে দেখা দেবে যমুনোত্রী থেকে বদ্রীনাথ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ গিরিশ্রেণী।

তুঙ্গনাথ হলেন পঞ্চকেদারের অন্যতম। কেদারনাথ প্রসঙ্গে মহিষের যে গল্প সেই নিয়েই পঞ্চকেদার। মহিষের পশ্চাদভাগের পূজা হয় কেদারনাথে, মদমহেশ্বরে নাভি, আর বাহুর পূজা তুঙ্গনাথে। মুখ আর জটা। রুদ্রনাথ আর কল্পেশ্বরে। রুদ্রনাথ এই অঞ্চলে। কিন্তু কল্পেশ্বর হল বদ্রীনাথের পথে। তুঙ্গনাথ থেকে নামবার সময় মণ্ডল চটিতে বিশ্রাম নিয়ে রুদ্রনাথ যাত্রা করতে হয়। রুদ্রনাথ কেদারনাথের মতো উঁচু। যাত্রীর যাতায়াত কম, পথও দুর্গম। কিন্তু দু মাইল দূরে সাড়ে ছ হাজার ফুট উঁচুতে দেবী অনসূয়ার মন্দিরটি ভারি সুন্দর। গভীর অরণ্যের মধ্যে এই মন্দির, খানিকটা তফাতে মন্দিরের নিচে অমৃতকুণ্ড নামে একটি জলপ্রপাত আছে। রুদ্রনাথ এখান থেকে পাঁচ মাইল। পাঁচ মাইলে পাঁচ হাজার ফুটেরও বেশি উঠতে হয়। পথ নেই বলেই পথের কষ্ট বেশি। ছ মাসের জন্য রুদ্রনাথকেও

নিচে নামতে হয়। কিন্তু তিনি উখীমঠে যান না, তিনি শীতের ছ মাস থাকেন গোপেশ্বরে।

কল্পেশ্বর দর্শনের জন্যে বেশি পরিশ্রমের দরকার নেই। যোশীমঠের উপর দিয়ে বদ্রীনাথের বাস যাচ্ছে। যোশীমঠ পৌঁছবার আগেই হেলাং-এ নেমে পড়তে হয়। তারপর নিচে নামতে হয় অলকনন্দার তীরে। সে জায়গার নাম ত্রিবেণী। একটি পাহাড়ী নদী আর ঝর্ণা আছে একটি। তারই জন্য বোধহয় ত্রিবেণী নাম হয়েছিল। ত্রিবেণীতে অলকনন্দার পুল পেরিয়ে পাঁচ মাইল দূরে কল্পেশ্বর। কল্পেশ্বরেই পঞ্চম কেদার।

গোপেশ্বরেও একটি প্রাচীন শিবের মন্দির আছে, আর মন্দিরের প্রাঙ্গণে একটি ত্রিশূল। তার গায়ে যে লিপি আছে এখন অর তা পড়া যায় না। এখান থেকে তিন মাইল দূরে চামোলি হল সদর রাজপথের উপরে। হৃষীকেশ থেকে বদ্রীনাথের সব বাস চামোলির উপর দিয়ে চলে।

সাধুজী বললেন: বদ্রীনাথ দর্শনের জন্য আজকাল কোন কষ্ট স্বীকারের দরকার নেই। ট্রেনে হৃষীকেশ এসে বদ্রীনাথের বাসে চেপে বসলেই হল। একশো পঁচাশি মাইল পথ, পথে এক রাত্রি বাস। ভোরবেলায় যাত্রা করলে পরের দিন সকাল বেলায় বদ্রীনাথ দর্শন। প্রথমে সেই কেদারনাথেরই পথ—দেবপ্রয়াগ কীর্তিনগর শ্রীনগর হয়ে রুদ্রপ্রয়াগ। তারপরে নতুন রাস্তা। চৌদ্দ মাইল দূরে গৌচার, আর ছ মাইল এগোলে কর্ণপ্রয়াগ। পিণ্ডারি নদী বেরিয়েছে পিণ্ডারি হিমবাহ থেকে, কর্ণপ্রয়াগে সেই নদীর সঙ্গম অলকনন্দার সঙ্গে। কিন্তু কর্ণপ্রয়াগ নাম হয়েছে মহাভারতের কর্ণের জন্য, তিনি নাকি এইখানে সূর্যের তপস্যা করেছেন। কিন্তু সূর্য বা কর্ণের মন্দির এখানে নেই, সঙ্গমের কাছে আছে উমাদেবীর মন্দির।

কোটদ্বার থেকে একটা পথ শ্রীনগরের উপর দিয়ে এদিকে এসেছে, আর একটা পথ রাণীক্ষেত থেকে এসেছে কর্ণপ্রয়াগে। অনেক যাত্রী ট্রেনে হরিদ্বারে না এসে হলদোয়ানি বা কাটগোদামে এসে নামছে। সেখান থেকে রাণীক্ষেতে রাত কাটিয়ে দুপুর বেলায় কর্ণপ্রয়াগে। শীঘ্রই নাকি রাণীক্ষেত থেকেই বদ্রীনাথের বাস পাওয়া যাবে। এক দিনের যাত্রা।

কর্ণপ্রয়াগ থেকে রাণীক্ষেতের পথে আদি বদরী নামে একটি জায়গা আছে। পথের ধারেই আদি বদরীর ছোট মন্দির। মন্দিরটির নির্মাণ সম্পূর্ণ হয় নি। যেমন পঞ্চকেদার, তেমনি পঞ্চ বদরীও আছে। এটি আদি বদরী। বদ্রীনাথের প্রতিষ্ঠা এইখানেই হচ্ছিল, শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বদ্রীনাথে। বদ্রীনাথের নাম বিশাল বদ্রী। পুরাকালে যাত্রীরা যখন হেঁটে যেত, তখন তারা ধ্বনি দিত বদরী বিশাল কি জয়! এখন এই ধ্বনি শোনা যায় শুধু বদ্রীনাথেই। বিশাল বদ্রীর পথেই বৃদ্ধ বদরী

ভবিষ্য বদরী ও যোগ বদরী। পিপলকোটি যোশীমঠের পথে অনিমঠে বৃদ্ধ বদরী, যোশীমঠ থেকে আট মাইল দূরে ধৌলি নদীর উপত্যকায় ভবিষ্য বদরী, এবং বদ্রীনাথের পথে পাণ্ডুকেশ্বরে যোগ বদরী। কুল গাছকে বলে বদরী বৃক্ষ।

বারশো বছর আগে শঙ্করাচার্য এসেছিলেন বদ্রীনাথে। তিনি দেখলেন যে অধার্মিকেরা মন্দির ভেঙ্গে ফেলে বিগ্রহ মূর্তি অলকনন্দার জলে ফেলে দিয়েছে। তপ্ত কুণ্ডের ধারে যে গরুড় গুহা, সেই গুহায় বসে শঙ্করাচার্য তপস্যা করেছিলেন। স্বপ্নে তিনি জানতে পারলেন যে দেবতার বিগ্রহ পড়ে আছে নারদ কুণ্ডে। তিনি সেই বিগ্রহ উদ্ধার করে একটি বদরী বৃক্ষের নীচে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই বদরী বৃক্ষের জন্যই নারায়ণের নাম হল বদ্রী নারায়ণ বা বদ্রীনাথ।

কর্ণপ্রয়াগের পর নন্দপ্রয়াগ তের মাইল দূরে। উত্তর খণ্ডে প্রয়াগও পাঁচটি। দেবপ্রয়াগ রুদ্রপ্রয়াগ কর্ণপ্রয়াগের কথা বলেছি। এবারে নন্দপ্রয়াগ। আর এই পথেই আরও এগিয়ে বিষ্ণুপ্রয়াগ।

সাধুজী বললেন ঃ নন্দপ্রয়াগে মন্দাকিনীর সঙ্গে নন্দাকিনী নদীর সঙ্গম। এই ছোট নদীটি ত্রিশূল পাহাড় থেকে বেরিয়েছে। পুরাকালে নাকি কণ্ব মুনির আশ্রম ছিল এইখানে,, আর এখানেই দুষ্মন্ত শকুন্তলার মিলন হয়েছিল। নন্দপ্রয়াগেও কয়েকটি মন্দির আছে—চণ্ডিকা দেবী লক্ষ্মীনারায়ণ মহাদেব ও গোপালজীর মন্দির।

বদ্রীনাথের বাসে চেপে এলে কর্ণপ্রয়াগে নামতে হয় না, সাত মাইল এগিয়ে চামোলিতেও না। পিপুল কোটি দশ মাইল দূরে, আরও উনিশ মাইল এগোলে যোশীমঠ। এই যোশীমঠ একটি ছোট পাহাড়ী শহর, ছ হাজার ফুট উঁচু। এখানে নরসিংহ বাসুদেব ও নবদুর্গার মন্দির আছে। সাত ফুট লম্বা বিষ্ণুর কষ্টিপাথরের মূর্তি। পাহাড়ের উপরে আধ মাইল উঠে শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত জ্যোতির্মঠ।

হেমকুণ্ড লোকপাল আর ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার্স দেখতে হলে বদ্রীনাথের পথে গোবিন্দ ঘাট থেকে হেঁটে যেতে হবে। মানসসরোবর ও কৈলাসের পথ দেখতে হলে ধৌলি নদীর উপত্যকা দিয়ে নিতিপাসের দিকে যেতে হবে। যাদের হাঁটতে ভাল লাগে, তারা তপোবন হয়ে কুয়ারি গিরিপথের ভিতর দিয়ে গোহনা লেক দেখে বিরেহী নদীর ব্রিজে চামোলি বা পিপলকোটির বাস ধরতে পারে। এই অঞ্চলেই রূপকুণ্ড পিণ্ডারি হিমবাহ ত্রিশূল নন্দাদেবী দ্রোণগিরি পর্বত। টুরিস্টের স্বর্গ।

বিষ্ণু প্রয়াগে ধৌলি নদী অলকনন্দার সঙ্গে মিলেছে। একটা চড়াই-এর মাথায় দেবদেখনি। বদ্রীনাথ পুরী দেখা যায় এইখান থেকে। এখন বাস এসে দাঁড়ায় শহরের জনহীন উপকণ্ঠে। একটা প্রান্তর পেরিয়ে

অলকনন্দার তীরে বদ্রীনাথ পুরী। নদীর এপারেও ঘর বাড়ি আছে—রেস্ট হাউস পোস্ট অফিস ডাকবাংলা। সরকারী বাস ট্যাক্সি এসে দাঁড়ায় এই জায়গায়। মন্দির নদীর পরপারে। পুল পেরিয়ে ওপারের পাহাড়ে উঠলেই আসল বদ্রীনাথ দেখা যাবে নীলকণ্ঠ পর্বতের কোলে। বরফে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে এই পাহাড়। নিচে অনেক দূর পর্যন্ত এই বরফ নেমে এসেছে। শীতের সময় শহর ও মন্দিরও বরফে ঢেকে যায়। দেবতার পুজা হয় যোশীমঠে।

সাধুজী একটু ভেবে বললেন: বদ্রীনাথের উচ্চতা কেদারনাথের চেয়ে প্রায় দেড় হাজার ফুট কম। যত দূর মনে পড়ে, এর উচ্চতা দশ হাজার দুশো চুয়াল্লিশ ফুট। উত্তরাখণ্ডে কেদারনাথ যেমন শৈবদের, বদ্রীনাথ তেমনি বৈষ্ণবদের শ্রেষ্ঠ তীর্থ। অতি প্রাচীন তীর্থও বটে। বেদে এই তীর্থের নাম আছে কিনা জানি না। পুরাণে এর অজস্র উল্লেখ। সত্য পথ বা শতপন্থ বদ্রীনাথ থেকে পনর মাইল দূরে। নন্দ প্রয়াগ থেকে শতপন্থ পর্যন্ত বদরী বিশাল ক্ষেত্র নামে পরিচিত। পুরাকালে বলত বদরিকাশ্রম। লোকে বলে যে বেদের কিছু শ্লোক ও উপনিষদের অনেকাংশ এইখানেই প্রথম গীত হয়েছিল! অসম্ভব নয়। সত্য যুগের অনেক মুনি ঋষির বাস ছিল এখানে। বদ্রীনাথের নিকট মানা গ্রামে আছে ব্যাস গুহা। ব্যাসদেব নাকি সেখানে বসেই বেদ বিভাগ করেছেন, আর পুরাণও রচনা করেছেন। এতো দ্বাপরের কথা। তখন কৃষ্ণার্জুনের সময়। এই কৃষ্ণ ও অর্জুন তাঁদের পূর্ব জন্মে ছিলেন নারায়ণ ও নর ঋষি। এখানকার গন্ধমাদন পর্বতে তাঁরা তপস্যা করেছিলেন। দুটি পাহাড়ের নাম এখনও নরপর্বত ও নারায়ণ পর্বত। এই স্থান যে তপস্যার অত্যন্ত অনুকূল ছিল নরনারায়ণ ঋষিদ্বয় তা প্রমাণ করে গেছেন।

তাউজী আর নীরব থাকতে না পেরে বললেন: কী রকম?

সাধুজী বললেন: নর নারায়ণ ঋষির জন্ম বিষ্ণুর অংশে। ধর্ম তাঁদের পিতা ও মাতা হলেন দক্ষ কন্যা মূর্তি। এঁরা যখন এইখানে কঠোর তপস্যায় নিরত, দেবতারা তখন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁদের তপোভঙ্গের নানা চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে অপ্সরাদের পাঠালেন। ঋষিরা তাদের দেখে বিচলিত হলেন না, তপোবলে দেবতাদের সঙ্গে কৌতুক করবেন বলে স্থির করলেন। নারায়ণ ঋষি একটি ফুল নিয়ে নিজের উরুর উপরে রাখলেন, আর সেই উরু থেকে যে অপ্সরার জন্ম হল, তারই নাম উর্বশী। উর্বশীর রূপ দেখে স্বর্গের অপ্সরাদের মাথা হেঁট হয়ে গেল। নারায়ণ ঋষি আরও অনেক সুন্দরী নারী সৃষ্টি করে অপ্সরাদের বললেন, এদের সবাইকে নিয়ে ইন্দ্রের কাছে ফিরে যাও। ইন্দ্র পরাস্ত হলেন।

পুরাণের কথা থেকে পুরনো প্রসঙ্গে পুনরায় ফিরে আসতে সাধুজী কিছু সময় নিলেন। তার পরে বললেন ঃ বদরীনাথে বাসস্থানের অভাব নেই। অনেক ভাল ধর্মশালা আছে, টেম্পল কমিটির গেস্ট হাউস, পাণ্ডার বাড়ি—পছন্দ মতো জায়গা খুঁজে নেওয়া যায়। চিঠি লিখে রিজার্ভ করাও যায়। টেম্পল কমিটির গেস্ট হাউস আছে একাধিক। আরও অনেক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। অলকনন্দার পুলটি বেশি প্রশস্ত নয়, যানবাহন চলাচল করে না। হেঁটে ওপারে যেতে হয়। তারপরে ধাপে ধাপে খানিকটা উপরে উঠলেই মন্দিরের পথ। ডান দিকে ফিরলেই মন্দিরের বিপুলায়তন গেট চোখে পড়বে। পথের ধারে দোকানপাট আর ঘন বসতি। ছোটখাট শহর বলে মনে হবে।

যাত্রীরা এখানে নেমেই স্নান করতে ছোটেন। মন্দিরে ঢোকবার আগে স্নান করে নেন সবাই।

বদরীনাথের মন্দিরটি একেবারে ভিন্ন ধরনের। মন্দিরের চূড়া ব নাটমন্দির দেখা যাবে না। মন্দিরের সিংহদ্বারের দিকেই তাকিয়ে থাকতে হবে খানিকক্ষণ। দোতলার সমান উঁচু বিশাল এই সিংহদ্বার। পথ থেকে অনেকগুলো সিঁড়ি ভেঙ্গে দরজায় পেঁছিতে হয়। তারপর মন্দিরের প্রাঙ্গ চারিধারে আরও কয়েকটি মন্দির ও মন্দির কমিটির অফিস আছে। মন্দিরের গর্ভগৃহে বদরীনারায়ণ, সেখানে কোন যাত্রীর প্রবেশের অধিকার নেই দক্ষিণ ভারতের মতো দূর থেকে দেবতাকে দর্শন করতে হয়। শঙ্করাচার্যে দেশের নাম্বুদি ব্রাহ্মণেরা এখানে পূজারীর কাজ করেন। প্রধা পুরোহিত হলেন রাওল সাহেব। পূর্বে আজন্ম ব্রহ্মচারী দণ্ডি সন্ন্যাসী পূজা করতেন বলে শুনেছি।

সাধুজী বললেন ঃ দূর থেকে দেবতাকে ভাল দেখতে পাই নি শুনেছিলাম যে বিষ্ণুর এখানে পদ্মাসন মূর্তি, যেন যোগে বসেছেন। দেবত মূর্তি দেখে তো আমাদের মন ভরে না, দেবতাকে আমরা বুকে জড়িয়ে ধর চাই, চোখের জলে তাঁর অভিষেক করতে চাই। তাঁর পায়ে মাথা ঠু মনে হয় যে দেবতার স্পর্শ পেলাম। কেদারনাথে আমরা এই সুযোগ প শিবের দেহ অপবিত্র হয় না যাত্রীর স্পর্শে। শিব বোধহয় তাই আমা মনের ঠাকুর। বিষ্ণুর অধিষ্ঠান ঠাকুর ঘরের সিংহাসনে।

সাধুজী তারপরেই সামলে নিয়ে বললেন ঃ মন্দিরের প্রাঙ্গণে লক্ষ মন্দির ও ভোগমণ্ড। পঞ্চবদরীর কথা বলেছি এখানে আছে পঞ্চশিল পঞ্চতীর্থ। তপ্তকুণ্ড ও নারদকুণ্ডের মধ্যে নারদ শিলা। শীতে যখন পুরী জনশূন্য হয়ে যায়, তখন দেবর্ষি নারদ পূজা করেন বদ্রীনাথে নারদশিলার কাছে অলকনন্দা নদীতে আছে বরাহশিলা। হিরণ্যাক্ষকে

করার পরে বরাহ এসে এইখানে বদ্রীনাথের পূজা করেছিলেন। আদি কেদারেশ্বরে মহাদেবের মন্দিরের নিকটে আছে গরুড় শিলা। মা বিনতাকে দাসীত্ব থেকে মুক্ত করে গরুড় এইখানে এসে বিষ্ণুর বাহন হয়েছিলেন। মার্কণ্ডেয় শিলা তপ্তকুণ্ডের নিচে। মার্কণ্ডেয় ঋষি এখানে বসে তপস্যা করেছিলেন। নরসিংহ শিলাও দূরে নয়। হিরণ্যকশিপুকে বধ করে নৃসিংহ এখানে ঋষিদের অনুরোধে বিপুলকায়া ধারণ করেন।

সাধুজীর স্মৃতিশক্তি দেখে আমি আশ্চর্য হচ্ছিলাম, আরও আশ্চর্য হলাম পঞ্চতীর্থের কথা শুনে। বললেন: তপ্ত কুণ্ডের নাম বহ্নিতীর্থ। অগ্নির অধিষ্ঠান এইখানে। আর এরই নিকটে প্রহ্লাদ কুণ্ড। এটি একটি ঈষদুষ্ণ জলের ধারা। নারদ কুণ্ড ও তপ্তকুণ্ডের কাছে অলকনন্দার গর্ভে একটি পাথরের আড়ালে এই জলের কুণ্ডে যাত্রীরা নিরাপদে স্নান করতে পারে। একটি শীতল জলের ধারার নাম কূর্মধারা। এই ধারায় স্নান করে কূর্মাবতার বিষ্ণুর পূজা করেছিলেন। পঞ্চতীর্থের শেষ তীর্থ হল ঋষিগঙ্গা, নীলকণ্ঠ উপত্যকা থেকে এই নদী এসে অলকনন্দায় ঝরে পড়েছে।

বদ্রীনাথের দ্রষ্টব্য স্থান আরও আছে। সূর্য কুণ্ড আর একটি উষ্ণ জলের পুষ্করিণী। ব্রহ্ম কপালে ব্রহ্মার অধিষ্ঠান। পিতৃপুরুষের তর্পণ করে যাত্রীরা। চতুর্ভুজ বিষ্ণু এখানে ভক্তদের দেখা দিয়েছিলেন, আর বিশ্বাসীরা নাকি কুম্ভযোগে এখনও তাঁকে দেখতে পায় নীলকণ্ঠ পর্বত-শৃঙ্গে। বদরীনাথেও গান্ধী ঘাট আছে। কেদারনাথের নিকট চোরাবালি তালে যেমন মহাত্মার অস্থি বিসর্জন করা হয়েছিল, তেমনি বদ্রীনাথেও অলকনন্দার জলে অস্থি বিসর্জন করা হয়েছিল তপ্তকুণ্ড ও ব্রহ্মকপালের মাঝে। চোরাবালি তালের নাম হয়েছে গান্ধী সরোবর, আর এখানে গান্ধীঘাট। শুনেছি যে মানস সরোবরেও গান্ধীজীর অস্থি বিসর্জন করা হয়েছে, কিন্তু তার কিছু নাম হয়েছে কিনা তা জানি না। আরও অনেক তীর্থ আছে এখানে। সে সব দেখতে হলে দু এক দিন থাকতে হয়। বদ্রীনাথ শহর থেকে মাইল খানেক দূরে অলকনন্দার পরপারে আছে শেষ-নেত্র। একটি পাথরের উপরে শেষনাগের নেত্র। চরণ পাদুকা অন্য ধারে। দু মাইল পশ্চিমে নীলকণ্ঠ পাহাড়ের পাদদেশে ভগবানের পায়ের চিহ্ন আছে একটি পাথরের উপরে। উত্তরে দু মাইল গেলে মাতামূর্তি, বদ্রীনাথের মায়ের মন্দির মালা গ্রামের উলটো দিকে।

সাধুজী একটু থেমে বললেন: কিন্তু নীলকণ্ঠকেই আমার সব চেয়ে বড় তীর্থ বলে মনে হয়েছে। প্রভাতে এই পাহাড় দেখে বিস্ময়ে আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। সাড়ে একুশ হাজার ফুটেরও বেশি উঁচু এই গিরিশৃঙ্গ, বদ্রীনাথ থেকে উড়ে গেলে মাইল পাঁচেক দূরে হবে। তুষার মণ্ডিত শৃঙ্গটি

শুধু দেখা যায়, সামনের পাহাড়ে ঢাকা আছে আর সবটুকু। কিন্তু আমার মনে হল যেন সোনার মুকুট পরেছে হিমালয়। শুনলাম যে বিদেশীরা সাতবার এসে এই নীলকণ্ঠ পর্বতকে জয় করতে পারে নি। ১৯৬১ সালে এই পর্বত প্রথম জয় করেছেন রাজস্থানের এক স্কুল মাস্টার। ও. পি. শর্মা তাঁর নাম। তিনিই বদরীনাথের দর্শন পেয়েছেন। আমরা দেখেছি তাঁর পাথরের রূপ।



চারিদিকের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে সময়ের অনুমান করা সম্ভব ছিল না। উপাসনার গৃহে প্রদীপের আলো জ্বলছিল একই ভাবে। তীর্থের কথা শেষ হয়ে গেল কিনা আমি যখন ভাবছিলাম, ঠিক তখনই সাধুজী বললেন ঃ পুরাকালে হিন্দুরাজ্য কত দূর বিস্তৃত ছিল, পীঠস্থানের তালিকা দেখলে তা বোঝা কঠিন হবে না। পূর্বে চন্দ্রনাথের কথা আগেই বলেছি। এই তীর্থ এখন পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত হয়েছে। পশ্চিমের হিংলাজের কথাও বোধ হয় বলেছি। এখন এই অঞ্চল পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকারে। নেপালও পীঠস্থান, সতীর জানু পড়েছিল নেপালে। দেবী মহামায়া, তাঁর ভৈরব কপালী। শুনে আশ্চর্য হতে হয় যে মানস সরোবরও একটি পীঠস্থান। সতীর দক্ষিণ হাত পড়েছিল সেখানে। দেবী দাক্ষায়ণী, তাঁর ভৈরব অমর। আরও আশ্চর্যের কথা যে লঙ্কাও একটি পীঠস্থান। সতীর নূপুর পড়েছিল সেখানে। তাই দেবী ইন্দ্রাক্ষী নামে অধিষ্ঠিতা, আর তাঁর ভৈরব রাক্ষসেশ্বর।

নেপাল একটি স্বাধীন দেশ, কোন শহর বা গ্রাম নয়। এই দেশের কোন্‌খানে দেবীর জানু পীঠ তা নেপালের লোকেও জানে না। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আমি তো পীঠস্থান আবিষ্কার করতে যাই নি, আমি গিয়েছিলাম পশুপতিনাথ দর্শনে। নেপালের রাজধানী কাঠমণ্ডুতে যে এই তীর্থ, এ কথা আমার জানা ছিল। প্রতি বছর শিবরাত্রির সময় ভারত থেকে অগণিত যাত্রী যায় সেখানে, ভীড় হয় যানবাহনে, বাসস্থানেরও অভাব হয়। বৈদ্যনাথের মতো পশুপতিনাথকেও আমি পীঠস্থানের ভৈরব বলে জানতাম। কিন্তু সেখানে গিয়ে কারও মুখে এ কথার সমর্থন পেলাম না। তার বদলে

অন্য একটি পীঠস্থানের নাম শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। এই পীঠের ভৈরবের নাম কেউ বলল না, বলল দেবীর নাম। সতীর গুহ্যমণ্ডল পড়েছিল বলে দেবীর নাম গুহ্যেশ্বরী। পশুপতিনাথের মন্দিরের সন্নিকটেই গুহ্যেশ্বরী দেবীর মন্দির।

নেপাল যাত্রা আজকাল খুব সহজ হয়ে গেছে। কাঠমণ্ডুতে এয়ারোড্রোম হয়েছে। এয়ারোড্রোম হয়েছে বীরগঞ্জের কাছেও। ঢাকা থেকে, কলকাতা থেকে ও পাটনা থেকে সোজা কাঠমণ্ডুতে আসছে এরোপ্লেন। বীরগঞ্জ থেকেও প্লেনে চেপে আসা যায়। বিহারের রাজধানী পাটনা শহর থেকে মহেন্দ্র ঘাটে গঙ্গা পেরিয়ে পরপারে পালেজা ঘাট থেকে ট্রেন পাওয়া যায়। রাতে সেই ট্রেনে উঠে ভোর বেলায় সগৌলি জংসন। সেখান থেকে রক্সৌল এক ঘণ্টারও কম পথ। কলকাতা থেকে এলে সমস্তিপুরে গাড়ি বদল করে রক্সৌলের ট্রেনে উঠতে হয়। সকাল বেলায় রক্সৌলে পৌঁছলে সন্ধ্যা বেলায় কাঠমণ্ডু। রক্সৌল স্টেশনেই নেপালগামী বাসের টিকিট পাওয়া যায়। যাত্রীরা কেউ হেঁটে, কেউ রিকসা বা টাঙ্গায় চেপে নেপাল বর্ডারে এসে বাসে চাপে।

শিবরাত্রির সময় ছাড়া অন্য সময় দরকার হয় বলে শুনেছি। এরোপ্লেনের যাত্রীদের নাকি এটাই ছাড়পত্র, কিন্তু ট্রেনের যাত্রীদের এই অনুমতি পত্রের দরকার হতে দেখি নি। বাসে দেখতে চায় না, নেপালেও না। এ শুধু একটা নিয়মের কথা। জেলা শাসকের অফিস থেকে এই পত্র পাওয়া যায়। টাকা পয়সা বদলাবারও কোন অসুবিধা নেই। ভারতীয় টাকা আর নেপালের টাকার তফাৎ কম। নেপাল বর্ডারে টাকা বদল করবার অফিস আছে, নেপালেও ব্যবস্থা আছে। দোকান ও হোটেলওয়ালারাও ভারতীয় টাকা নিতে আপত্তি করে না। যা বিরক্তিকর তা হল খানাতল্লাসী। ভারতীয় সীমান্তে বলতে হবে সঙ্গে ক্যামেরা বা ট্রানজিস্টার চালিত কোন যন্ত্র আছে কিনা, নেপাল সীমান্তে বাক্স বিছানা খুলে দেখাতে হবে। ফেরার পথে আবার এই ঝামেলা। সঙ্গে বিদেশী জিনিষ থাকলে এই ঝামেলার আর অন্ত থাকে না। কিন্তু তীর্থযাত্রীদের কোন দুশ্চিন্তা নেই। ভারত সরকার রক্সৌল থেকে কাঠমণ্ডু পর্যন্ত একশো কুড়ি মাইল রাজপথ নির্মাণ করে দিয়েছেন। অসংখ্য বাস ট্রাক চলছে। সকাল আটটায় বাসে উঠলে সন্ধ্যের আগেই পৌঁছনো সম্ভব।

পশুপতিনাথের মন্দির ঠিক কাঠমণ্ডু শহরে নয়, শহর থেকে মাইল তিনেক দূরে বাগমতী নদীর তীরে। বাসে গেলে হেঁটে যেতে হয় খানিকটা পথ, ট্যাক্সি একেবারে মন্দিরের দরজার সামনে পৌঁছে দেয়। হাঁটার অভ্যাস থাকলে হেঁটেই যাওয়া যায়। সমতল ভূমির উপরে মন্দির, পাহাড়ের মতো

উঁচু জমি আছে পাশে, তার উপরে উঠলে মন্দিরের চূড়া দেখা যায়, আর বাগমতী নদীর ওপার থেকে মন্দিরের দৃশ্য দেখা যায় সুন্দর ভাবে। ওপারে যাবার জন্যে পুল আছে, একটু ঘুরে যেতে হয়। বাগমতী নদী মন্দিরের পিছনে, নদীর জল পর্যন্ত ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে। যাত্রীরা স্নান করে উপরে মন্দিরে আসে।

পশুপতিনাথের মন্দির ভারতের কোন মন্দিরের মত নয়। প্যাগোডার মতো আকার এই মন্দিরের, কিছু বৌদ্ধ প্রভাব আছে। নেপালের সর্বত্র এই রকম। প্রভেদ আছে মন্দিরে মন্দিরে, কিন্তু ভারতের কোন মন্দিরের মতো একটিও মন্দির নেই। মন্দিরে গম্বুজ নেই, শিখর নেই কোন, তার বদলে চতুষ্কোণ ছাদ আছে তিনতলা। সূর্য কিরণে সোনার পাত ঝকঝক করে। নিচে চারটি দ্বার উন্মুক্ত, কিন্তু ভিতরে প্রবেশের নিয়ম নেই। সকল যাত্রীকে দরজার বাহিরে দাঁড়িয়ে দেবতাকে দর্শন করতে হয়, প্রণাম করতে হয় বাহির থেকেই। পূজারী ভিতরে দাঁড়িয়ে ভোগ নিবেদন করে প্রসাদ ফিরিয়ে দেয়।

পশুপতিনাথের লিঙ্গমূর্তি। . কিন্তু বিশ্বনাথ বৈদ্যনাথ কেদারনাথের মতো নয়। ভারতের কোন শিবলিঙ্গই এই রকম নয়। চারি ধারে চারিটি মুখ আছে শিবলিঙ্গের। পঞ্চম মুখটি বোধহয় উপরে। শিবতো পঞ্চবক্ত্র, চার দরজা দিয়ে তাঁর চার মুখ দেখা যায়, মাঝের মুখটি বাইরে থেকে দেখতে পাওয়া যায় না। যাত্রীরা কেউ বলেন চারমুখ, আবার কেউ বলেন পাঁচ। আরতির সময় নাকি পাঁচ মুখে পাঁচটি মুকুট পরানো হয়।

দেবতার বাহন নন্দীর স্থান বাহিরে। বিরাট নন্দী। অন্য মন্দিরে বীরভদ্র আছেন, আরও দেবদেবী। নেপালের রাজাদের মূর্তিও আছে।

এই মন্দির থেকে বেরিয়ে একটি পাহাড়ী নদীর ধারে ধারে খানিকটা পথ উপরে উঠে গেলে গুহ্যেশ্বরী মন্দির। নিচের রাস্তা থেকে সিঁড়ি উঠেছে উপরে, তারপরে দরজা। দরজা মন্দিরের নয়, মন্দির প্রাঙ্গণে ঢোকবার দরজা। এই দরজা পেরিয়ে ভিতরে গেলে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। তার মধ্যেই গুহ্যেশ্বরী দেবীর অধিষ্ঠান। কোন মূর্তি নয়, চিত্র নয়, একটি কুণ্ডের মধ্যে আছে জল। সেই জলের উপরেই দেবীর পূজা হচ্ছে। হাতে দেবীর ভোগ বা প্রসাদ থাকলে যাত্রীদের সতর্ক থাকতে হয়। বড় বড় বাঁদর আছে মন্দিরের এলাকায়। যাত্রীদের উপরে তারা লাফিয়ে পড়ে।

সাধুজী বললেন : কাঠমণ্ডু থেকে কয়েক মাইল দূরে দক্ষিণকালীর মন্দিরও আছে। এই সব মন্দিরে বলিদানের প্রথা প্রচলিত আছে। শুধু ছাগ বলি নয়, মুরগি ও ডিম বলিও আছে। দেবতার সামনে ডিম ভাঙলেই তা বলি দেওয়া হল। নিজের চোখে দেখি নি, কিন্তু শুনেছি যে

পশুপতিনাথের সামনেও বলি হয়। শিবের মন্দিরে বলি আমি কোথাও দেখি নি। এ বোধহয় তান্ত্রিক প্রভাবের জন্য। যূপকাঠে ফেলে পশু বলি দেওয়া হয় না বলে নিজের চোখে না দেখলে বোঝবার উপায় নেই। দক্ষিণ কালীর সামনে দেখেছি যে ছাগ বলি হচ্ছে জবাই করার মতো। যূপকাঠে ফেলে খড়্গ দিয়ে নয়, ধারালো ছুরি দিয়ে মুণ্ডচ্ছেদ হয় দণ্ডায়মান ছাগের। অদ্ভুত প্রথা, ভারি নৃশংস মনে হয়। কিন্তু এই প্রথাই বোধহয় সমস্ত নেপালে সমাদৃত।

সাধুজী একটু ঝিমিয়ে পড়েছিলেন, বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল তাঁকে। ধীরে ধীরে বললেন: কেদারনাথে যে আনন্দ পেয়েছি, সে আনন্দ এখানে পাই নি। পশুপতিনাথও শিব। মহাভারতে পড়েছি যে অর্জুন এসেছিলেন পশুপতিনাথ দর্শনে। মহাভারতে কাঠমণ্ডুর নাম নেই, নাম নেই নেপালের। মহাভারতের মতে অর্জুন গোকর্ণ তীর্থে পশুপতিনাথ দর্শন করেছিলেন। সেই গোকর্ণ তীর্থই কাঠমণ্ডু কিনা তাও আমার জানা নেই। তবু আমি এই তীর্থটি অতি প্রাচীন বলেই মেনে নিয়েছি। অনেক ভক্তি নিয়ে গিয়েছি দেবতার দর্শনের জন্য। কিন্তু মন আমার ভরে নি। বোধহয় একই কারণে মন ভরে নি। দেবতার কাছে যেতে পারি নি, ছুঁতে পারি নি দেবতাকে। তাঁকে দু হাতে জড়িয়ে মনের আনন্দ বেদনা জানাবার সুযোগ পাই নি। অতৃপ্ত মন নিয়ে তাই আমি সেখান থেকে ফিরে এসেছিলাম।



জানি না আমাদের মনে কী অতৃপ্তি সঞ্চারিত হল, আমরা আরও কিছু শোনবার জন্যে বসে রইলাম। রাতের কথা আমাদের মনে ছিল না। সাধুজীর কষ্টের কথাও মনে পড়ল না। অন্য দিন গুরুজী সাধুজীকে তুলে নিয়ে যান, আজ তিনিও নির্বিকার ভাবে বসে রইলেন। আর তাউজী এক সময় নীরবতা ভেঙে বললেন: মানস সরোবর ও কৈলাসের কথা হলেই আমাদের তীর্থের কথা শেষ হবে।

বিষণ্ণভাবে সাধুজী বললেন: ভারতবাসী আর কোন দিন সেই তীর্থে

যেতে পারবে কিনা জানি নে। চীনের সঙ্গে আমাদের আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত সে আশা এখন দুরাশা বলেই মনে হয়। অথচ একদা ঐ অঞ্চল বিশাল ভারতের অন্তর্গত ছিল। রামায়ণ বা মহাভারত ইতিহাস নয়, আমরা ভারতবাসীরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে এই দুটি মহাকাব্য আমাদের ঐতিহাসিক দলিল। অযোধ্যার রাম মহাকাব্যের নায়ক নন, তিনি প্রাচীন ভারতের এক আদর্শ রাজা ছিলেন। তাঁকে আমরা বিষ্ণুর অবতার মনে করে অন্যায় করি। রাম মানুষ ছিলেন, কর্মের দ্বারা মহাপুরুষে পরিণত হয়েছেন। আমরা তাঁর উপরে দেবত্ব আরোপ করেছি, আর সেই আবেগে কিছু অলৌকিক ঘটনার সৃষ্টি করে ইতিহাসকে বিকৃত করেছি। মহাভারতের কথাও এই রকম। কিন্তু মানস সরোবর ও কৈলাসের কথায় রামায়ণের কথাই আগে মনে আসে। রামায়ণের অন্যতম নায়ক রাবণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুবেরের পুরী ছিল এই কৈলাসে। আর আমাদের প্রিয় দেবতা শিবের আবাসভূমিও কৈলাস।

সাধুজী একবার বাহিরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বললেন: বিশ্রবা মুনির জ্যেষ্ঠপুত্র কুবের হলেন ভরদ্বাজ ঋষির কন্যা দেববর্ণিনীর পুত্র। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র রাবণের জন্ম রাক্ষসকন্যা কৈকসীর গর্ভে। রাক্ষসদের শূন্যপুরী লঙ্কার অধিপতি হয়ে বাস করছিলেন কুবের। রাক্ষসদের প্ররোচনায় রাবণ যখন সেই পুরীর অধিকার দাবী করেন, তখন পিতার আদেশে কুবের কৈলাসে গিয়ে নূতন পুরী স্থাপন করেন। কঠোর তপস্যা করে সখ্য লাভ করেন মহাদেবের, লোকপাল হন, যক্ষ কিন্নর গন্ধর্বদের রাজা হয়ে কৈলাসেই বসবাস করতে থাকেন। তাঁর ঐশ্বর্যময় সভার বর্ণনা আছে মহাভারতে। সেই সভা ধনেশ্বরের উপযুক্ত ছিল।

হিন্দুরাজ্য তখন আরও বিস্তৃত ছিল। ইন্দ্রলোক আরও উত্তরে এবং সুমেরু পর্বতে ছিল ব্রহ্মলোক। ইন্দ্রের সভা ও ব্রহ্মার সভার বর্ণনাও আছে মহাভারতে। অর্জুনের ইন্দ্রলোক যাত্রার কথাও আমরা মহাভারতে পড়েছি, ইন্দ্রের সারথি মাতলি এনেছিল রথ। অশ্ব চালিত রথ নিশ্চয়ই নয়, অশ্বশক্তিবিশিষ্ট বিমান। নক্ষত্রলোকের ভিতর দিয়ে এই যাত্রার কথা সবিস্তারে লেখা আছে। এই রকমের বিমান কুবেরের কাছেও ছিল। রাবণ সেই পুষ্পক রথ কুবেরের কাছ থেকে বাহুবলে হরণ করেন। লঙ্কা বিজয়ের পর রাম সানুচর সেই পুষ্পক রথে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেন। কালিদাসের রঘুবংশে আমরা এই বিমান যাত্রার অপরূপ বর্ণনা পড়েছি। সে যুগের দেবতা ও উপদেবতারা অন্তরীক্ষে বিচরণ করতে পারতেন। অপ্সরা ও গন্ধর্বরা ইন্দ্রসভা থেকে কৈলাসে কুবেরের সভায় উড়ে আসত। দেবর্ষি নারদও শূন্যে ভ্রমণ করতেন। প্রয়োজন হলেই আমরা তাঁকে স্বর্গ মর্ত্য ও

পাতাল ও ত্রিলোক ভ্রমণ করতে দেখি। তার বাহন ঢেঁকি বিমান ছিল না রকেট, তার পরিচয় কোথাও লেখা নেই। কিন্তু তা যে কোন শক্তিশালী যান ছিল তাতে আমার সন্দেহ নেই।

সাধুজী হঠাৎ সজাগ হয়ে বললেন: আমরা মানস সরোবর ও কৈলাসের কথা বলছি। পঞ্চপাণ্ডব তাঁদের বনবাসকালে এই অঞ্চলে এসেছিলেন। দ্রৌপদীর জন্য পদ্ম সংগ্রহে এসেছিলেন ভীম, আর কুবেরের সৈন্যের সঙ্গে তাঁর তুমুল যুদ্ধ হয়েছিল। কুবের শাপমুক্ত হয়েছিলেন বলে ভীমকে ক্ষমা করেছিলেন। কিন্তু কুবের আজ কৈলাসে নেই, তাঁর বংশধরদের কথাও শুনি না। পরবর্তী কালে এই অঞ্চলের নাম দেখি কিম্পুরুষ বর্ষ, তার মানে কুৎসিত পুরুষের দেশ। একালে আর এ অঞ্চলকে কেউ কিম্পুরুষ বর্ষ বলে না, বলে তিব্বত। দেশের মানুষেরা তিব্বতী নামেই পরিচিত।

এই অঞ্চলবাসী যক্ষ ও রাক্ষস সম্বন্ধে আমাদের একটা অস্পষ্ট ভয়ের ভাব আছে। কিন্নর ও গন্ধর্বের রূপের সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণা নেই। কিন্নরেরা সুকণ্ঠ ছিল, এবং গন্ধর্বরা সুগায়ক বলে খ্যাত। নৃত্য শিল্পী অপ্সরাদের রূপের খ্যাতি ছিল বিশ্বময়। তারা কোথায় হারিয়ে গেছে জানি নে। কিন্তু মানস সরোবর আজও আছে, আছে কৈলাস। শিবের আবাসভূমি আমরা দেখতে পাই নে, দেখি একটি বিশাল শিবলিঙ্গ। অমরনাথের মতো অন্ধকার গিরি গুহার মধ্যে একটি তুষার লিঙ্গ নয়, সমগ্র কৈলাস শৃঙ্গটি একটি শিবলিঙ্গ। চিরতুষারবৃত জ্যোতির্ময় আলোকে উদ্ভাসিত ও অনন্ত বিস্ময়ের প্রতীক হয়ে চিরকাল যাত্রীদের চোখের সামনে অক্ষয় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এ দৃশ্য কল্পনার অতীত, স্বপ্নের অতীত। কৈলাস তীর্থে গিয়ে এক অনাস্বাদিত আনন্দের অনুভূতিতে সমস্ত দেহ মন অবশ হয়ে যায়। এই অনুভূতির কোন তুলনা নেই।

আমার মনে হল যে সাধুজী যেন নিজের চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন কৈলাস। সেই পুরনো দিনের স্মৃতিতে আজও তাঁর মন অবশ হয়ে এসেছে বলে নীরব হয়ে গেলেন। কিন্তু তাউজী তাঁকে চুপ করে থাকতে দিলেন না, বললেন: কী ভাবে গেলেন কৈলাসে?

বড় বস্তুবাদী প্রশ্ন। সাধুজী তাঁর স্বপ্নের জগৎ থেকে ফিরে এলেন বাস্তবে, বললেন: বড় কষ্টে গিয়েছি, কিন্তু কষ্টের কথা আর মনে নেই। আনন্দের কথাটিই মনে বড় হয়ে আছে।

আলমোড়া থেকে আমরা যাত্রা করেছিলাম। আসকোট নামে একটি পাহাড়ী শহর পর্যন্ত বাসে এসে পদযাত্রা আরম্ভ। কেউ ট্রেনে চেপে টনকপুরে এসে নামত, টনকপুর নেপাল সীমান্তের একটি ছোট শহর। সেখান থেকে পিথোরাগড়ের বাসে চম্পাবতের উপর দিয়ে পিথোরাগড়ে

আসত। পিথোরাগড় থেকে আসকোটের দূরত্ব অল্প। একেবারে নেপাল সীমান্তে এই শহর। এর পরেও সীমান্ত বরাবর পথ গেছে লিপুলেক পাসের দিকে। এই গিরিবর্ত চিরতুষারাবৃত। জ্যৈষ্ঠের শেষে বরফ গলতে শুরু করে, তখন শুরু হয় মানুষের যাতায়াত। ভেড়া ও টাট্টুর পিছনে পাহাড়ী বণিকেরা আগে তিব্বতে বাণিজ্যের জন্য যেত। লিপুলেক পাস পেরোলেই তিব্বত। গুরেলা মান্ধাতা হয়ে মানস সরোবর ও রাক্ষস তালের মাঝখান দিয়ে কৈলাসের পথ।

রাত্রিবাসের জন্যে তাঁবু সঙ্গে নিতেই হবে। পথে কোন চটি সরাই বা ধর্মশালা নেই। প্রচুর শীত বস্ত্র চাই। শুধু গরম জামাকাপড় নয়, মাথায় কানঢাকা টুপি, গলায় মাফলার, হাতে দস্তানা এবং পায়ে মোজার উপরে গরম কাপড়ের পট্টী। শোবার জন্য লেপ কম্বল দুই-ই চাই। পোষাকপত্র দু সেট চাই, কেননা পাহাড়ে কখন বৃষ্টি হবে তার ঠিক নেই। ছাতা ও ওয়াটারপ্রুফে শরীরের উপরের দিকটা বাঁচানো যায়, কিন্তু নিচের দিক বাঁচে না। উপরের দিক ভিজলে আরও কেলেঙ্কারি, শীতে একেবারে জমে যেতে হবে। বিছানাপত্র ও খাবার জিনিষের বোঝা বাঁচাবার জন্যেও ওয়াটারপ্রুফ বা রবার ক্লথ জাতীয় জিনিষ সঙ্গে রাখতে হবে।

এর পরে খাদ্যদ্রব্যের কথা। ভারতের সীমানা লিপুলেক পাসের এধারে গার্বিয়াং আর ওধারে তাক্‌লাকোট। এই পর্যন্তই খাদ্যদ্রব্য কিছু কিছু পাওয়া যায়। ঘি আটা গুড় নতুন চাল আর মসুর ডাল। অন্যান্য জিনিষ সঙ্গে নিতে হয়—আচার শুকনো ফল বিস্কুট চা। স্টোভ স্পিরিট লণ্ঠন কেরোসিন টর্চ ব্যাটারি মোমবাতি দেশলাই হাল্কা বাসন প্রভৃতি যাবতীয় রান্নার ও বাতি জ্বেলে কাজ করবার জিনিষ। একটা ওষুধের বাক্স নিতেই হবে। তার মধ্যে জ্বরের ও পেটের অসুখের ওষুধ, মাথা ধরার বড়ি, পায়ে বেদনার মালিশ, ঘায়ের মলম, মুখে মাখবার ক্রীম। এক জোড়া কালো চশমাও চাই। আত্মরক্ষার জন্য বন্দুক পিস্তলের দরকার। তিব্বতে ডাকাতের ভয় ছিল।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে আষাঢ়ের প্রথমে কৈলাস যাত্রার প্রশস্ত সময়। তার আগে থেকেই যাত্রীরা এসে আলমোড়ায় জমা হত। আলমোড়ার কুলি ও ঘোড়া ধারচুলার তপোবন পর্যন্ত যেত। গার্বিয়াং পর্যন্ত যেত ধারচুলার কুলি ও ঘোড়া। গার্বিয়াং থেকে তিব্বতের তাকলাকোট ও সেখান থেকে কৈলাস যাতয়াতের অন্য ব্যবস্থা। গার্বিয়াং থেকে গাইডেরও দরকার, তারা দোভাষীর কাজ করে।

পিথোরাগড় উত্তর প্রদেশের নতুন জেলা। আগে চাঁদ রাজাদের দুর্গ ছিল, সে দুর্গ আর নেই, তার বদলে কোর্ট কাছারি হয়েছে। আস্কোটে আমরা

ধর্মশালায় উঠেছিলাম। আস্কোটের পরে একটা পাহাড় যেন ক্রমেই নিচু হয়ে গেছে। তিন চার মাইল উৎরাইয়ের পর গৌরী গঙ্গা নদীর পুল। নদী পার হয়ে কিছু দূরে চড়াই ভাঙার পরে একটি অপূর্ব দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। ভারত ও নেপাল সীমান্ত দিয়ে বয়ে আসছে কালী নদী, তারপরেই গৌরী-গঙ্গার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এর পর কালীনদীর তীরে তীরে পথ সোজা উত্তরে গেছে। ধারচুলা থেকে কৈলাসের আসল যাত্রার আরম্ভ। কৈলাসের সকল যাত্রী একত্র হয়ে চলেন এখান থেকেই। কেউ আগে, কেউ পিছনে। কিন্তু রাত্রিবাস করেন এক সঙ্গে। ঘুম থেকে যাঁরা আগে ওঠেন তাঁরা আগে চলেন, অন্যরা অনুসরণ করেন তাঁদের। ধারচুলার দু মাইল দূরে শ্রীরামকৃষ্ণ তপোবন একটি আশ্রম। গার্বিয়াং এখান থেকে পাঁচ দিনের পথ। ভারতের সীমান্তে শেষ বর্ধিষ্ণু গ্রাম। অনেকগুলি দোকান আছে। খাদ্যদ্রব্যের অভাব নেই, হাতে বোনা জামা কাপড় পাওয়া যায়, গরম কম্বল আর পশমের মোজা জুতো। তাঁবুও ভাড়া পাওয়া যায়। গার্বিয়াঙে শুধু গাড়োয়ালী নয়, ভোটিয়া আর হুনিয়ারাও আছে। হুনিয়ারাই ভাল গাইড ও দোভাষীর কাজ করে।

গার্বিয়াং থেকেই আমাদের যাত্রা কিছু সহজ হয়েছিল। ঘোড়া ও ঝব্বু পাওয়া যায় এখানে। দুর্গম পার্বত্য পথে ঝব্বু বড় বিশ্বস্ত সঙ্গী। মাল ও যাত্রী দুইই বহন করে। প্রথমটায় খুব সাবধানে চাপতে হয়। নাকের দড়ি টেনে না ধরলে ঝাড়া দিয়ে ফেলে দিতে পারে। আর একটা আশ্বাসের কথা এই যে গার্বিয়াং থেকে মানসসরোবর ও কৈলাস পরিক্রমা করে ফিরে আসতে দিন কুড়ি সময় লাগে। তাড়াতাড়ি পথ হাঁটতে পারলে কিছু সময় সংক্ষেপ করা সম্ভব। দুর্গম পথে চলবার সময় এ একটা মস্ত বড় আশ্বাস। কষ্টের শেষ কবে হবে তা জানা থাকলে কষ্ট সহ্য করবার বল পাওয়া যায়।

গার্বিয়াং থেকেই হিমালয়ের চেহারা বদলায়। এ আমাদের পরিচিত হিমালয় নয়। আলমোড়ায় যে পাহাড় দেখি, তা হিমালয়ের প্রথম তরঙ্গ। তার পরের তরঙ্গ তত উঁচু নয়। এই দ্বিতীয় তরঙ্গে আমরা পিথোরাগড় আস্কোট পেয়েছি। গার্বিয়াং তৃতীয় তরঙ্গে। এই তরঙ্গ ক্রমে ক্রমে উঁচু হয়ে তিব্বতের দিকে নেমে গেছে। হিমালয়ের সমস্ত তুষার শৃঙ্গগুলিই এই তৃতীয় তরঙ্গে অবস্থিত। ষোল হাজার সাতশো আশি ফুট উঁচু লিপুলেক গিরিবর্ত্ম পার হলেই তিব্বত হিমালয়ের পরপারে। হিমালয় পার হবার কষ্টের কথা গার্বিয়াঙেই শুনেছিলাম। বাতাস ক্রমে হাল্কা হবে, নিঃশ্বাসের কষ্ট হবে, ঠাণ্ডায় পা ভারি হবে পাথরের মতো, এর নাম নাকি বিষচড়া। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়, দেহের অনাবৃত অংশ পুড়ে যাবার মতো জ্বালা করে, মাথা ঘোরে, চোখ জ্বলে, মনে হয় যে জ্বর এসেছে কাঁপুনি দিয়ে, এ শীতের কাঁপুনি।

কালাপানিতে রাত কাটাবার সময়েই এই শীতের কিছু অভিজ্ঞতা হল। গরম জামা কাপড় সব গায়ে চাপিয়ে আগুন জ্বালিয়েও কাঁপুনি থামল না। লিপুলেক পাস অতিক্রম করবার আগে আর একটি রাত আমাদের কাটাতে হয়েছিল। সে জায়গার নাম সঙ চিঙ। কালাপানিতেও দু চার ঘর মানুষের বাস দেখেছি, কিন্তু সঙ চিঙে জনমানব নেই। পাঁচ মাইল পথ ঘণ্টা তিনেকে অতিক্রম করে দুপুরেই সেখানে পৌঁছেছিলাম। এগোবার সময় ছিল, কিন্তু এগোই নি। পনর হাজার ফুটেই আমরা তাঁবু ফেলেছিলাম। কিন্তু নির্জন নিস্তব্ধ রাতে আমরা ঘুমোতে পারি নি। দুরন্ত শীত। আমরা কয়েকজন যাত্রী ছাড়া আর কোন প্রাণীর সাড়া নেই। পাখির ডানার শব্দ নেই, ঝিঁঝির ডাক নেই, ঝর্ণার কলতানও সেখানে শোনা যায় না। এখানে শুধু প্রহর গণনা করে রাত কাটানো।

স্থির হয়েছিল যে শেষ রাতেই যাত্রা করব। সূর্যের আলোয় লিপুলেকের বরফ গলতে শুরু করে, অসতর্ক হলে বরফের স্তূপে পা ঢুকে যায়। তাই আমরা শেষ রাতেই যাত্রা করেছিলাম। তাড়াতাড়ি চলবার উপায় নেই, ঠাণ্ডায় পা চলে না। দেহ অবশ হয়ে আসে, কনকনে বাতাস আসে সামনে থেকে, নিঃশ্বাসে টান ধরে আর গলা শুকিয়ে আসে। এখানে জল নেই, শুধু বরফ। পাহাড়ে আর গাছপালা নেই, সম্পূর্ণ অনাবৃত উলঙ্গ পাহাড়। তার শিখরগুলি চিরতুষারাবৃত। সামনেই লিপুলেক পাহাড়, তার চূড়ার নাম লিপুধুরা। আমরা তার উপর দিয়ে যাব। কিন্তু তার পরেও যে পৃথিবী আছে, তা বোঝা যায় না। হিমালয়ের এই নগ্ন রূপ দেখে মুগ্ধ হতে হয়। এ রূপের তুলনা আর কোথাও নেই।

সাধুজী একটু বিশ্রাম নিলেন এই সময়ে। তারপরে আবার বলতে লাগলেন ঃ বরফের উপর দিয়ে খানিকটা পথ আমরা পেরিয়ে গেলাম। তারপরে লিপুধুরা। ধীরে ধীরে এই পর্বতের শিখরেও আরোহণ করলাম। পথের ধারে একটি শুকনো গাছ, তার ডালে পাতার বদলে রঙীন কাপড়ের টুকরো বাঁধা, আর গোড়ায় কিছু পাথর সাজানো। এইখানে দাঁড়িয়ে আমরা তিব্বতের দিকে প্রথম তাকিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল যেন আমরা সাহারার মতো একটা মরুভূমি দেখছি। কোন গাছপালা নেই, কোন শ্যামলীমা নেই, নেই কোন মানুষের বসতির চিহ্ন। দূর দিগন্তে শুধু ছোট বড় পাহাড় দেখতে পেয়েছি, নানা রঙের পাহাড়—সাদা নীল ধূসর ও গৈরিক। আর দেখেছিলাম গুরেলা মান্ধাতা পাহাড়। তারপরে বরফে আচ্ছন্ন পথ ধরে সন্তর্পণে নিচে নেমেছি। এর পরে পুরাং পর্যন্ত সাত মাইল প্রায় সমতল পথ।

আমরা একটি ঝর্ণার ধারে ধারে এগোচ্ছিলাম। এই ঝর্ণাটিই ধীরে ধীরে প্রশস্ত হয়ে নদীর মতো দেখাচ্ছিল। এই রকমের অনেকগুলি ঝর্ণার

ধারা গিয়ে বর্ণালী নদীতে মিশেছে। বর্ণালীর তিব্বতী নাম মাব চু। চু মানে জল। পুরাঙ্ গ্রাম এই নদীর দুই তীরে বিস্তৃত। পুরঙকে ভারতীয়রা তাক্‌লাখার বা তাক্‌লাকোট বলে। ভারতের সীমান্তের কাছে এই তিব্বতী জনপদে আগে ভারতের সঙ্গেই ব্যবসা ছিল। নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্রের বিনিময়।

এই অঞ্চলের বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রে আমরা যবের চাষ দেখেছিলাম। কিছু কড়াইশুঁটির চাষও আছে। এ সব আমাদের রবিশস্য, শীতকালের ফসল। কিন্তু হিমালয়ের পরপারে দেখেছি যে আমাদের বর্ষাকালেই সেখানে এ সবের চাষ হচ্ছে। তিব্বতে তখন কোন ঋতু তা আমাদের জানা ছিল না। রৌদ্র বড় তীব্র, আর বাতাস শুষ্ক। ঠোঁট শুকিয়ে ফাটতে শুরু করেছিল।

পাহাড়ের উপরে একটা প্রাচীন দুর্গ। সেখানে থাকেন স্থানীয় শাসন কর্তা জুম্পান পুসো। পুরনো একটি গোম্ফাও আছে, আর নানাবর্ণের কিছু ঘরবাড়ি। এই জায়গারই নাম পুরাঙ। নীচে নদীর ধারে সমতল ভূমির উপরে যে বাজার তার নাম তাক্‌লাখার মণ্ডি। বর্ণালী নদী এখানে বেঁকে পূর্ব দিকে ঘুরে আবার দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছে, নেপাল রাজ্যের ভিতর দিয়ে এসেছে ভারতবর্ষে। এই নদীর ধারে আর একটি তীর্থস্থান আছে, তার নাম কোদণ্ডনাথ। এদেশের ভাষায় বলে কোজর যো, আর ভারতীয়েরা বলে খোজরনাথ। যাতায়াতে কুড়ি বাইশ মাইল পথ ঘোড়ায় চেপে এক দিনেই যাতায়াত করে। তিব্বতী লামারা সেখানে হিন্দু দেবদেবীর পূজো করে। বিষ্ণুর দুপাশে লক্ষ্মী সরস্বতীর ধাতু মূর্তি অপরূপ সুন্দর।

নদীর বুক প্রায় আধ মাইল বিস্তৃত। কিন্তু জল নেই সবখানে। কাঠের পুলের উপর দিয়ে জল পেরিয়ে নদীর ধারেই তাঁবু ফেলে আমরা রাত কাটালাম। গার্বিয়াঙের ঘোড়া ও ঝব্বুকে বিদায় দিয়ে তিব্বতী জানোয়ার নিতে হল এইখানে। তিব্বতীরা তখন আমাদের বিদেশী ভাবত না, আমাদের তারা শান্তিপ্রিয় প্রতিবেশী ভাবত। আর চীনের সঙ্গে তখন বন্ধুতার সম্পর্ক ছিল বলেই আইন কানুনের কড়াকড়ি ছিল না। সে সব ছিল সাহেবদের বেলায়। সাহেবদের তারা ভয় করত, সন্দেহের চোখে দেখত তাদের।

পর দিন প্রভাতে আমরা মানসসরোবরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। পথের পরিমাণ পুরাঙেই জেনে নিয়েছিলাম। দ্বিতীয় দিন রাবণ হ্রদে পেঁছব, তার পর দিন মানস সরোবর, কৈলাস দেখতে পাব চতুর্থ দিনে। কৈলাস পরিক্রমা করে পুরাঙে ফিরতে আমাদের দশ বারো দিন সময় লাগবে।

মন আমাদের অনেক হাল্কা হয়ে গেছে। এ পথে কঠিন চড়াই উৎরাই আর নেই। বর্ণালীর উপত্যকা ছেড়ে গ্রামের প্রশস্ত শস্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি। সামান্য উঁচু নিচু পথ, চলতে কষ্ট হয় না একেবারে।

যাত্রীরা বেশির ভাগই এখানে হেঁটে চলেছেন। মানস সরোবরের পথে দস্যুভয় আছে বলে যাত্রীরা পুরাঙের মহাজনের কাছে টাকাকড়ি জমা দিয়ে একখানা রসিদ সংগ্রহ করেছেন, আর সামান্য তিব্বতী তঙ্কা আধা ও সিকি তঙ্কা রেখেছেন সঙ্গে। হাসতে হাসতে এই মহাজন বলছিলেন, পুরী পয়সা, সরোবর সাত্তু। তার মানে পুরী যেতে পয়সার দরকার, আর মানসসরোবরের জন্য চাই শুধু ছাতু।

তাউজী এতক্ষণ নিঃশব্দে নির্বিকার ভাবে বসেছিলেন। হঠাৎ তৎপর হয়ে চোখে চশমা লাগিয়ে বোধহয় সাধুজীর এই শেষ কথাটি লিখে নিলেন। মানস সরোবর ও কৈলাসের কথায় আমরাও যেন ডুবে গিয়েছিলাম।

সাধুজী বলতে লাগলেন : রুক্ষ প্রান্তরের মধ্য দিয়ে পথ সোজা উত্তরে গেছে। দূরে দূরে পর্বতের শিখর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তুষার ধবল। এমনি একটি পর্বতের নাম গুরেলা মান্ধাতা। আমাদের পথ গেছে তারই পাশ দিয়ে রাবণ হ্রদের তীরে। তার পূর্বে মানস সরোবর। অনেক যাত্রীদল মানস সরোবরে না গিয়ে রাবণ হ্রদের তীরে তীরেই কৈলাসে চলে যায়, ফেরার পথে দেখে মানস সরোবর। আমরা মানসসরোবর দেখে কৈলাসে যাব, মানসের পবিত্র জলে স্নান করে দর্শন করব দেবাদিদেব মহাদেবের লীলাভূমি কৈলাস।

মধ্য পথে আমাদের একটি রাত কাটাতে হয়েছিল। কোন লোকালয় নেই, আমরা নিজেরাই একটি লোকালয় সৃষ্টি করে তাঁবুর মধ্যে রাত্রিবাস করলাম। প্রত্যুষে আবার যাত্রা। অসহ্য শীত, বাতাস আরও অসহ্য। সমস্ত গরম কাপড়ের বোঝা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, অসাড় মনে হচ্ছে হাত পা। পথ চলার পরিশ্রমেই খানিকটা আরাম পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে ঝর্ণার ধারা দেখতে পাওয়া যায়। তৃষ্ণার্ত যাত্রীরা অঞ্জলি ভরে জল পান করে। ঝব্বুগুলো মাথা নিচু করে শুধু জলই খায় না, জলের ধারে তৃণ গুল্মেরও সন্ধান করে। কাঁটার মতো শক্ত তৃণ। মাঝে মাঝে পাথরের ফাঁকেও এই রকমের কাঁটা দেখতে পাওয়া যায়।

এক সময় একটা চড়াই পাওয়া গেল। এ রকম চড়াই আমাদের পরিচিত নয়। এখানে একজনের পিছনে আর একজনকে উঠতে হয় না। পাশের অতলস্পর্শী খাদে গড়িয়ে পড়বার ভয় নেই। এ চড়াই এমন প্রশস্ত যে সবাই পাশাপাশি উঠতে লাগলাম। যাঁরা আগে ছিলেন, তাঁদের আনন্দধ্বনি শুনতে পাওয়া গেল। আমরাও তাড়াতাড়ি উপরে উঠে সেই আনন্দের সন্ধান পেলাম। সামনে বাম দিকে দেখলাম খানিকটা নীল জল। আকাশের নীলের চেয়েও ঘন ও শান্ত। তারই পরপারে কৈলাসের অমল তুষার স্বপ্ন মেঘাবৃত।

তাউজী কোন প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন। তাই দেখে সাধুজী বললেন :

না, মানস সরোবর নয়, রাক্ষস তাল বা রাবণ হ্রদ। তিব্বতীরা কেউ বলে লাং বো, কেউ বলে লা গাং। কিন্তু সবাই ভয় পায় এই রাক্ষস তালকে। এই সরোবরে নাকি রাক্ষসেরই বাস, এর জল পবিত্র নয়, এর তীর নয় নিরাপদ। চোরাবালিতে পা পড়লে মানুষকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। নরম সুন্দর শুভ্র বালির নিচেই জীবন্ত মানুষের সমাধি হয়ে যাবে। তবু আমরা রাবণ হ্রদের তীরে পৌঁছবার জন্য দ্রুত পায়ে নিচে নামতে লাগলাম।

উপর থেকে মনে হয়েছিল যে রাবণ হ্রদ খুব কাছে। কিন্তু তা নয়। অনেকটা পথ অতিক্রম করে একটা জায়গায় এসে এই হ্রদের রূপ দেখতে পেলাম। দিনের আলো তখনও নিবে যায় নি, আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে রাবণ হ্রদ। জলের মধ্যে দুটি ছোট পাহাড় আছে দ্বীপের মতো। আলোয় রাঙা দেখাচ্ছিল একটি, আর একটির বিচিত্র বর্ণ। বাতাসে হ্রদের জল দুলছিল। আমাদের মনও দুলে উঠেছিল। রাত্রি বাসের জন্য আমরা এই হ্রদের তীরেই তাঁবু ফেলেছিলাম।

রাবণ হ্রদের উৎপত্তি কী করে হল, সাধুজী আমাদের সে গল্পও শোনালেন। বললেন: বড় ভাই কুবেরকে জয় করবার জন্য দশানন রাবণ এসেছিলেন কৈলাসে। তারপর তাঁকে পরাস্ত করে তাঁর পুষ্পক রথ নিয়ে ফিরে যাচ্ছিলেন। এইখানে তাঁর রথের গতি রুদ্ধ হল। রথ থেকে নেমে রাবণ বললেন, ব্যাপার কী? সামনে ছিলেন শিবের অনুচর নন্দী। তিনি বললেন, দশানন, মহাদেব এখন পার্বতীর সঙ্গে বিহার করছেন, এ পথে যাবার অধিকার এখন কারও নেই। এই উত্তরে দশানন রেগে উঠে বললেন, এই পর্বতটাকেই আমি নিয়ে যাব। বলে তাঁর বিশ হাতে গোটা পর্বতটাকেই নাড়া দিলেন। কৈলাস পর্বতবাসী শিবের সমস্ত অনুচর ভয় পেল, ভয় পেলেন পার্বতী। কিন্তু শিব সহাস্যে তাঁর পদাঙ্গুষ্ঠে একটু চাপ দিলেন। তাতেই দশানন হলেন প্রবল ভাবে নিপীড়িত। নিজেকে মুক্ত করবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি স্বেদাক্ত হলেন, দরদর ধারায় তাঁর ঘাম পড়তে লাগল। সেই ঘামেই উৎপত্তি হল এই রাবণ হ্রদের।

তারপরে সাধুজী বললেন: অনেকে বলেন, না। দশানন এখানে সহস্র বর্ষ রোদন করেছিলেন। তাঁর সেই সরব রোদনের জন্যই নিজের নাম হল রাবণ, আর তাঁর চোখের জলেই এই হ্রদের সৃষ্টি হল। রাবণ এখানে দীর্ঘকাল তপস্যা করে শিবকে সন্তুষ্ট করেছিলেন।

রাবণ হ্রদের তীর থেকে প্রত্যূষে যাত্রা করলে সন্ধ্যাবেলাতেই কৈলাসের পাদদেশে তারচেনে পৌঁছনো যায়। কিন্তু মানস সরোবরে স্নান করে গেলে একটা দিন বেশি সময় লাগে। একটা রাত শতদ্রু নালার উপরে অতিবাহিত করতে হয়। শতদ্রু নদীর উৎপত্তি মানস সরোবরে। সেখান থেকে রাবণ

হ্রদে এসে পড়েছে, তারপরে রাবণ হ্রদ থেকে বেরিয়ে তীর্থপুরীর পাশ দিয়ে পাঞ্জাবে প্রবেশ করেছে। রাবণ হ্রদের চেয়ে মানস সরোবরের উচ্চতা প্রায় বিয়াল্লিশ ফুট বেশি, সমতল থেকে পনর হাজার আটানব্বুই ফুট। কৈলাস পরিক্রমাতে পথে আঠারো হাজার দুশো ফুট উঁচুতে গৌরীকুণ্ড, আর কৈলাস শৃঙ্গ প্রায় বাইশ হাজার ফুট উঁচু।

রাক্ষসতাল থেকে মানস সরোবরের দূরত্ব মাত্র এক দেড় মাইলের। কিন্তু পথ অসমতল বলে ঘণ্টা তিনেক সময় লাগে। এক একটি করে তিনটি চড়াই অতিক্রম করে মানসের তটে পৌঁছতে বেলা গড়িয়ে যায়। কিন্তু সেখানে পৌঁছে গভীর বিস্ময়ে আমরা হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এ যেন বিশ্ব প্রকৃতির একটা বিরাট নগ্ন রূপ, নিরাবরণ পৃথিবী এখানে শ্রান্ত দেহে বিশ্রামরতা। ভোগের বাসনা এখানে জাগে না, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মতো আজীবন তপস্যার কথা মনে আসে। সত্যিই এ রূপের কোন তুলনা নেই।

সাধুজী বললেন: মানস সরোবরকে তিব্বতীরা বলে ৎসো মাফম, আর একে সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে। পাঁচ ছয় দিনে তারা এই হ্রদের পরিক্রমা করে বলে এর পরিধি মনে করা হয় পঞ্চাশ ষাট মাইল। অনেকে একশো মাইলও বলে। জল যেখানে সব চেয়ে গভীর, সেখানটা হল প্রায় আড়াইশো ফুট।

প্রচুর কৌতূহল নিয়ে তাউজী প্রশ্ন করলেন: স্নান করেছিলেন আপনি?

সাধুজী হেসে উত্তর দিলেন: শীতল জলে স্নান করবার একটা কায়দা আছে। জলে নেমে আর ইতস্তত করতে নেই। তরতর করে এগিয়ে গিয়ে দু তিনটে ডুব দিয়ে উঠে আসতে হয়। সমস্ত শরীর প্রথমে অবশ হয়ে যায়, তারপরে পরম তৃপ্তিতে মন যায় ভরে। অনেক যাত্রী এখানে স্নান তর্পণ করে বালির উপরে বসে সন্ধ্যা বন্দনা করেন। ঝড়ের মতো বাতাসে তরঙ্গের পর তরঙ্গ এসে তীরের উপরে আছড়ে পড়ে। সমুদ্রের মতো গর্জন নেই, আছে গানের মতো একটা মিষ্টি সুর। কুবেরের পুরী থেকে যেন নৃত্য গীতের ধ্বনি ভেসে আসছে।

সাধুজী থামলেন, তাকালেন বাহিরের অন্ধকারের দিকে। তারপর ঈষৎ লজ্জিত ভাবে বললেন: অনেক রাত হয়ে গেল আজ!

তাউজী তখনই উত্তর দিলেন: হোক, আপনি বলুন।

এ আমাদেরও মনের কথা। আমরাও চাইছিলাম যে কৈলাসের কথা আজই শেষ হোক, শেষ হয়ে যাক তীর্থের কথা।

কিন্তু সাধুজী যেন [illegible] তাড়াতাড়ি শেষ করলেন কৈলাসের কথা। বললেন: কৈলাস তিব্বতীদেরও পরম তীর্থ। বলে, খাঙ রিমপোছে।

বারো বছর পর পর তাদের কুম্ভের মতো যোগ আসে। তখন সমগ্র তিব্বত থেকে ধার্মিক লামারা আসেন কৈলাস দর্শনে। সাধারণ তিব্বতী আসে মানৎ করে, দণ্ড খেটে, ভূমি মেপে তারা কৈলাস পরিক্রমা করে কুড়ি বাইশ দিনে। গৌরীকুণ্ডের বরফের ধারে কেন জমে যায় না, সেই কথা ভেবে আশ্চর্য হতে হয়।

মানস সরোবরের চারি দিকে ও কৈলাস পরিক্রমার পথে অনেক গোম্ফা আছে বৌদ্ধ লামাদের। লামাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় সেই সব গোম্ফায়। তীর্থ যাত্রী তিব্বতীদেরও সাক্ষাৎ মেলে। আর দেখা হয় তিব্বতী দস্যুদের সঙ্গে। কাঁধে গাদা বন্দুক নিয়ে ঘোড়ায় চেপে তারা আসে। যাত্রীদের মালপত্র পরীক্ষা করে দেখে, জিজ্ঞাসাবাদ করে দোভাষী হুনিয়া বা ভোটিয়াদের সঙ্গে। তারপর বন্দুক বা পিস্তলের সংবাদ পেলেই সরে পড়ে।

কৈলাস পরিক্রমার আরম্ভ তারচেন থেকে। তিরিশ মাইল পথ পরিক্রমা করতে তিন দিন সময় লাগে। কষ্ট সহিষ্ণু হলে দুদিনেই এই পথ অতিক্রম করে তারচেনে ফিরে আসা যায়। যারা রাবণ হ্রদের তীর ধরে যায়, তারা ফেরে মানস সরোবরের ধার দিযে। আর যারা মানস সরোবর হয়ে যায়, তারা রাবণ হ্রদের ধার দিয়ে ফিরে আসে।

এর পরে সাধুজী নিজের কথা বললেন: শীতের জন্য আমরাও খুব তাড়াতাড়ি পথ চলেছিলাম। মানস সরোবরের তীরে এক রাত্রি বাস করেছিলাম তার রাতের সৌন্দর্য উপভোগ করবার জন্য, আর এক রাত্রি বাস করেছিলাম তারচেনে। তারপরে দুদিনে কৈলাস পরিক্রমা শেষ করে রাক্ষস তালের পথে ফিরে এসেছিলাম।

এমন সংক্ষেপে সাধুজী এ কথা বলবেন তা আমরা ভাবতে পারি নি। আপত্তি জানালেন তাউজী। কিন্তু তাঁকে বাধা দিয়ে সাধুজী বললেন: কষ্টের কথা বলব না, বলব আনন্দের কথা। গৌরীকুণ্ডকে তিব্বতীরা বলে দোল্‌মা-লা। অপূর্ব দৃশ্য দেখেছিলাম গৌরীকুণ্ডের। আধ মাইল পরিধির এই কুণ্ডটি সারা বছরই বরফে আচ্ছন্ন থাকে। উপরের পুরু বরফ ভেঙ্গে জল পাওয়া যায়। তীর্থ যাত্রীদের কেউ কেউ স্নান করেন এই কনকনে ঠাণ্ডা জলে, শিশিতে জল ভরে নেন। বেশিক্ষণ দাঁড়ানো এখানে নিরাপদ নয়। তুষারের স্রোত বয়। কিছুদিন আগে এলে নাকি চার পাঁচ মাইল পথ বরফের উপর দিয়ে হাঁটতে হত। আমরাও বেশিক্ষণ দাঁড়াই নি, মাথায় একটু জল ছিটিযে এগিয়ে গিয়েছিলাম।

সাধুজী থামতেই তাউজী বললেন: কৈলাসের কথা বলবেন না?

কৈলাসের কথা!

বলে সাধুজী খানিকক্ষণ চোখ বুজে রইলেন। তারপরে বললেন:

কঠিন বরফে আবৃত একটি গিরিশৃঙ্গ, থ্যাবড়া শিবলিঙ্গের মতো তার আকার। তারই পাশ দিয়ে বরফের পাহাড় এসেছে নেমে। তার নাম পিনাক। পিনাক এসে গৌরীকুণ্ডের প্রান্তে মিলেছে।

কৈলাসের এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় মন আমার ভরল না। বোধহয় কারও মনই ভরে নি। তা বুঝতে পেরে সাধুজী বললেন ঃ চলার পথে কৈলাস যেদিন প্রথম দেখতে পাই, সেদিন সেই ক্ষণে মনে হয়েছিল যে এত দিন যা দেখেছি সব মিথ্যা, সত্য শুধু এই কৈলাস। এমন রূপ আর কোন দিন দেখি নি বলে অনেক দিন অনেক দৃশ্য দেখে মনে হয়েছে। আজ ভারতের তীর্থ পরিক্রমা শেষ করে এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, এর চেয়ে বড় তীর্থ আর দেখি নি। তীর্থ আর দেবতা এখানে এক হয়ে গেছেন। এই তো আসল তীর্থ।



তীর্থের কথা শেষ করে সাধুজী চলে গেলেন। কিন্তু আমার মনে হল যে তিনি তীর্থের কথা শুরু করে দিয়ে গেলেন। এ কথার বুঝি শেষ নেই, তীর্থের শেষ নেই বলে তার কথারও নেই শেষ। শুধু শুরু আছে।

শিবের আবাস ছিল কৈলাসে, কৈলাস তাই তীর্থ। ব্রহ্মা যজ্ঞ করেছিলেন পুষ্করে, পুষ্কর তাই তীর্থ। মানবের কল্যাণ কামনায় রাজা কুরু কর্ষণ করেছিলেন কুরুক্ষেত্র, সেই স্থানও তীর্থ হয়েছে। সতীর দেহাংশ পড়ে একান্ন পীঠও তীর্থ বলে স্বীকৃত। দেবতার মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্যও অনেক স্থান তীর্থে পরিণত হয়েছে। এই সব তীর্থের কথা আমরা শুনেছি। বাদও পড়েছে অনেক তীর্থের কথা।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা আমার মনে পড়ল। রাম ও কৃষ্ণের জন্মস্থান তীর্থ। এ যুগের ঋষি শঙ্করাচার্যের জন্মস্থান কেরালার কালাডিও তীর্থ রূপে সম্মানিত হচ্ছে। তীর্থ নামে গণ্য হয়েছে রামকৃষ্ণ ও সারদা মায়ের জন্মস্থান কামারপুকুর ও জয়রামবাটি। সাধুজীর কাছে এ সব তীর্থের কথা আমরা শুনি নি। এ সমস্ত কথা শুনতে গেলে এ দেশের তীর্থের কথার কোন দিন শেষ হবে না। তীর্থের যেমন শেষ নেই তেমনি শেষ নেই পথের কথার। তীর্থময় ভারত সৌন্দর্যের মহিমায় অমর হয়ে আছে, রূপময় হয়ে আছে তার তীর্থের পথ।

———